সেবকের নিবেদন

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের

উপদেশ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৬ শক, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর, এস, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

সেবকের নিবেদন প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। এবার ইহা মূলগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মুদ্রিত হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে অনেক স্থলে অনেক কথা বাদ পড়িয়াছিল, ভাষা বিপর্য্যয়ও যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী উপদেশ একেবারে মুদ্রিত হয় নাই। সেই সমুদয় অপূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্য আচার্য্য দেবের সময়ে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া এই বর্ত্তমান সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে। এবার উপদেশগুলি ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী সন্নিবেশিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ভক্তের হৃদয়ে পরে পরে যে যে ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এবার ইংরাজী তারিখও দেওয়া হইয়াছে এবং পাঠের সৌন্দর্য্যার্থে প্যারা করা হইয়াছে। গ্রন্থের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ উপদেশের সন্নিবেশ ভুল হইয়াছে, অন্য সংস্করণে ইহা নিরাকৃত করা যাইবে।

সূচী পত্র।

সেবকের নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

হিমালয়ের গাত্রোত্থান।

রবিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৮০২ শক; ২৭এ জুন, ১৮৮০।

চারি সহস্র বৎসরের পর আবার হিমালয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে গম্ভীর হিমালয় পর্ব্বত, বহু শতাব্দী গত হইল, জাগ্রৎ জীবন্তভাবে ব্রহ্মনাম গান করিয়াছিল, ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়াছিল, ব্রহ্মসাধন করিয়াছিল, প্রাচীন আর্য্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রহ্মের যশ ঘোষণা করিয়াছিল, কালক্রমে সেই পর্ব্বত নিস্তেজ এবং নির্জ্জীব হইয়া ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাচীন কালে সমুদায় ভারত এই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগধর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং হিমালয় হইতে বিনিঃসৃত গঙ্গাতে স্নান করিয়া ভারতবাসিগণ সেই গঙ্গার তটে বসিয়া হরির আরাধনা এবং জপ তপ করিতেন। এই পর্ব্বতের নিকট আর্য্যগণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিতে শিখিয়াছিলেন এমন আর

কোন্ জাতি পারিয়াছিল? হিমালয় যেমন প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিদিগকে উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে, এমন আর কে শিক্ষা দিয়াছে?

দেখিতে হিমালয় কেবল কঠিন প্রস্তররাশি, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভারতের বৃহৎ ঘনীভূত যোগধর্ম্ম। হিমালয় অভেদ্য, কে উহাকে ভেদ করিতে পারে? হিমালয় অটল অচল, কে উহাকে আন্দোলিত করিতে পারে? এই অভেদ্য হিমাচল গুরু হইয়া আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যদিগকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছে। প্রমাণ বেদ বেদান্ত। ভারতের যোগ-ধর্ম্ম হিমালয়সম্ভূত। অভ্রভেদী হিমালয় হিন্দুস্থানের মস্তক। সেই উচ্চ মস্তকের ভিতর হইতে যোগতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব এবং নানা প্রকার জ্ঞানতত্ত্ব বাহির হইয়াছে। যখন সমুদায় যোগধর্ম্ম বাহির হইয়া গেল, তখন হইতে ঐ পর্ব্বত ক্রমশঃ নিস্তেজ এবং নিরুদ্যম, নিষ্ক্রিয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। অনেক বৎসর যোগ শিক্ষা দিবার পর হিমালয়ের বুঝি আর কিছু শিখাইবার ছিল না, গঙ্গা যমুনাকে প্রেরণ করিয়া হিমালয়ের আর বুঝি কোন নদী উৎপাদন করিবার শক্তি রহিল না, তাই বুঝি হিমালয় নিদ্রিত? কিংবা ভারতবাসীর নিকট আর তাদৃশ আদর পাইল না বলিয়া গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় অবসন্ন হইল?

যে কারণেই হউক, ঐ যে প্রকাণ্ড পর্ব্বত যাহার উপর কত যোগী ঋষি, কত সন্ন্যাসী তপস্বী হরির আরাধনা করিতেন,

সেই হিমালয় এখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। আর কে সেখানে যোগ তপস্যার উপদেশ শুনিতে যায়। মনুষ্য নিদ্রায় অচেতন হইলে যেমন সে কথা কয় না, প্রশ্নের উত্তর দেয় না, চলে না বলে না, সেইরূপ এই প্রকাণ্ড পর্ব্বতরাজি এমনই নিদ্রায় অচেতন যে সহস্র বৎসর ইহাতে জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। যেন ইহার মুখে একটী কথা ছিল না, নিতান্ত স্পন্দহীন নীরব। সেই পাহাড় রহিয়াছে, সেই বৃহৎ আকৃতি, সেই উচ্চতা, সেই অটলতা, কিন্তু সমুদায় যেন নির্জীব। ডাকিলে কোন উত্তর দেয় না। যেন মৃত দেহ কেবল পড়িয়া আছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে কত দুর্ঘটনা ঘটিল, ধর্ম্ম বিলোপ হইল, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল, দুঃখের আগুন জ্বলিল, কিন্তু পাহাড় মৃত পাহাড়ের ন্যায় উদাসীন। সৌভাগ্যচ্যুত গৌরবভ্রষ্ট হিন্দুস্থান কত কাঁদিল, হিমালয় ভ্রূক্ষেপও করিল না, কর্ণপাতও করিল না। কালনিদ্রায় নিস্তব্ধ, হিমালয় কি কাহারও কথা শুনিতে পায়?

শিক্ষাগুরুর এই নির্জীব অবস্থা দেখিয়া লোকেরাও পূর্ব্বপ্রাপ্ত উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বিভিন্ন প্রণালীতে ধর্ম্ম সাধন করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বত এবং প্রকৃতির সঙ্গে যে ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে ইহা তাহারা আর মানিল না। গভীর যোগ, ব্রহ্মধ্যান প্রভৃতি উচ্চ বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মধ্যে ব্রহ্ম-দর্শনের অভ্যাস আর রহিল না। আধ্যাত্মিক সাধনের

পরিবর্ত্তে ক্রমে অসার কর্ম্মকাণ্ড আসিয়া পড়িল এবং অনাদ্যনন্ত ভূমা ব্রহ্মকে অর্চ্চনা না করিয়া ক্ষুদ্র দেবদেবীর আরাধনাতে সকলে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে ভূমার আদর নাই সেখানে হিমাচলের আদর কিরূপে হইবে?

এই সাধারণের পতন ও কালনিদ্রা মধ্যে নববিধানের আন্দোলন আসিয়া হিমালয়কে জাগাইল। নববিধানের সিংহ-রবে ঐ পর্ব্বতের নিদ্রা ভাঙ্গিল, এবং সহসা গাত্রোত্থান করিয়া হিমালয় সমস্ত ভারতবর্ষকে ডাকিতে লাগিল, এবং ব্রহ্মধ্বনিতে ভারতবাসীদিগকে কাঁপাইতে লাগিল। আমি হিমালয়ের গাত্রোত্থান দেখিয়াছি, সুতরাং তাহা সকলকে বলিতে বাধ্য হইলাম। যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব? ঐ দেখ আবার ভারতবর্ষকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়শিখর হইতে যোগধর্ম্ম নব বেশ পরিধান করিয়া নিম্ন ভূমিতে আসিতেছেন। এত দিন চারিদিকে কেবল কালনিদ্রারই লক্ষণ দেখা যাইত। ভারতবাসীদিগের নিকট অনাদৃত হওয়াতে এত বড় পাহাড় অপমানে প্রাণত্যাগ করিল, আবার তাহার মরণে ভারতের জীবনস্রোত সমুদায় ক্রমে শুকাইয়া মরিল। যাহা হউক, এত দিনের পর ভারতের দুঃখের নিশা অবসান হইয়াছে। আবার নিদ্রিত পর্ব্বত সকল জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার অচেতন প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আবার গিরি নদ নদী সমুদায় ব্রহ্মনাম ঘোষণা

করিতেছে, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই সুসংবাদ শুনিয়া এখন সমস্ত আর্য্যজাতির মনে আশার সঞ্চার হউক, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে নব উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হউক!

ঐ দেখ প্রকাণ্ড বীর হিমালয় আবার সুপ্তোত্থিত মস্তক উত্তোলন করিয়াছে এবং হস্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং জলন্ত চক্ষু ঘুরাইতেছে। কি আশ্চর্য্য প্রতাপ! কি স্বর্গীয় তেজ! এ ঘটনাটী কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ঘটিল। দীর্ঘ নিদ্রার পর বীর গাত্রোত্থান করিলে যেমন শত্রুদিগের ভয় হয়, তেমনই হিমালয়ের পুনরুত্থানের সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মবিরোধী যোগধ্যানবিরোধী অসুরদল ভয়ে কাঁপিতেছে। নাস্তিক, অধার্ম্মিক, পাষণ্ড, দুশ্চরিত্র দুর্জ্জনদিগের কাঁপিবার সময় আসিয়াছে। এবার পর্ব্বতশিখর হইতে যোগের মহাপ্লাবন আসিতেছে, সমস্ত দেশ ডুবিবার উপক্রম হইতেছে। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, পাপজঞ্জাল সমস্ত এবার ধৌত হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মযোগতত্ত্ব যাহা এক সময় ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল, সেই যোগের পুনরুদ্ধারের সময় আসিয়াছে। যে প্রাকৃতিকধর্ম্ম গিরিকে রসনাসংযুক্ত করে, এবং নদীকে অমৃতভাষিণী করে ও সমস্ত জড়রাজ্যকে ঈশ্বর-মহিমার বক্তা করে, সেই সজীব ধর্ম্ম আবার আগত-প্রায়। যে উচ্চ পার্ব্বতীয় ধর্ম্মে নীচ বাসনা সকল বিনষ্ট হয়, সেই দেবধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইল। নীচ ভূমিতে যে সকল নীচ কামনার উৎপত্তি হয় ভারতবর্ষ অনেক শতাব্দী

সে সমস্ত নীচ কামনার অনলে দগ্ধ হইয়াছে। ভারত আর্য্য যোগী ঋষিদিগের গৌরব এবং দেবত্ব ভুলিয়া গিয়া নীচ পশু জীবন ধারণ করিয়াছিল। এখন ভারতবাসী-দিগকে আবার সেই উচ্চ যোগপর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া নীচ অপবিত্র বিষয়কামনা সকল নির্ব্বাণ করিতে হইবে। বহুকাল পরে আবার আর্য্যসন্তানেরা উচ্চ স্থানে বসিয়া উচ্চ যোগ সাধনে নিযুক্ত হইবেন। কতকাল কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ হইয়া বিষয়যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিরিশিখরো-পরি নববিধানরূপ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন।

নববিধানের অভ্যুদয়ে চারিদিক মধুময় হইল; সকল বস্তু জাগিয়া উঠিল। এ সকল গল্পের কথা নহে, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। বৃহৎ-গিরি-উত্থান-উপনিষদ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর এবং বিশ্বাস কর। না দেখিলে কি বিশ্বাস করিবে? তবে বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ। স্বচক্ষে না দেখিলে আমরা কি এ সমাচার ঘোষণা করিতাম? ইহা সত্য না হইলে কে বলিত? ভূগোলে বাল্যকালে হিন্দু-স্থানের উত্তর বিভাগে যে একটি প্রকাণ্ড জড় হিমালয়ের কথা পাঠ করিয়াছিলাম, আমি সে পর্ব্বতের গাত্রোত্থান বলি-তেছি না; কিন্তু যে হিমালয় গুরু হইয়া প্রাচীন আর্য্য-গণকে যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই ভারতের গুরু, সেই প্রাচীন আচার্য্যের নিদ্রাভঙ্গের কথা বলি-তেছি। আগে যেমন সেই হিমালয় কথা কহিয়া উপদেশ দিত

এখনও আবার সেই পর্ব্বত জীবন্ত ভাবে কথা কহিতেছে এবং নবীন বংশীয় ভারতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে ;—

'হে ভারতের নব্য সম্প্রদায়, প্রাচীন কালে যেমন তোমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাছে বসিয়া পরব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করিতেন তোমরাও তাঁহা-দিগের ন্যায় যোগী ও তপস্বী হও। তোমরা আর ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার অর্চ্চনা করিয়া হীন হইয়া থাকিও না। আর্য্যস্থানের প্রাচীন মহত্ত্ব স্মরণ কর। বেদ উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব আবার ধারণ কর। পতিত যোগমুকুট তুলিয়া পুনরায় মস্তকে ধারণ কর। আধুনিক সভ্যতা ও বিষয়-বিলাসে মুগ্ধ হইও না। অসার ধন মানের লালসায় অধ্যাত্মযোগ বিনাশ করিও না। বাহ্যিক জড় জগৎ ছাড়িয়া হৃদয়রাজ্যমধ্যে গভীর ধ্যানে ভূমানন্দ উপভোগ কর। বিজাতীয় জড়বাদ ও জড়াসক্তি পরিহার করিয়া স্বজাতীয় আধ্যাত্মিকতার গৌরব রক্ষা কর। আমি প্রধান হিমাচল তোমাদের বহুকালের গুরু ও বন্ধু, আমাকে অবজ্ঞা করিও না। আমি পরব্রহ্মরূপ পরমরত্ন যেমন তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দিয়াছিলাম, তেমনি আবার তোমাদিগকে দিব। ভারতের মস্তক আমি, আমার মস্তকের মণি ব্রহ্ম-যোগ, সাবধান তাঁহাকে অবহেলা করিও না।'

আমাদের পুরাতন বন্ধু হিমালয় জাগিয়া উঠিয়া এইরূপে আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে ও উপদেশ দিতেছে। বারংবার

মোহ কোলাহল ভেদ করিয়া উহা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে; "যোগ, যোগ, যোগ"। তোমরা কি দেখিবে না? তোমরা কি শুনিবে না? একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ধড় মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তোমরা কি জাগিবে না? একটা কেন? সহস্র সহস্র গিরি, অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী তেজের সহিত চীৎকার করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে এবং নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতেছে। প্রকাণ্ড লেখনী ধারণপূর্ব্বক মহর্ষি হিমালয় নূতন ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বেদাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং কত আশ্চর্য্য নিগূঢ় যোগতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিতেছে। কঠ, তলবকার, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ সকল আবার নূতন আকারে রচিত হইতেছে; বেদান্তশাস্ত্রের নূতন সংস্কার হইতেছে। ঘোর কলির অন্ধকার মধ্যে আবার যেন সত্যযুগের প্রকাশ, পুরাণের রাজ্য মধ্যে আবার বেদের জয়। নিম্ন ভূমির কোটি কোটি নীচ দেবতার নাম পরাজয় করিয়া হিমগিরির উপরে ব্রহ্মনামধ্বনি উত্থিত হইল।

এই যে যুগান্তর হইল, এই যে হিমালয়ের গাত্রোত্থান অথবা ভাবান্তর হইল, ইহা কেবল নূতন বিধানের জন্য। নূতন বিধান স্বর্গ হইতে যেমন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, সেই সময় হরিদ্বারে বলপূর্ব্বক আঘাত করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন;— 'জাগ হিমালয়। দুঃখরজনীর অবসান হইয়াছে, জাগ্রৎ হও, মহাদেবের আদেশ পালন করিয়া ভারতকে উদ্ধার কর।"

দ্বিপ্রহর রজনীর অভেদ্য অন্ধকার ও অচৈতন্যের মধ্যে নববিধানের সিংহরব শুনিয়া এত বড় পাহাড় ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং নববস্ত্র পরিধান করিয়া নববিধানমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহেশের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। সমস্ত হিমাচল বিশ্বেশ্বরের পবিত্র কৈলাসপুরী হইয়া বিশ্বেশ্বরের ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। এমনি নিস্তব্ধ ও গম্ভীর, এমনি প্রকৃতির শোভা, দেখিলেই ইচ্ছা হয় ঐখানে বসিয়া বিরলে বিভুর পদ পূজা করি। বড় বড় দেবদারু সকল দলে দলে দেবদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং বায়ুর সঞ্চালনে মহা ঝঙ্কার করিয়া মহাদেবকে ডাকিতেছে; ইচ্ছা হয় উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই প্রাণেশ্বরকে ডাকি।

হিন্দুস্থানের উত্তর সীমার পর্ব্বতোপরি ব্রহ্মধ্বনি হইল, ঐ ধ্বনি পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিমে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই প্রতিধ্বনি শুনিয়া সমস্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিল, চন্দ্র সূর্য্য, নদ নদী, অগ্নি বায়ু, পশু পক্ষী, সমস্ত প্রকৃতি সমস্বরে ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিল। এই মহোৎসবে সকলে ত্বরায় যোগ দাও। পাহাড়ী নিনাদে জাগ্রত হও এবং পাহাড়ী উৎসাহে উৎসাহিত হও। সামান্য হীন বঙ্গদেশী উদ্যমে চলিবে না। যেখান হইতে ব্রহ্মপ্রত্যাদেশ আসিতেছে, যেখান হইতে ব্রহ্মবিধানের নিশ্বাস প্রবলরূপে বহিতেছে, সেই পাহাড়ের ন্যায় বিশ্বাসী ও যোগী হও। এবার এই ভাবে বৃহৎ

পাহাড়ী যোগধর্ম্মসাধনে ব্রতী হও। এবার আমাদের সমুদায় সাধন প্রণালী, বল উদ্যম, ধ্যান সঙ্গীত, আশা বিশ্বাস, যোগ সমাধি প্রকাণ্ড পাহাড়ী ভাব ধারণ করুক এবং হিমালয়ের ন্যায় অটল ও উচ্চ হইয়া পৃথিবীকে জয় করুক।

হে ব্রাহ্ম, তোমার দ্বারের নিকটে স্বয়ং হিমালয় আসিয়াছেন। মহাদেবের প্রিয় আবাস স্থান কৈলাস-পুর, উহাকে অবহেলা করিও না। হিমালয় তোমাদের হৃদয়ের অনুরাগের বস্তু হউক, তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয় হউক! আর্য্যকুলের মুকুটস্বরূপ ঋষিদিগের ন্যায় তোমরা প্রাচীন বৃদ্ধ হিমালয়কে শ্রদ্ধা ভক্তি কর এবং অপরের সহিত গুরু বলিয়া বন্ধু বলিয়া ভালবাস। হিমালয়ের পথে চলিলে তোমরা মহাদেবকে পাইবে এবং যত মহর্ষি দেবর্ষি যোগর্ষি এই দেশকে প্রাচীন কালে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও সমাধির অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় চিদাত্মারূপে দেখিবে।

হে হিমালয়, তুমি কথা কও, যেমন তুমি চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গে সেইরূপে জীবন্ত ভাবে কথা কও। তুমি আমাদের মুনি ঋষিদের বাসস্থান, তুমি এ দেশীয় ভক্তদিগের সাধনের স্থান, আমরা তোমাকে আদর করিব, তোমার প্রশংসা করিব এবং তোমার নিকট যোগধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইব। তোমার কথা সমস্ত ভারতবর্ষ

গ্রহণ করিবে। কেন না তুমি আমাদের সকলেরই। তুমি কেবল পঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের নহ। তুমি জাতি-বিশেষের অথবা সম্প্রদায় বিশেষের নহ, তুমি আমাদের সকলের সম্পত্তি এবং আর্য্যজাতির গৌরব। তুমি সমস্ত ভারতবর্ষের শিরোভূষণ, তুমি সমস্ত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। সমস্ত আর্য্যবংশীয় হিন্দুবংশীয়দের মস্তকের উপর, সকলের হৃদয়ের উপর তোমার অধিকার। সকলে তোমার পদতলে বসিয়া যোগধর্ম্ম শিক্ষা করুক এবং যোগানন্দ সম্ভোগ করুক।

এক কি তেত্রিশ কোটি।

রবিবার, ২১এ আষাঢ়, ১৮০২ শক; ৪ঠা জুলাই, ১৮৮০।

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে হিন্দুস্থানের প্রাচীন বিবাদ অদ্য মীমাংসা করিতে হইবে। এই দেশে বহুকাল হইতে একটি প্রকাণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সেই সংগ্রামের এক দিকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপর দিকে পৌত্তলিকতা, এক দিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, অন্য দিকে বহু দেব দেবী। এই দুইয়ের মধ্যে যদি সন্ধি স্থাপিত না হয়, তবে অকল্যাণ ও অনিষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যত দিন এই সংগ্রাম চলিবে, তত দিন রাজ্যের কল্যাণ নাই, সামাজিক কুশল নাই, পারিবারিক মঙ্গল নাই। ঈশ্বর এক

কি তেত্রিশ কোটি? হিন্দুধর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলদেশে যদি নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে দেখি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বসিয়া আছেন। কিন্তু বৃক্ষের শাখা গণনা করিয়া দেখি সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের মূলেতে যদিও একেশ্বরবাদ নিহিত, ইহার পৌত্তলিক শাখা প্রশাখা অসংখ্য। এক দিকে একমেবাদ্বিতীয়ম্, আর এক দিকে দুই নহে, পাঁচ নহে, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতা! কিরূপে এদেশে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কি অসম্ভব? এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে কি কোন প্রকারে সন্ধি হয় না? অদ্য এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাতে আমরা প্রবৃত্ত হই। আর্য্য সমাজের আদিতে এক ঈশ্বর পূজা প্রবর্ত্তিত ছিল, কালক্রমে যখন পুরাণাদি রচিত হইল, তখন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অথবা অসংখ্য দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। আদিতে ব্রহ্মপূজা অন্তে মূর্ত্তিপূজা। এক বীজ হইতে কোটি কোটি শাখা উৎপন্ন হইল। এক কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল? তেত্রিশ কোটি কিরূপে একের মধ্যে ছিল? এ অদ্ভুত তত্ত্ব-রহস্য শুনিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়। কিন্তু এ অপূর্ব্ব কথা কে বলিবে? নববিধান! যেখানে নববিধানের বিজয়-নিশান উড়িতেছে সেইখানেই এই দুই বিরুদ্ধ মতে সন্ধি ও সম্মিলন দেখিতেছি। আর কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিল

না, দিতে পারিল না। কেবল নববিধানই ইহার উত্তর দিতে পারেন ও দিবেন। ভারতবর্ষ নববিধানের নিকট এই সুসমাচার শ্রবণ করিবেন!

ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী অনেকে তেত্রিশ কোটি শব্দ শুনিবামাত্র রাগে প্রজ্বলিত হন এবং উহা সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া উহার মূলতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ ও পরিহার করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মপূজা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। হিন্দুদিগের এই যে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ইহা অসার খোসার ন্যায় কেবল বাহ্যিক আচ্ছাদন মাত্র, উহার ভিতরে ব্রহ্মস্বরূপের খণ্ড খণ্ড যে সকল ভাবরূপ শস্য নিহিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত সুকৌশলে বাহির করিয়া লইতে হইবে, তবে এই দেশ হইতে তেত্রিশ কোটি উপধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইবে। সে সমস্ত শস্য বাহির করিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ এখনও পৌত্তলিকতা পরাজয় করিতে সক্ষম হন নাই। নববিধান এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যে ভারতভূমিতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের নিশান উড়িয়াছে, সেই নিগূঢ় ভূমিতে ঘটনা-সূত্রে ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি দেবদেবীর মন্দির স্থাপিত হইল। এ সকল ঘটনার মধ্যে কি, হে ব্রাহ্ম, তুমি কোন আশ্চর্য্য সত্য উপলব্ধি করিতেছ না? যোগবিহীন চক্ষে এ সকল কেবল অসার পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কার মনে হয়, কিন্তু

যখন যোগচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তখন যোগপ্রভাবে ঐ তেত্রিশ কোটির মধ্যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তেত্রিশ কোটির প্রত্যেকের ভিতর এক একটি সত্য আছে, যাহা প্রতি ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়। দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা আমাদের পক্ষে অসত্য ও পাপ এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য। কিন্তু মূর্ত্তি পরিহার করিতে গিয়া উহাতে যে ভাব মূর্ত্তিমান্ ছিল তাহা যেন আমরা ছাড়ি না। হিন্দুস্থানে যে অসংখ্য অগণ্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত তৎসমুদায় ব্রহ্মস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও বিভক্ত প্রতিভা মাত্র। দেব দেবীর ভিতর হইতে যদি আমরা নিগূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমাদেরই ভ্রান্তি, অনিষ্ট ও অকল্যাণ। এক ব্রহ্মেরই ভিতরে তেত্রিশ কোটি বিভিন্ন ভাব বিরাজ করিতেছে।

হে ব্রাহ্ম, যখন তুমি আলোক দেখ তুমি আলোককে এক বর্ণ মনে কর; কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান সেই আলোকের এক একটি শুভ্র কিরণের মধ্যে সাতটি চমৎকার বিভিন্ন বর্ণ দেখাইয়া দেয়। সাদার ভিতরে লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ থাকে কে জানে? শুভ্র সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে সাত প্রকার বিচিত্র বর্ণ আছে তাহা কি অজ্ঞান চক্ষু দেখিতে পায়, না মূঢ় মন কল্পনা করিতে পারে? যখন বিজ্ঞানবিৎ এক খণ্ড কাচের মধ্যে শুভ্র সূর্য্যকিরণকে প্রবিষ্ট করিয়া বিভাগ করিয়া ফেলেন, তখন তিনি উহার ভিতর সাত প্রকার বিভিন্ন বর্ণ দেখিয়া বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া

ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করেন;—"হে ঈশ্বর তুমি ধন্য, তোমার দুরবগাহ্য জ্ঞান কৌশল ধন্য। তুমিই কেবল উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ লুকাইয়া রাখিতে পার।" যেমন একটি শুভ্র বর্ণের মধ্যে লাল নীল প্রভৃতি সাতটি বিচিত্র-বর্ণ লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ এক ব্রহ্মের মধ্যে তেত্রিশ কোটি ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। হে হিন্দু, তোমার মহা-দেব, তোমার বিষ্ণু, তোমার সরস্বতী, তোমার লক্ষ্মী, তোমার গণেশ কার্ত্তিক, তোমার দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সমস্ত আমার ব্রহ্মের মধ্যে গুণরূপে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, পুরী, গয়া, কাশী, সর্ব্বত্র আমার ব্রহ্মের মন্দির। তোমার দেবালয়ে আমার ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তোমার তেত্রিশকোটি দেবতার তেত্রিশকোটি অঙ্গ একত্র করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মস্বরূপ ভক্তি-কাচে পড়িলে কোটি কোটি বিচিত্র বর্ণে বিভক্ত হয়। আবার ঐ সমুদায় বর্ণ সংযুক্ত করিয়া যোগনয়নে দেখিলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম দৃষ্ট হইবে।

যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ হও তবে, হে ব্রাহ্ম, তুমি বুঝিবে তোমার ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এই হিন্দুস্থানে মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। এ সকল পৌত্তলিক মূর্ত্তি তোমার পূজনীয় নহে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিহিত গুণনিচয় তোমার ব্রহ্মেরই, সুতরাং অবশ্য আরাধ্য। ব্রহ্মগুণের অবজ্ঞা পাপ। অতএব তুমি সারগ্রাহী গুণগ্রাহী হইয়া সমুদায় হিন্দু দেবতার যথার্থ

ভাব, চরিত্রের বিভিন্ন গুণ গ্রহণ কর। ব্রহ্মকে আদর করিলে ব্রহ্মগুণের আদর করিতে হইবে। যত দেবদেবী, যত সাধু সাধ্বী, যত অবতার সকলের মধ্য হইতে ব্রহ্ম গ্রহণ কর। কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি এ দেশে প্রকাশিত হইত না, কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি তাহার মধ্যে ব্রহ্মের কোন একটি গুণ না থাকিত। অযোধ্যাতে রামের মন্দির হইত না, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের মূর্ত্তি হইত না, উৎকলে জগন্নাথের মন্দির হইত না, গয়াতে বুদ্ধদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইত না, যদি এ সকল ব্যাপারের মধ্যে বিচিত্র গুণনিধি ব্রহ্মের এক একটি বিশেষ গুণ না থাকিত।

ভক্ত হিন্দু যখন দেখিলেন তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার দেশে বত্রিশ কোটি দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও তাঁহার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। তিনি বলিলেন, "এখনও আমার সমুদায় সাধ মিটে নাই। আমি ঈশ্বরের আরও এক কোটি রূপ দেখিতে চাই।" সমুদয় তেত্রিশ কোটি ভাবের সাধন না হইলে হিন্দুর বক্ষে কোন মতেই পূর্ণ শান্তি হয় না। হিন্দুর মন অতিশয় প্রেমিক ও ভক্ত এই জন্য অল্পেতে তাহার ধর্ম্মক্ষুধা মিটিল না। নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ ও ব্রহ্মলীলা দর্শন করিব এই মানসে ক্রমাগত সাধন ভজন করিল, সুতরাং তাহার আর অন্ত হইল না। ক্রমে তেত্রিশ কোটি হইয়া পড়িল। মনে করিও না যে উহা একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা। তেত্রিশ কোটির অর্থ অসংখ্য।

এক নহে, তেত্রিশ কোটি নহে, অসংখ্য ও গণনাতীত। কি অসংখ্য? ঈশ্বর অসংখ্য? না। ঈশ্বর এক। ঈশ্বর কি কখন অনেক হইতে পারেন? তবে তাঁহার লীলা কার্য্য বিচিত্র। অনন্ত আকাশরূপ ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" লেখা রহিয়াছে। মূল এক, শাখা পত্র অনেক। এক ঈশ্বরেতে অসংখ্য ভাব। এক নিরাকার ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার কার্য্যরীতি ও ভাবের প্রকাশ অসংখ্য। হরি এক, হরিলীলা বিচিত্র।

হিন্দুস্থান অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন একটি একটি রূপ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিল। এই ভ্রমে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। যাই বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিল অমনি ব্রাহ্ম হিন্দুস্থান পৌত্তলিক হিন্দুস্থান হইল। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং আদি সনাতন ব্রহ্মরূপকে সাকার গঠন হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য নববিধান স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু নববিধান কি "মার মার" শব্দ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? না। তিনি বলিলেন;—"দেবভাবে দেবভাবে বিবাদ হইতে পারে না। ঈশ্বর কি আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করিতে পারেন? আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিতে পারেন?" নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম যোগনয়নে দেখিলেন ব্রহ্মাধারে সেই খণ্ড খণ্ড সমুদয় জ্যোতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এক ব্রহ্মে তেত্রিশ কোটি দেবভাব একীভূত হইয়া রহিয়াছে।

হে সাধক, তুমি যদি তেত্রিশ কোটি দিন এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পার, তাহা হইলে তুমি তোমার প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের এক এক নূতন রূপ দেখিতে পাইবে। যে দিন জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর সাধন করিবে সেই দিন তুমি অনেক নূতন সত্য শিক্ষা করিতে পারিবে এবং বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরের লক্ষ্মীভাবের আরাধনা ও পূজা করিবে, সে দিন দেখিবে জগজ্জননী সত্য সত্যই তোমার সংসারের লক্ষ্মী হইয়া সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, ধন ধান্য দিয়া পরিবারের সকলের অভাব মোচন করিতেছেন এবং আশ্চর্য্য সুকৌশলে কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যে দিন তুমি ঈশ্বরকে শক্তিরূপে পূজা করিবে, সেই দিন তোমার দুর্ব্বল মনে বলের সঞ্চার হইবে। যতই সেই আদ্যাশক্তিকে অন্তরে বাহিরে দেখিবে ততই তোমার অন্তরে বল শক্তি উদ্যম ও তেজ প্রস্ফুটিত হইবে। আবার যে দিন তুমি ঈশ্বরকে অনন্ত করুণারূপে দেখিবে সে দিন তুমি বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিতেছেন এবং পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য সময়ে সময়ে নূতন নূতন ধর্ম্মবিধান প্রেরণ করিতেছেন। যতই তাঁহার অনন্ত করুণা ভাবিবে ততই তুমি ভক্তিরসে বিগলিত হইবে এবং প্রেমার্দ্র হৃদয়ে নরনারীর সেবাতে নিযুক্ত

হইবে। কোন দিন ব্রহ্মের নির্ব্বাণরূপ দর্শন করিয়া মনের সমস্ত চিন্তা জ্বালা ও বাসনানল নিবাইতে এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কখন আনন্দস্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া তোমার চিত্ত দুঃখ শোক বিস্মৃত হইয়া অপার হর্ষসাগরে ডুবিবে, তুমি সুখী মাতার ক্রোড়ে সুখী পুত্র হইয়া বসিবে। এইরূপে দশ দিনে দশ প্রকার, সহস্র দিনে সহস্র প্রকার ভাবে ব্রহ্মারাধনা করিবে, এবং প্রত্যহ নূতন নূতন ব্রহ্মরূপ দর্শন করিবে। কখন পিতা, কখন মাতা, কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন চিত্তহারী, কখন মনোমোহন, কখন অসুরসংহারক, কখন পাষণ্ডদলন, এইরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তোমাদের হরি তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন এবং এই বিচিত্র সাধনের নবীনত্ব কখন শেষ হইবে না। এইরূপে তোমরা এক নিরাকার ব্রহ্মের মধ্যে অসংখ্য নিরাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একেতে তেত্রিশ কোটি এবং তেত্রিশ কোটিতে এক অনুভব করেন! এক ব্রহ্মতে তেত্রিশ কোটি, এবং তেত্রিশ কোটির মধ্যে এক ব্রহ্মকে না দেখিলে, ব্রাহ্মগণ তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম আস্বাদন করিতে পারিবে না। যদি এক ব্রহ্মেতে তোমরা অসংখ্য মূর্ত্তি না দেখিতে পাও তাহা হইলে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পাও নাই। সুতরাং তোমাদের দৈনিক প্রার্থনা শুষ্ক নীরস এবং পুরাতন

হইবে। যাহাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা একই প্রকার হয় এবং নূতনত্ব ও বিচিত্রতাবিহীন তাহারা এক প্রকার পৌত্তলিক। কেন না তাহারা এক নির্জীব পাথরের ন্যায় দেবতার উপাসক। মৃত দেবতা নড়ে না, একই ভাবে পড়িয়া থাকে, তাহাতে জীবন নাই, সুতরাং ভাবেরও পরিবর্ত্তন নাই। যে মৃত দেবতার পূজা করে, সেও মৃত ব্যক্তির ন্যায় নির্জীব হইয়া যায়। মূর্ত্তিপূজা ছবিপূজা মানুষকে পুতুলের ন্যায় ছবির ন্যায় নির্জীব করিবেই করিবে। যদি যথার্থ ঈশ্বরের উপাসক হও, তাহা হইলে তোমাদের উপাসনা নিত্য নূতন এবং চিরসরস হইবে।

আমাদের ঈশ্বর শুষ্ক মৃত পাথরের ন্যায় নহেন। হে ব্রাহ্ম, তোমার ঈশ্বর নিত্যনূতন। যেখানে জীবন সেখানেই পরিবর্ত্তন ও নবীনতা। যিনি জীবন্ত ঈশ্বর তিনিই কেবল চিরনবীন, তাঁহারই সাধন সদা সরস। তুমি আজ পুণ্যময় হরির পূজা কর, কাল যোগেশ্বরের পূজা কর, তাহার পর দিন ভক্তবৎসলের পূজা কর, এক এক দিন ঈশ্বরের এক এক রূপের সাধন কর। এইরূপে যদি তুমি ঈশ্বরের নিত্যনূতন রূপ সাধন কর, তাহা হইলে তোমার প্রতিদিনের প্রার্থনা পুস্তকে লিখিত হইলে দেখিতে পাইবে ৩৬৫ দিনে তুমি ৩৬৫ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছ, এবং যদি তুমি তেত্রিশ কোটি দিন বাঁচিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি রূপ দেখিয়া কোটি কোটি ভাবরসে প্লাবিত হইবে। ব্রাহ্ম,

তেত্রিশ কোটি দিন অপেক্ষাও তোমার আয়ু অধিক, অসংখ্য দিন তোমার জীবন, সুতরাং ইহকাল পরকালে তুমি ঈশ্বরের অসংখ্যরূপ দেখিতে পাইবে, এবং অসংখ্য জাতীয় ভাবকুসুম লইয়া তুমি অসংখ্যরূপধারী ঈশ্বরের পূজা করিতে পারিবে।

ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি বিচিত্রলীলারসময় ও অসংখ্য-রূপধারী, সুতরাং হে ব্রাহ্ম, তোমার ভাব এক প্রকার হইতে পারে না। যখন তোমার ঈশ্বর জীবন্ত এবং অনন্ত প্রাণ ও অসংখ্য ভাবের আধার, তখন তোমার পূজা অর্চ্চনার ভাবও অসংখ্য এবং জীবন্ত হইবে। তোমার দেবতা এক; কিন্তু তাঁহার দেবভাব তেত্রিশ কোটি। পূজা করিবে কেবল এক জনের, দুই জন কি ততোধিক কল্পনাও করিতে পারিবে না; কিন্তু সেই এক দেবতার যত বিচিত্র ভাব আছে সমুদায় সাধন করিতে হইবে; নিত্য নূতন ভাবে নবীনের অর্চ্চনা করিবে। যে অনেক দেবতা মানে সে তো পৌত্তলিক, যে তেত্রিশ কোটি দেবভাব না মানিয়া একখানি মৃত পুরাতন কল্পনার আরাধনা করে সে ব্যক্তিও পৌত্তলিক। হে ব্রাহ্ম, তুমি অপৌত্তলিক হও। তোমার ব্রহ্ম অনন্তভাবপ্রস্রবণ। তাঁহা হইতে অবিশ্রান্ত নব নব দেবভাবের স্রোত বাহির হইতেছে, তুমি সেই স্রোতে প্রাণকে শীতল ও সুখী কর। তোমার দেবতা অশেষ রত্নখনি, তাঁহার ভিতর হইতে বিচিত্র বর্ণের বহুমূল্য ভাবরত্ন প্রতিদিন সঞ্চয় কর, প্রত্যহ

নূতন সুরে নূতন ভাবে নূতনের গুণ গান কর এবং তাঁহার বিচিত্রলীলারঙ্গে মত্ত হইয়া নৃত্য কর। তোমার ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তুমি তাঁহার দশটি ভাবও ভালরূপে সাধন করিলে না। আলস্য, নির্জ্জীবতা, শুষ্কতা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন অনুরাগের সহিত ব্রহ্মের এক একটি বিভিন্ন রূপনদীতে স্নান কর এবং জীবনেশ্বরের বিভিন্ন স্বর্গলোকের বিচিত্র স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ কর।

বাগ্‌দেবী।

রবিবার ২৮এ আষাঢ়, ১৮০২ শক; ১১ই জুলাই ১৮৮০।

আমার অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার শত্রু-দিগকে আমি পরিণামে দেবপ্রসাদে পরাজয় করিব। যাহারা সত্যবিরোধী, যাহারা ঈশ্বরবিধানবিরোধী তাহারা কখনই জয় লাভ করিতে পারিবে না আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমার আক্রমণকারী শ্রেণীর মধ্যে প্রধান শত্রুদলে তাহারা, যাহারা এক প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি সহকারে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা আনয়ন করিতেছে। সামান্য মূর্ত্তিউপাসকদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়, যাহারা মুখে আপনা-দিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু চলে না, বলে না,

নড়ে না, জীবনের লক্ষণ দেখায় না এমন এক কল্পিত দেব ছায়া পূজা করে।

হে জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম, তুমি কি সে অসার ঘৃণিত পদার্থকে ব্রহ্ম বলিতেছ, যে পদার্থ সহস্র প্রার্থনার একটি উত্তরও দিতে পারে না, যে পদার্থ কথা বলিতে নিতান্ত অক্ষম? এমন অসৎ অসার কল্পিত বস্তুকে ব্রহ্ম নাম দিও না। যে বস্তুর কথা কহিবার শক্তি নাই, যাহা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না তাহা কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি বাক্যস্বরূপ, তাঁহার নাম বেদ। যে বাক্য নহে, যে কথা কহে না সে তো কল্পিত অসুর। সেই অসুর পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মনুষ্যকল্পনা হইতে প্রসূত হইয়াছে। যে ঈশ্বর উপদেশ দেয় না, যে ঈশ্বর পাপের প্রতিবাদ করে না, যে ঈশ্বর পাপের দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক অকল্যাণের হেতু। যদি তুমি এক প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বলিয়া স্বীকার কর, এবং ঐ পাথরের সমক্ষে মিথ্যা বল, প্রবঞ্চনা কর, নরহত্যা কর, ঐ পাথর তোমাকে ভর্ৎসনা করিবে না। পাথর কি কথা কহিতে পারে? না কখন কথা কহিয়াছে? সুতরাং পাথরকে তুমি ভয় করিবে কেন? উহার সমক্ষে তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।

দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইবে বলিয়া বুঝি তুমি এমন এক বাক্যহীন পাথরের ন্যায় ব্রহ্ম কল্পনা

করিয়াছ যে তোমাকে কিছুমাত্র শাসন করিতে পারিবে না। তুমি তোমার শাণিত কুবুদ্ধির অস্ত্রে বাক্যস্বরূপ ব্রহ্মের রসনাটী কাটিয়াছ, তুমি বলিতেছ তোমার ব্রহ্ম কথা কহেন না। কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক চতুরতা! তুমি আপনি আপনার দেবতার রসনা কাটিলে, এখন বলিতেছ, ঈশ্বর কথা কহেন না! তোমার ভয়ানক মত কেবল স্বেচ্ছাচারী শাসনবিমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট আদরণীয় হইতে পারে কিন্তু উহা কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে জয় লাভ করিতে পারে না। যাহারা মনে করে ঈশ্বর কথা কহেন না, তাহারা যথার্থ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহারা অহঙ্কারী অবিশ্বাসী দলভুক্ত। ঈশ্বরের রাজ্যে অবিশ্বাস নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে। সত্যের জয়, বিশ্বাসের জয় হইবেই হইবে। তোমরা কি মনে কর যে বাগ্‌দেবতা তোমাদের মনোনীত হইলেন না বলিয়া তোমরা তাঁহার রসনা ছেদন করিয়া অঙ্গহীন দেবতার পূজা জগতে স্থাপন করিবে? এরূপ আশাকে মনে তিলার্দ্ধ স্থান দিও না। সত্য দেবতা তোমাদের দর্প চূর্ণ করিয়া আপনার নিশান নিখাত করিবেন। যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিহার করিয়া সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে চাও তবে ঈশ্বরকে বাক্যস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ কর।

যথার্থ ঈশ্বর বাগ্‌দেবতা। হিন্দুস্থানে ঈশ্বরের যে ভাব সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মগণ, তোমরা সে ভাব অবহেলা করিতে পার না। তোমরা কে? জগজ্জননী জ্ঞানদেবী সর-

স্বতীর সন্তান। তোমরা তাঁহারই উপাসক। তিনি চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী বাগ্‌দেবী। তিনি বাক্যস্বরূপ। কেমন বাক্য? নিত্য বাক্য, অশেষ অবিনশ্বর বাক্য, সত্য বাক্য, অভ্রান্ত বেদ-বাক্য। বাক্যই তিনি। বাক্য কি? সেতুস্বরূপ। এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে পৃথিবী, মধ্যে ঈশ্বরবাণী সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেতু বন্ধ হউক, ঈশ্বর আর মনুষ্যের যোগ থাকিবে না। ঈশ্বরের বাক্য বন্ধ হইলে পৃথিবীর লোক-দিগের সঙ্গে এক প্রকার সম্পর্ক ঘুচিল। ঈশ্বরের বাক্যে-তেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সেই বাক্যেতেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি। যদি ব্রহ্মবাণী না থাকে তবে পাপী সহস্রবার প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিলেও স্বর্গ হইতে কোন উত্তর পাইবে না। কলিকাতা এবং হাবড়ার মধ্যে যদি সেতু না থাকে তথাকার লোকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সংশ্রব রহিল না এবং আমাদের পক্ষে তাঁহাদের থাকা না থাকা সমান। সেইরূপ যদি ঈশ্বর গুরু হইয়া সদুপদেশ না দেন, কথা না কহেন, দুঃখীর প্রার্থনার উত্তর না দেন, অনন্তকাল মৌনীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখী পৃথিবীর পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা সমান। যদি ব্রহ্মবাক্যরূপ সেতুর যোগ না থাকে তবে ঈশ্বরের সদ্‌গুরু ও পরিত্রাতা হওয়া অসম্ভব। কেন না তিনি উপদেশের কথা না বলিলে কিরূপে শিক্ষা দিবেন, কিরূপে শাসন সংশোধন করিবেন? বাক্য ঈশ্বরের বাহন, বাক্য আরোহণ

করিয়া ঈশ্বর এই দুঃখী জগতে অবতীর্ণ হয়েন। বাক্যই ব্রহ্মপক্ষীর পক্ষ। ইহার সাহায্যে স্বর্গ হইতে ব্রহ্মপক্ষী নামিয়া আসেন। বাক্যপক্ষ কাটিয়া দেও ঈশ্বরের অবতরণ অসম্ভব।

এত কাল হিন্দুস্থানে সরস্বতীর যে আদর হইয়াছে ইহার কি কোন অর্থ নাই? সরস্বতী মূর্ত্তির অর্থ কি? সরস্বতী বিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি স্বয়ং বিদ্যা-স্বরূপা। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞান-জ্যোতি অতিশয় শুভ্র; উহার অভাবই অজ্ঞান অন্ধকার। জ্ঞান আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যায় কাল। যাঁহারা আদিতে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ও ধ্যান ধারণ করিতেন। এই জন্যই কালক্রমে পৌত্তলিকেরা সরস্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মল শুভ্র বর্ণে চিত্রিত করিল। জ্ঞান শুভ্র জ্যোতিস্বরূপ। ঐ জ্ঞানকে ঘন কর, আরও ঘন কর, ক্রমে খুব ঘনীভূত কর। অবশেষে একটী সাদা মূর্ত্তি কল্পনাতে নিষ্পন্ন হইল। হিন্দুস্থান উহাকে সরস্বতী নাম দিল, এবং ঐ ঘন শুভ্র প্রতিমাকে প্রণাম করিল।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যোগবলে জড় প্রতিমাকে উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকার বিদ্যাকে দেখিয়া বলিলাম;—"হে নিরাকারা বাগ্‌দেবী সরস্বতী, তোমাকে প্রণাম করি।" ব্রাহ্মের সরস্বতী, বাহিরের ক্ষুদ্র প্রতিমা নহে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শুভ্র জ্ঞানজ্যোতি যাহা অনন্ত

আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্ত আকাশব্যাপিনী সরস্বতী। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে যোগচক্ষে যে দিকে তাকাও সেই দিকে এই ত্রিভুবনব্যাপিনী ত্রিভুবনেশ্বরীকে দেখিতে পাইবে। এই অনন্ত সরস্বতী বাগ্‌দেবী ব্রাহ্মদিগের পূজনীয় স্তবনীয় দেবতা। ইহাঁর অর্চ্চনা না করিলে জীবের মূঢ়তা এবং অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয় না। ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়া জীব অজ্ঞানতিমির হইতে মুক্তিলাভ করে। ইনিই জ্ঞান দান করেন, ইনি সদুপদেশ দিয়া ভ্রম ও অসত্য বিনাশ করেন। ইনি যেমন বিদ্যাদায়িনী জ্ঞানদেবী তেমনি সুমধুর বীণাধারিণী সঙ্গীতের দেবী। সদ্‌গুরু হইয়া ইনি সত্য শিক্ষা দেন, ইহাঁর স্বরও অতি সুমিষ্ট। ইহাঁর প্রত্যেক কথা সার সত্যগর্ভ এবং মধুর ও কোমল, সুললিত সঙ্গীত অপেক্ষাও সুমধুর, ইহাঁর কণ্ঠ কোমল কণ্ঠ। যেমন ইহাঁর নির্ম্মল বিমল জ্ঞানের প্রভা দেখিলে মন আলোকিত হয় তেমনি ইহাঁর কোমল কণ্ঠের সুস্বর শুনিলে প্রাণ বিমোহিত হয়। ইনি জ্ঞানের ঈশ্বর, সুরেরও ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বদা জ্ঞানের কথা বলেন এবং ইহাঁর প্রত্যেক কথা অমৃতের ন্যায়। ইনি বাগ্‌দেবী সুরেশ্বরী। ইনি অনন্ত ব্রহ্মের একটি স্বরূপ। ইনি জগজ্জননীর প্রকৃতির এক অংশ।

কেহ কেহ ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া সরস্বতীকে সাকার মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমরা কি মূল সরস্বতী ব্রহ্মপ্রকৃতিকে

অস্বীকার করিব? শাখার দোষ বলিয়া মূল পরিত্যাগ করিব কেন? নদী বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া যে হিমালয় হইতে নদী বিনিঃসৃত হইতেছে আমরা সেই হিমালয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যখন এ দেশে মূর্ত্তি সরস্বতী সৃষ্ট হয় নাই, তখনও অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে নিরাকারা সরস্বতী বাস করিতেছিলেন। বাগ্বাদিনী সরস্বতী সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। ব্রহ্মের হৃদয়বাসিনী বাগ্‌দেবী সরস্বতীর মুখ হইতে সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্টির আজ্ঞা বাহির হইল, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইল। তখন অবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বাক্য বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাক্যের বিরাম নাই। কি দিবসে, কি রজনীতে, তিনি অনবরত বাক্য বলিতেছেন। সরস্বতীর জিহ্বার বিশ্রাম নাই, এবং তাঁহার বীণাও অবিশ্রান্ত বাজিতেছে। বীণাপাণীর সাধকগণ, যখনই তোমরা কাণ পাতিবে তখনই তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। যদি জ্ঞান চাও, যদি নূতন নূতন সত্য শিখিতে চাও, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম চাও তবে তাঁহার শান্তিপ্রদ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ কর। সরস্বতীর জিহ্বা হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হইতেছে তাহা জ্ঞান এবং শান্তি উভয়ই দান করে।

হে ব্রাহ্ম, তুমি কদাপি মনে করিও না যে, তোমার ব্রহ্মের জিহ্বা নাই। তাঁহার এক অনন্ত আকাশব্যাপী জিহ্বা আছে।

সেই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বর অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল অসংখ্য ভাষায় অসংখ্য কথা বলিতেছেন, এবং জীবের হিতের নিমিত্ত যোগ ভক্তি প্রভৃতি বিচিত্রতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্ম যখন তুমি স্বীকার কর যে তোমার ঈশ্বরের শুনিবার শক্তি অর্থাৎ কাণ আছে, তুমি কিরূপে বলিবে যে তাঁহার কথা বলিবার শক্তি অর্থাৎ মুখ নাই? যিনি তোমার শত শত প্রার্থনা শুনিতে পারেন, তাঁহার কি প্রার্থনার উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই? কি ভয়ানক অসঙ্গত কথা। যাঁহার কাণ আছে নিশ্চয়ই তাঁহার জিহ্বাও আছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে সাকার দোষ পড়ে। কখনই না। যদি ব্রহ্ম কাণ বিনা শ্রবণ করেন, তিনি কি জিহ্বা বিনা, মুখ বিনা কথা কহিতে পারেন না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার ঈশ্বর শ্রবণহীন হইয়াও তোমার সুদীর্ঘ প্রার্থনা সকল শ্রবণ করেন, তবে ইহা কেন বিশ্বাস কর না যে জিহ্বাবিহীন হইয়াও তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন? শুনিতে পারেন বলিয়া তিনি সাকার হইবেন না, তবে বলিতে পারেন বলিয়া কেন সাকার হইবেন? যদি ঈশ্বরের উত্তর দিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাঁহার প্রার্থনাদি শুনিবার প্রয়োজন কি? শুনিবার যন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, অথচ ঈশ্বর আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার বাক্য বলিবার যন্ত্র নাই, অথচ অনবরত বাক্য বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে, কবে শেষ হইবে কেহ জানে না।

ব্রহ্মবাণীর শেষ নাই। মানুষ অর্দ্ধ ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা করে এবং তাহার পর অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু ঈশ্বর অনন্তকাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কত কোটি ভাষায় কোটিভাবে বক্তৃতা করেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সেই জাতীয় ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দীন, পাপী সাধু সকলের সঙ্গে প্রতিজনের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিতেছেন। তিনি সকল ভাষা জানেন। তাঁহার অজানিত কোন বিদ্যা কিংবা কোন ভাষা নাই। আমাদের ব্রহ্মের মুখ হইতে অসংখ্য বেদ বেদান্ত, অসংখ্য পুরাণ কোরাণ নিয়ত বাহির হইতেছে। আমাদের ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র কত কে জানে? খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের এক বাইবেল, মুসলমানদিগের এক কোরাণ; কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কত তাহার সংখ্যা নাই। কেন না আমাদের ঈশ্বর অবিরত কথা কহিতেছেন, তাঁহার কথার বিরাম নাই। সুতরাং আমাদের বেদ বেদান্তেরও অন্ত নাই। প্রতি বর্ষে প্রতি মাসে প্রতি পক্ষে প্রতি দিনে প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে সেই সদ্গুরু উপদেশ, আদেশ, ও প্রত্যাদেশ বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। তিনি অহর্নিশি তোমাকে তোমার মত, আমাকে আমার উপযোগী, অপর একজনকে তাহার প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন। মনে করিয়া দেখ, কত কোটি কথা ও কত প্রকার কথা তাঁহার বলিতে হয়।

ঠিক মানুষ যেমন বক্তৃতা করে, তেমনি আমাদিগের জননী বাগ্‌দেবী সরস্বতী অনন্ত আকাশরূপ বেদীর উপরে বসিয়া সুমিষ্ট ভাষায় কত উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার ন্যায় এমন সুবক্তা এমন উৎকৃষ্ট আচার্য্য, এমন সদ্‌গুরু আর কেহই নাই। তাঁহার বেদীর চারিদিকে বসিয়া কোটি কোটি শিষ্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বের কথা নহে; কিন্তু সত্য সত্যই অগণ্য যোগী ঋষি, অগণ্য সাধু ভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্ন্যাসী, সেই অনন্ত আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিতেছেন। অনন্ত আকাশসিংহাসনে বসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক বৃহৎ গুরু, বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন;—চোর চুরী করিস্ না; স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচার করিস্ না, সংসারী সংসারে ডুবিস্ না, অবিশ্বাসী অবিশ্বাস করিস্ না। ব্রাহ্ম, যোগ সাধন কর; প্রেমিক, একেবারে ভক্তিরসে প্রাণকে নিমগ্ন কর। এইরূপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে নানা প্রকার বিধিনিষেধপূর্ণ উপদেশ দিতেছেন।

ব্রহ্মের উপদেশ কখন থামে না, তাঁহার বক্তৃতা অবিরাম হইতেছে; কেবল বিবেককর্ণ পাতিলেই শুনা যায়। কি মধ্যাহ্নকালে কি নিশীথে যখন ইচ্ছা কর তখনই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবে। তুমি অবসন্ন হইতে পার; আর শুনিতে পার না বলিয়া কাণ বন্ধ করিতে পার; কিন্তু ব্রহ্মের বাক্য-সমীরণ ক্রমাগত চলিতেছে। শ্রোতাদিগের ক্লান্তি হয়; কিন্তু বক্তার শ্রান্তি হয় না। শ্রোতা থাকুক আর না থাকুক,

বাক্যস্বরূপ ব্রহ্ম, বাগ্‌দেবী সরস্বতী অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতেছেন। কেন না বক্তৃতা করাই তাঁহার স্বভাব। বাক্যস্বরূপ কিরূপে বাক্যবিহীন হইয়া থাকিবেন? এমন নিত্য বাগীশ্বরী মধুরভাষিণী সরস্বতী আর কি কোথাও দেখিয়াছ? ব্রহ্মমুখ হইতে জীবন্ত জ্ঞানস্রোত বিনিঃসৃত হইয়া জীবের অজ্ঞান জঞ্জাল দূর করিতেছে। সরস্বতীর নির্ম্মল মুখ হইতে সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া সাধকদিগের মনের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে। কি তেজস্বী বক্তা! অনেক মানুষের বক্তৃতা শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মের বক্তৃতার ন্যায় এমন জীবন্ত জ্বলন্ত বক্তৃতা আর কোথাও শুনি নাই। জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী ক্রমাগত বিচিত্র জ্ঞানতত্ত্ব প্রসব করিতেছেন। মনুষ্যমনে যত সত্য যত ভাবের বিমল কিরণ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় সরস্বতীর জ্যোতি। ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, সরস্বতী ছাড়া সকলই দুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্ম্মতি।

স্বয়ং ব্রহ্ম অনন্ত সরস্বতী হইয়া মনুষ্যের মনে দিব্য জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেন এবং মধুর সঙ্গীতচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। জীবকে মোহজাল এবং অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানরূপে, বিদ্যারূপে, বাগ্‌দেবী সরস্বতীরূপে তাহার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দান করেন। তিনি স্বয়ং সত্যরূপে সুবুদ্ধি ও সুমতিরূপে মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হন। সত্য কেবল

দেবদত্ত নহে, সত্যই দেবস্বরূপ এবং আরাধ্য বস্তু। তোমাদের মনের সুনীতি সুমতি কে তাহা জান? তাহারাই স্বয়ং সরস্বতী এবং তোমাদের বরণীয়। যত কিছু শুভ জ্ঞান ও শুভ ভাব তোমাদের অন্তরে আসিতেছে, সে সমুদায় বাগ্‌দেবীর মুখের কথা। জলস্রোতের ন্যায় দিনরাত্রি উহা মনুষ্যমনে কলকলরবে ধাবিত হইতেছে, উহার শেষ নাই। ব্রহ্ম কথকের কথা আর শেষ হয় না। দশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর, যত বৎসর ইচ্ছা কর তাঁহার কথকতা অন্তরে শুনিতে পার। তাঁহার মুখে নিত্য ভাগবত নিত্য মহাভারত শুন, তিনি আহ্লাদের সহিত শুনাইবেন। তিনি নূতন নূতন ঋক্‌, যজু, সাম, অথর্ব্ব, নূতন বেদ বেদান্ত এবং নূতন পুরাণ তন্ত্রাদি শুনাইবেন। ইংরাজী সংস্কৃত যে কোন ভাষায় উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর, সেই ভাষায় তিনি উপদেশ দিবেন। পর্ব্বতশিখরে নদীতটে গৃহে কাননে যেখানে ইচ্ছা সেই খানে শিক্ষা দিবেন। প্রেমতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব যোগতত্ত্ব নীতিতত্ত্ব যাহা চাও তাহাই তিনি শিক্ষা দিবেন।

ব্রহ্মের মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির আশঙ্কা করিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রান্ত পরা বিদ্যা তাঁহারই নিকটে পাইবে। সে জ্ঞান কঠোর নহে, অতিশয় সুমিষ্ট। বাগীশ্বরী একটীও কর্কশ কথা বলেন না, বলিতে পারেন না। কোমল নারীকণ্ঠ হইতে কর্কশ রূঢ় কথা কিরূপে বাহির হইবে? চিত্তহারী চৈতন্যস্বরূপ হরির কথা

পাঁচ মিনিট শ্রবণ করিলে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। যখন হরির কথা শুনি, তখন মনে হয় ঠিক যেন হরি সপ্তসুর-সংযোগ করিয়া বীণা বাজাইতেছেন। হরির গলা এমনি মিষ্ট। যিনি ভাল তাঁহার সকলি মিষ্ট, কথাগুলি পর্য্যন্ত যেন মধুমাখা। যখন বিবেক এবং ভক্তিকর্ণে ব্রহ্মবাণী শুনি তখন বলি,—"হে ঈশ্বর, তুমি কি গান করিতেছ না বক্তৃতা করিতেছ?" বাস্তবিক সুরেশ্বরীর সকল কথা সঙ্গীতের ন্যায় সুস্বর ও সুমধুর। তাঁহার সমুদয় বেদ সামবেদ, সুললিত ছন্দে বিরচিত এবং সুমিষ্ট সুর তান, সুকোমল রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত। হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই বাগ্‌দেবীর পূজা অর্চ্চনা কর এবং ইহাঁর কথামৃত পান করিয়া প্রাণকে শীতল কর। ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি রূপের মধ্যে এই এক সরস্বতীর রূপ অর্থাৎ বিদ্যারূপ তোমরা আদর ও যত্নের সহিত সাধন কর। তোমরা তোমাদিগের প্রাণমন্দিরে জ্ঞানাসনে বসাইয়া এই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, এই অনন্ত চিন্ময়ী সরস্বতীর পূজা কর। নিয়ত তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও সুবুদ্ধি সঞ্চয় কর।

লক্ষ্মীশ্রী।

রবিবার ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮০২ শক; ১৮ই জুলাই, ১৮৮০।

তোমরা কি কখনও কাচের টাকা ব্যবহার করিয়াছ? তোমরা এই পৃথিবীতে এত দিন আছ কখনও কি কাচের

অন্ন খাইয়াছ? যদি কাচের টাকা দেখিতে, যদি কাচের অন্ন খাইতে তাহা হইলে এই পৃথিবীতে ধন ধান্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে। এক প্রকার টাকা আছে যাহা স্বচ্ছ নহে, তাহাতে দেশের রাজা কিংবা রাণীর মুখ অঙ্কিত থাকে। আর এক প্রকার টাকা আছে যাহাতে বিশ্বমাতা ভুবনেশ্বরী যিনি, তাঁহার মুখ লেখা আছে। পূর্ব্বোক্ত টাকা হস্তে স্পর্শ করিলে হস্ত বিষাক্ত হয়, মনে হয় যেন কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আর শেষোক্ত টাকা হাতে করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত ধন পবিত্র ধন, সেই ধন স্পর্শমাত্র শরীর মনে পুণ্যের সঞ্চার হয়। এক প্রকার অন্ন আছে যাহা রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলেই খায়, সেই অন্ন খাইলে শরীর সবল হয়; কিন্তু শরীরের বলের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও সুখস্পৃহা বৃদ্ধি হয়। সংসারী ব্যক্তিরা কেবল উদর পূরণের জন্য ও ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অন্ন আহার করে। আর এক প্রকার অন্ন আছে, যাহা হাতে করিবামাত্র শরীর পবিত্র হয় এবং যাহার মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভূত হয়। সেই অন্নে লক্ষ্মীনাম অঙ্কিত থাকে এবং তাহার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী দেখা যায়। যখনই ভক্তির সহিত সেই অন্ন মুখে দেওয়া যায়, তখনই আঃ বলিয়া শরীর মন জুড়ায়। সেই অন্ন আহার করিলে দেহ মধ্যে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয় এবং এরূপ স্বর্গীয় উৎসাহে মন উদ্দীপ্ত হয় যে, বোধ হয় যেন স্বর্গের আগুন শরীর মনের মধ্যে জ্বলি-

তেছে। একটি চাল খাইলেই সমস্ত রক্ত পবিত্র হয় এবং সেই রক্ত এমনই উষ্ণ হইয়া উঠে যে, ইচ্ছা হয় এখনই সৎ কার্য্য করি, সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করি এবং ব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করি।

হে ব্রহ্মসাধকগণ, যদি তোমরা এইরূপ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ টাকা এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলে অতি সহজে তোমরা ব্রহ্মধামে যাইতে পারিবে। যদি অন্য প্রকার টাকা এবং অন্ন ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের অধোগতি হইবে। সংসারের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার সময় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবে উহা স্বচ্ছ কি না এবং উহার ভিতর লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায় কি না। যদি দেখা যায়, উহা ব্যবহার করিবে। যে বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তদ্ব্যবহারে মহা অনিষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন টাকা স্পর্শ করা কিংবা স্ত্রীর মুখ দর্শন করা পাপ, সংসার নরক এবং শ্মশান বৈকুণ্ঠ। এই মতানুসারে যেখানে গৃহস্থেরা সুখে বাস করে, যেখানে কুবেরের ধন সম্পত্তি, যেখানে রাজার রাজভাণ্ডার, সেখানেই অসুরের বাসস্থান, অতএব জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গহন বনে গমন করিয়া ধর্ম্মসাধন করা, সমস্ত দিন উপবাস ও শরীরকে নির্যাতন করিয়া কঠোর তপস্যা করা আবশ্যক। যোগী ঋষি অথবা তপস্বী হইতে হইলে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিতে হইবে। এই সন্ন্যাসধর্ম্মে শরীর পতনই মন্ত্রের সাধন।

এই ভ্রান্তমত ছেদন করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়।

নববিধান এইরূপ বিশ্বাস করেন যে ধন ধান্য এবং সংসারের সমুদায় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন বিরাজিত। সংসারশ্রীতে ইনি লক্ষ্মীশ্রী দেখেন। নববিধানের লোক হইয়া তোমরা কোন মতেই ধন ধান্যকে ঘৃণা করিতে পার না, সাংসারিক সুখ সম্পদকে অপবিত্র মনে করিতে পার না। ধন ধান্য স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তের দান। যেমন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাৎপর ব্রহ্মের পূজা করিতেছ, তেমনি সংসারে প্রবেশ করিয়া ধনধান্যদায়িনী সংসারের কর্ত্রী গৃহদেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিবে। যে দেবতা এই ব্রহ্মমন্দিরে তোমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইনিই তোমাদের প্রতিজনের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া বাস করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য পৃথিবীকে উর্ব্বরা, এবং প্রচুর শস্যশালিনী করিলেন এবং নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্যে সুসজ্জিত করিলেন, তিনি কি আমাদিগের জন্য উপবাসবিধি প্রচার করিতে পারেন? উপবাসের ধর্ম্ম বাস্তবিক উপহাসের ধর্ম্ম। যিনি অন্ন সৃজন করিলেন, তাঁহার কি ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি? যিনি অন্নদা অন্নপূর্ণা তিনি কি অন্নকে বিষনয়নে দেখিতে পারেন? তোমরা কি মনে কর যেখানে লোকালয় নাই, যেখানে শ্মশান, যেখানে ভীষণ মৃত্যু মনুষ্যের হাড় লইয়া

ঘোর অন্ধকারের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে কেবল শোক এবং ভয়, সেখানেই কেবল যোগেশ্বর মহাদেব বাস করেন? তিনি কি সংসারকে ঘৃণা করেন? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্মশানবাসী এবং শ্মশান মধ্যে সাধকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন ইহা সত্য; কিন্তু তিনি কেবল শ্মশানবাসী নহেন, তিনি আবার পরিবারমধ্যে গৃহদেবতা হইয়া সন্তান পালন ও সংসার নির্ব্বাহ করেন। দ্বিমূর্ত্তি ঈশ্বরের এক দিকে ঘোর সন্ন্যাসীর মুখ, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মুখ। তিনি এক ভাবে বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্মশান মশানে, বন উপবনে, পাহাড় উপত্যকায় এবং নদনদীতটে বেড়াইতেছেন। আর এক ভাবে লক্ষ্মীমুর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকেশ্বরী হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছেন।

আমাদের প্রাণের হরি যেমন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী তেমনি ব্যস্ত সংসারী। যিনি জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন তিনি তাহাকে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি সামান্য সংসারী নহেন। এক একবার জাগ্রৎ হইয়া সংসারে আসেন ও আবশ্যক মত দুই একটি কার্য্য করেন এমত নহে। তিনি ঘোর সংসারী, সমুদয় সৃষ্টি তিনি রক্ষা করিতেছেন। কোটি কোটি জীব তাঁহার সংসারে, নিয়ত তাহাদিগকে তিনি পালন করিতেছেন। তিনি যেমন সংসারে ডুবিয়াছেন এমন আর কেহই ডুবিতে পারে নাই। হে ক্ষীণ বিশ্বাসী হয় তো তুমি মনে কর মহেশ্বর কেবল কৈলাশশিখরে অথবা শ্মশানে

একাকী বাস করেন, লোকালয় তাঁহার অগম্য। তিনি ভূগোল পাঠ করেন নাই, পৃথিবীতে অন্য অন্য স্থান যে আছে তাহা তিনি জানেন না, যেখানে যোগী সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে আরাধনা করে কেবল সেই স্থানই তিনি জানেন এবং সেখানেই থাকেন! বিরলে বসিয়া যুগ যুগান্তরে এক আধখানি বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ, ভাগবত পুরাণ লেখেন; এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছু জানেন না, আর কিছু করেন না। সংসারের কোন শাস্ত্র তিনি পড়েন নাই, সুতরাং বিষয় কর্ম্ম কিছুই জানেন না!

অল্পবিশ্বাসী মনুষ্য, তোমার ভ্রান্তবুদ্ধি কিরূপে ইহা কল্পনা করিল যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সংসারসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ! তুমি মনে কর ঈশ্বর বাণিজ্য ব্যবসায় বুঝেন না, টাকা কড়ির হিসাব করিতে পারেন না, অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে কিরূপে প্রতিবিধান করিতে হয় তাহা তিনি জানেন না। তুমি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে, জল কষ্টে কি অন্ন কষ্টে কোন দেশ জর্জ্জরিত হইয়া যদি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রতিবিধানের উপায় জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে ব্রহ্ম সরল অন্তরে তাহাকে এই উত্তর দিবেন;—"আমি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র জানি, কিন্তু রাজ্যপালন-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্ব আমি কিছুই বুঝি না। কিসে জলকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয় তাহা আমি জানি না। এ সকল সাংসারিক বিষয়ে আমি সৎপরামর্শ দিতে পারি না।"

অনেকের এরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে সুশিক্ষিত মনে যে সকল সন্দেহ উত্থিত হয় তাহা সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের পুস্তক পাঠ না করিলে মীমাংসিত হয় না, এবং জগদীশ্বর যিনি কেবল বিশ্বাস ও ভক্তি বুঝিতে পারেন তিনি এ সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিতে পারেন না।

হে বিভ্রান্ত বিষয়ী মানব, তুমি মনে কর যদি ঈশ্বরকে সংসারের কোন ভার দেওয়া যায় নিশ্চয়ই তিনি বিপদ ঘটাইবেন। তোমার কল্পিত ঈশ্বর সংসার চালাইতে অক্ষম, তাঁহাকে যদি বাজারের ভার দাও তিনি হয় তো কাষ্ঠ আনিতে গিয়া লবণ আনিবেন না, অথবা তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়া ঘৃত ও তৈল আনিতে ভুলিবেন, কিংবা হয় তো অল্প মূল্যের সামগ্রী অনেক মূল্যে ক্রয় করিয়া ঠকিয়া আসিবেন, অথবা বাজারে ভাল সামগ্রী বাছিয়া কিনিতে পারিবেন না। বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী মানুষ মনে করে ঈশ্বর জীবকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, পরিত্রাণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি সংসারের বিষয় কিছুই বুঝেন না: সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক। এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কত অবিশ্বাসী মানুষ আপন ভাণ্ডারের চাবি ও সাসারের ভার আপনার হস্তে রাখে, দেবহস্তে কেবল আত্মার ভার অর্পণ করে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর কেবল নিমতলার শ্মশান ঘাটে কতকগুলি বৈরাগী ও সন্ন্যাসী-দিগের সঙ্গে থাকেন, আর কোন স্থানে তাঁহার গতি নাই।

কল্পিত সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী দেবতার উপাসকেরা এইরূপে ধর্ম্মকে উপহাসের বিষয় করে। কিন্তু ঈশ্বরের যথার্থ ধর্ম্ম নববিধানের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। ধর্ম্ম কেবল শবসাধন ও ভস্মলেপন নহে, গৈরিক ও কমণ্ডলু ইহার সার নহে। ইহার সাধনক্ষেত্র শ্মশানে বদ্ধ নহে। কিন্তু সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সংসারের প্রত্যেক পদার্থমধ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। বিশ্বাসচক্ষে দেখিলে সংসারের যাবতীয় বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্মীকে প্রকাশিত করে। যেমন কাচের আচ্ছাদনে সুন্দর মূর্ত্তি সকল ঢাকা থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্যে জগজ্জননী লক্ষ্মী বাস করিতেছেন। কি অন্ন বস্ত্রে, কি শয্যা পর্য্যঙ্কে, কি তৈজসাদিতে সংসারের সকল দ্রব্যে মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। শরীরের রক্তের মধ্যে, সুস্থতা বলের মধ্যে, সুখ সম্পদের মধ্যে লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন। গৃহস্বামীর ধন মান বিভবের মধ্যে, গৃহ কর্ত্রীর সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের মধ্যে, দাসদাসী অশ্বরথমধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার শ্রী প্রকাশ করেন।

স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর লক্ষ্মীরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বাস করিতেছেন, এবং দিবানিশি সংসারের ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তু বিধান করিতেছেন। জগজ্জননী নিজে তাঁহার সন্তানের গৃহে পরিচারিকা হইয়া সেবা করিতেছেন। ভক্ত

তাঁহার সংসারের যে কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই বস্তুর মধ্যেই লক্ষ্মীর সিংহাসন দেখিতে পান। সুতরাং সকল বস্তুকেই তিনি পবিত্র মনে করেন। লক্ষ্মী যদি এক মুষ্টি অন্ন দেন তাহা তিনি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন, এবং কোটি টাকা অশ্ব গজ যদি দেন তাহাও আদরের সহিত লক্ষ্মীর দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। লক্ষ্মীর ভক্ত-সন্তান লক্ষ্মীর দেওয়া গাড়ীর উপরে চড়িয়া দেখিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী স্বহস্তে সেই গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং সারথির কর্ম্ম করিতেছেন। ভক্ত তখনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী তোমাকে প্রণাম।" এই বলিয়া সেই রথে চড়িয়া লক্ষ্মীর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীর গাড়ীতে চড়িলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে। কিন্তু যদি একখানি বিলাসের গাড়ী নিজে নির্ম্মাণ করিয়া সেই লক্ষ্মীছাড়া নিরীশ্বর গাড়ীতে আরোহণ কর তাহা হইলে নিশ্চিত নরকের দিকে গতি হইবে। লক্ষ্মীদত্ত লক্ষ্মী নামাঙ্কিত হাজার টাকার শাল গায়ে দাও, তাহার প্রত্যেক পশমের ভিতর হইতে পবিত্রতা তোমার অঙ্গে প্রবেশ করিবে। আর যদি লক্ষ্মীবিহীন ঈশ্বরবিহীন শাল ব্যবহার কর তাহাতে মন অহঙ্কৃত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অপবিত্র হইবে। কেহ শাল পরিয়া যমালয়ে যায়, কেহ রাজর্ষিদের ন্যায় ঐ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া উহার মধ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করেন।

হে সাধক, তোমার কি বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে? তুমি লক্ষ্মীর হাতে ভার দাও। পৃথিবীতে অনেক গৃহনির্ম্মাতা আছে; কিন্তু সাবধান তুমি কদাপি মানুষের নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিবে না, লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে, লক্ষ্মীর সংসারে থাকিবে। সেই বাড়ীর প্রত্যেক ইটের মধ্যে লক্ষ্মীর নাম অঙ্কিত দেখিবে। কেন না স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তে উহা নির্ম্মিত। তিনি কি বাটী নির্ম্মাণ করিতে জানেন? হাঁ, আমি বলিতেছি জানেন, খুব ভাল জানেন, আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। কি প্রণালীতে গৃহ গঠন করা বিধেয়, কত টাকা লাগিবে, দালান বারাণ্ডা কিরূপ হইবে, ভক্তের সমস্ত অভাব কিরূপে মোচন হইবে তৎসমুদায় ভক্তবৎসলা লক্ষ্মী যেমন জানেন এমন আর কে জানে? অতএব তাঁহাকে অনভিজ্ঞ মনে করিয়া নাস্তিক অহঙ্কারীর ন্যায় আপন হস্তে গৃহগঠনের ভার লইবে না, কিন্তু জননী লক্ষ্মীর উপর সে ভার ন্যস্ত করিবে। তিনি উপযুক্তরূপে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, সাজাইয়া দিবেন, রক্ষা করিবেন ও উহাকে ধর্ম্মের আলয় করিয়া দিবেন।

লক্ষ্মী আহার দেন, লক্ষ্মী বাড়ী দেন, লক্ষ্মী সকল অভাব মোচন করেন। লক্ষ্মী তোমায় অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দেন, লক্ষ্মী তোমার ঘর পরিষ্কার করেন, লক্ষ্মী তোমার ভাণ্ডার রক্ষা করেন, লক্ষ্মী তোমার শস্যক্ষেত্রে শস্য এবং তোমার বাগানে ফুল ফল উৎপাদন করেন, লক্ষ্মী তোমার জমিদারীর সুব্যবস্থা

করেন। যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তিনিই তোমার বাড়ীর লক্ষ্মী। গুরু হইয়া এখানে তোমাকে যোগ ভক্তি শিখাইলেন, বাটীতে গিয়া জননীরূপে তোমার সংসার পালন করিবেন। তাঁহাকে সমস্ত ভার দেও, তিনি যাহা করিবেন সকলই তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। ধনোপার্জ্জন, স্বাস্থ্যসাধন, বাণিজ্য ব্যবসায়, গৃহরক্ষা, সন্তানপালন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের ভার সেই সুদক্ষ গৃহদেবতার হস্তে অর্পণ কর, কুশল ও শান্তি পাইবে। লক্ষ্মী যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। যাহা কিছু লক্ষ্মী দেন তাহাই তোমার কল্যাণের হেতু। করুণাময় ঈশ্বর, মঙ্গলময় বিধাতা কখনও আমাদের অমঙ্গলের জন্য সংসার স্থাপন করেন নাই। অন্ন বস্ত্র, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব তিনি যাহা কিছু আমাদিগকে দিতেছেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কিসে আমার মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, সংসারের কোন্ কার্য্য করিলে আমার ভাল হইবে কোন্ কার্য্যে অনিষ্ট হইবে ইহা আমি জানি না, তিনি জানেন। সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত সংসার তাঁহার চরণতলে রাখিতে হইবে। তিনি ঘোর সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্ত এবং নির্ব্বিকার, সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, তিনি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী; কিন্তু সন্তানদের মঙ্গলের জন্য তিনি ঘোর সংসারীর ন্যায় গৃহদেবতা মা লক্ষ্মী হইয়া তাহাদিগকে আদর করিয়া পালন করেন, এবং নানাপ্রকার সুন্দর ও সুমিষ্ট বস্তু সকল বিতরণ করেন।

মা যেমন সুন্দররূপে সংসার নির্ব্বাহ করেন তেমন আর কেহই পারে না। মা যেমন সংসারী এমন আর কে আছে? তবে কেন, হে ভক্ত, তুমি জগজ্জননীকে সংসারী বলিয়া গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিবে না, এবং সকল বিষয়ে কেন তাঁহার সদুপদেশ লইবে না? আত্মীয় বন্ধু এবং পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য যদি তোমার অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হয়, ভক্তির সহিত লক্ষ্মীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিবে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি তিনি সকলই জানেন এবং কিরূপে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ দুই সঞ্চয় হইবে ইহা তিনি বুঝাইয়া দিবেন। কিরূপে আয়ব্যয়বিবরণ রাখিতে পার তাহাও স্বয়ং লক্ষ্মী শিখাইয়া দিবেন। তিনি বড় বড় সাহেব এবং গণিত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাও ভাল হিসাব রাখিতে পারেন। তোমার সংসারে যদি দ্রব্যাদি ভাল করিয়া সাজাইতে চাও লক্ষ্মীকে বলিও, তিনি তাহাও করিয়া দিবেন। লক্ষ্মীর সংসারে কোন প্রকার গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের হিন্দুভ্রাতা বিশ্বাস করেন যাঁহার সংসারে সুব্যবস্থা আছে তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার এবং যে সংসারে সমস্ত বিশৃঙ্খল এবং শোভাহীন সে সংসার লক্ষ্মীবিহীন। ব্রাহ্ম, তুমি সাকার লক্ষ্মী মান না এবং কোন কালে মানিবে না। মূর্ত্তিপূজা তোমার ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। কিন্তু

ঈশ্বরের ধনধান্যদায়িনী কল্যাণবিধায়িনী সন্তানপালনী শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। সেই নিরাকারা শক্তিই লক্ষ্মী। তুমি তাঁহার অপমান করিও না। লক্ষ্মীকে হিন্দু এত দূর আদর করেন যে তাঁহাকে ঠাকুরঘরে বদ্ধ না রাখিয়া প্রতি ঘরে তাঁহার পদচিহ্ন স্থাপন করেন। তিনি আলেপন দ্বারা প্রতি ঘরে লক্ষ্মীপদচিহ্ন চিত্রিত করেন, এবং মনে করেন যে, সংসারের দেবী সর্ব্ব ঘরে বেড়াইতেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর যে, সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম লক্ষ্মীরূপে অর্থাৎ সাংসারিক শ্রীরূপে সকল ঘরে সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

লক্ষ্মীর অর্থ শ্রী। হে ব্রাহ্ম, হে ব্রাহ্মিকা, তোমরা আপন আপন সংসার লক্ষ্মীর সংসার করিয়া লক্ষ্মীমান্ ও লক্ষ্মীমতী শ্রীমান্ ও শ্রীমতী হও। ব্রহ্মের লক্ষ্মীরূপ সাধন কর। পাপাসুরনাশিনী বিশ্বজননী মহাদেবী উভয় পার্শ্বে সরস্বতী ও লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া ভক্তসংসারে অবতীর্ণ হন, এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সরস্বতীরূপে তিনি তোমাদিগকে জ্ঞান এবং বিদ্যা, লক্ষ্মীরূপে তিনি তোমাদিগকে সংসারের শ্রী সৌভাগ্য দান করিবেন। সাকার ভাব বিসর্জ্জন দিয়া নিরাকার ভাবে তোমরা ঈশ্বরের এই দুই প্রকৃতি গ্রহণ কর ও যত্নপূর্ব্বক সাধন কর। জগজ্জননী স্বয়ং লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তিনি মা হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিয়া

সন্তানের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অন্তরের অন্তরে সেই নিরাকারা সরস্বতী এবং লক্ষ্মী পূজা করিয়া দিব্যজ্ঞান ও পরাবিদ্যা এবং নিত্য কল্যাণ ও শ্রী অর্জ্জন কর। সংসারের ভিতরে জগজ্জননী মা লক্ষ্মীর শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুখী হও।

উদাসীন ব্রহ্ম।

রবিবার ১১ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক; ২৫এ জুলাই, ১৮৮০।

মনুষ্যপ্রকৃতি মহাদেবকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে কেন আবৃত করে, এবং তাঁহার জন্য সহরের বাহিরে, পর্ব্বতশৃঙ্গে কৈলাস-শিখরে কেন মন্দির নির্ম্মাণ করে? যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর তাঁহার বেশ কেন বৈরাগ্যবেশ হইল? মনুষ্য বিলক্ষণ জানে যে সর্ব্বারাধ্য ভগবান্ সমস্ত বিশ্বসংসার পালন করিতেছেন, তিনি দয়াময়। তথাপি সে তাঁহাকে উদাসীনের বেশে সজ্জিত করে। ইহার কারণ কি? অবশ্যই মনুষ্য প্রকৃতিতে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে, কেন না প্রকৃতি হইতেই ঐ বৈরাগ্যবেশ উৎপন্ন হইয়াছে। যখনই নিরপেক্ষ হইয়া মানুষ আপনার স্বভাব আপনার প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করে মহাদেব কেমন, সে ভিতর হইতে তখনই উত্তর পায়, তিনি নির্লিপ্ত বৈরাগী। বৈরাগী ফকির যিনি নহেন তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। এই লক্ষণাক্রান্ত

না হইলে মহাদেব পূজা পাইতে পারেন না। যদি পূর্ব্ব-তন যোগী ঋষিরা ব্রহ্মকে এই লক্ষণাক্রান্ত মনে না করিতেন, যদি তাঁহারা ব্রহ্মকে নিগুর্ণ এবং নির্লিপ্ত না ভাবিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ব্রহ্ম কদাপি পরম দেবতারূপে পূজিত এবং আরাধিত হইতেন না।

এই মূল লক্ষণবিহীন হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। যদি ব্রহ্মের এই বিশেষ লক্ষণ পরিহার করিয়া কেবল তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ভাব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক হইবে। তেত্রিশ কোটি দেব দেবী ব্রহ্মের তেত্রিশ কোটি রূপ গুণ; কিন্তু স্বয়ং তিনি একজন নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার উদাসীন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তি ভাবিতে পার; কিন্তু এ সমুদায় বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে তিনি নিজে এক নির্ব্বিকার ফকির হইয়া বসিয়া আছেন। ইতিপূর্ব্বে তোমরা দ্বিমূর্ত্তির কথা শুনিয়াছ ব্রহ্মের এক মূর্ত্তি উদাসীনের মূর্ত্তি, আর এক মূর্ত্তি সংসারী মূর্ত্তি। তাঁহার এক হস্তে তিনি বৈরাগ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়া সমস্ত বৈরাগীদিগকে শাসন করিতেছেন, আর এক হস্তে সংসারী-দিগকে ধন ধান্য লক্ষ্মীশ্রী বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার এক মুখ হইতে "উদাসীন হও, উদাসীন হও" এই আদেশ, এই উপদেশ বিনির্গত হইতেছে; আর এক মুখ হইতে "সংসার পালন কর, সংসার পালন কর" এই কথা বিনিঃসৃত হইতেছে। এক মুখ হইতে যোগতত্ত্ব, আর এক মুখ হইতে

সংসারতন্ত্র বিবৃত হইতেছে। এই দুই রূপ একত্র কর, ব্রহ্ম কি বুঝিতে পারিবে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের এই বিচিত্ররূপ অস্বীকার করেন না। তিনি ব্রহ্মের একত্ব মানিয়াও তন্মধ্যে অসংখ্য মূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হন।

ব্যক্তি এক অথচ অনেক ভাব, ব্রহ্মজ্ঞানের এই গূঢ় তত্ত্ব অতীব আশ্চর্য্য ও মধুর। সেই এক নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত ঈশ্বর নিত্যকাল লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি মানুষ নহেন, এবং কদাচ মানুষ হইতে পারেন না। পুরুষ তিনি, কিন্তু মানুষ নহেন। তিনি একজন নিত্য সনাতন নির্ব্বিকার স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তাঁহাতে মানবচরিত্রের কোন দোষ গুণ আরোপ করা যায় না। তাঁহার কোন বিকার কিংবা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই। তাঁহাকে কদাপি মনুষ্য ভাবিও না। মানুষের অধর্ম্ম তাঁহাতে নাই, মানুষের ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই। মানুষের ন্যায় তাঁহার জীবনে কখন প্রেম কখন অপ্রেম, কখন পরিশ্রম, কখন বিশ্রাম হয়, এরূপ কদাপি মনে করিও না। তিনি এক সময় উৎসাহী হইয়া মানুষকে গাড়ী ঘোড়া ক্রয় করিয়া দিলেন, প্রচুর পরিমাণে সংসারমধ্যে ধন ধান্য আনিয়া দিলেন, আবার কিয়ৎকাল পরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, কখন ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় এরূপ পরিবর্ত্তনশীল মনে করিও না। মানুষের রূপ, মানুষের গুণ, মানুষের প্রকৃতি কদাপি ঈশ্বরেতে আরোপ করিও না।

ঈশ্বরে যে কোটি কোটি রূপের কথা শুনিয়াছ সে সমস্ত নিরাকার রূপ। এ স্থলে কিঞ্চিৎ কঠিন সত্য শিখিতে হইবে। ঈশ্বরকে একজন ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া মানিলেই মানুষ সহজে তাঁহাকে আপনার স্বভাববিশিষ্ট মনে করে। অনেক দুর্ব্বল বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী অথবা সরস্বতী মূর্ত্তি ভাবিতে গিয়া তাঁহাতে মানবপ্রকৃতি আরোপ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে দেশ কাল এবং ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছে।

যাহারা ব্রহ্মস্বরূপ জানে না তাহারাই মনে করে ঈশ্বর মানুষের ন্যায় কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, কখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে সন্তানদিগকে পালন করেন। কখন তিনি মানুষের বিপদ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, কখন বা আপনার স্বরূপ ভাবিয়া আনন্দিত হন, কখন লক্ষ্মীর বেশ পরিধান করিয়া ধন ধান্য বিতরণ করেন, কখন সরস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে জ্ঞানী ভক্তদিগের প্রাণ হরণ করেন; কখন যোগেশ্বর হইয়া নির্জ্জনে যোগী-দিগকে ডাকিয়া যোগতত্ত্ব শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ও রূপ ধারণ করিবেন ইহা কেবল কল্পনা ও ভ্রান্তি। মানুষ আপনাকে যেমন দেখে আপনার ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে করে। আপনার জীবনে কখন রাগ, কখন প্রেম, কখন কর্ম্মের ব্যস্ততা, কখন বিশ্রাম ও

শান্তি, সুতরাং সে মনে করে ব্রহ্মও ঐরূপ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি লক্ষ্মী তিনি নিত্য লক্ষ্মী, যিনি সরস্বতী তিনি চিরকাল সরস্বতী, যিনি শক্তিমান্ তিনি চিরশক্তিমান্, যিনি যোগেশ্বর তিনি অনন্তকাল যোগেশ্বর।

যদি স্বীকার কর তিনি কেবল পর্ব্বত অথবা শ্মশানবাসী নহেন, কিন্তু তিনি সংসারমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে, তিনি নিত্যকাল সংসারের দেবতা এবং সৃষ্টি অবধি চিরকাল জীব পালন করিতেছেন। তাঁহাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তিনি নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সহস্র রূপ ধরিবেন কিরূপে? তিনি দুই রূপও ধরিতে পারেন না। নিত্য বস্তুতে রূপান্তর সম্ভবে না। সদাকাল ব্রহ্মের একই রূপ। নিত্য সনাতন ব্রহ্ম এক স্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই এক স্বরূপের মধ্যে তেত্রিশ কোটি রূপ, অর্থাৎ এক সময়েই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী রহিয়াছে। এক সময়ে তিনি সরস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করেন, আর এক সময়ে তিনি লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করেন এরূপ নহে; কিন্তু যিনি সরস্বতী তিনিই লক্ষ্মী। তিনি একই সময়ে সমস্ত দেবমূর্ত্তি অথবা প্রকৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রেম তাঁহার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার দয়া এবং ন্যায় একত্র কার্য্য করে। তাঁহার নির্জ্জন অধিবাস এবং সংসারকোলাহল মধ্যে প্রজাপালন এক সময়েই হয়। তাঁহার কোটি স্বরূপ একত্র বাঁধা রহিয়াছে। এক

বাগানে এক সময়ে তেত্রিশ কোটি ফুল ফুটিয়াছে। যাহারা মনে করে ঋতু ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ সময় বিশেষে ঈশ্বরেতে বিভিন্ন ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। তাহারা ভ্রান্ত যাহারা বলে, মানুষের দুষ্ট ব্যবহারে হরি রাগিয়াছিলেন, আবার স্তব স্তুতিতে তিনি তুষ্ট হইলেন। তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞান করে।

তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি বলেন ঈশ্বরেতে বিকার নাই, তিনি নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন নদী ক্রমাগত চলিতেছে, সূর্য্য ক্রমাগত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তুমি দেখ আর না দেখ, সেইরূপ তুমি ধন এবং জ্ঞান গ্রহণ কর বা না কর ঈশ্বর চিরকাল লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া কল্যাণ ও সুবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। এক ব্রহ্ম বিভিন্ন অবস্থাতে পড়িয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছেন, ইহা সত্য কথা নহে, কিন্তু এক ব্রহ্মেতে অনন্তকাল অসংখ্য রূপ ও গুণ বিরাজ করিতেছে। এক ব্রহ্মমূর্ত্তিতে অসংখ্য মূর্ত্তি মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে। তোমার দিকে এক মুখ, আর একজনের দিকে আর এক মুখ, আমার দিকে এক মুখ ; আমার দিকে আবার ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন মুখ। আমি পাপ করিলাম তৎক্ষণাৎ ন্যায়বান্ রাজার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলাম ; ভক্ত হইলাম প্রেমময়ী জননীর মুখ প্রকাশিত হইল। আমি যোগসাধন আরম্ভ

তাঁহার দয়া উত্তেজিত হইল, তিনি ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন, এ সকল নিতান্ত অসঙ্গত কথা। যিনি নিত্য ও পূর্ণপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে আবার দয়ার সঞ্চার কিরূপে হইবে? তিনি চিরকাল ভালবাসিতেছেন, প্রত্যেককে সমভাবে স্নেহ করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানও নির্ব্বিকার। তিনি আমাদিগের অবস্থা জানিলেন ইহা সত্য নহে। অজ্ঞান মনুষ্যেরই জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই জানিতেছেন। তিনি স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানী নহেন। সেইরূপ তিনি শান্ত অথচ কর্ম্মী। তিনি কোথাও যান না, কাহাকেও পরিশ্রম সহকারে সেবা করেন না। পা নাই চলিবেন কিরূপে? হাত নাই কর্ম্ম করিবেন কিরূপে? অথচ এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের সমস্ত কর্ম্ম এবং অসংখ্য জীব পালন তাঁহারই শক্তিতে ও নিয়মে হইতেছে।

ভক্তজীবনে যত লীলা সকলই তাঁহার খেলা। তিনি মানুষের ন্যায় কখন কর্ম্ম করেন না। কিন্তু তাঁহার প্রেম ও বাৎসল্য ভাব বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশে বিচিত্র, কিন্তু স্বরূপেতে তিনি এক। হরিলীলা অসংখ্য, কিন্তু হরিস্বভাব নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সংসারমধ্যে হরির প্রেম কত আশ্চর্য্যরূপ দেখাইতেছে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সংসারে থাকেন, অথচ সংসারী নহেন, তিনি সংসারে আসক্তও নহেন, এবং সংসারকে ঘৃণাও করেন

তাঁহার সমুদয় গুণ টানিয়া লয়, এমন সাধক কে আছে? হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি নববিধানের আশ্রয় লইয়া থাক, তুমি বিশ্বাস কর তোমার ব্রহ্ম একই আধারে অসংখ্য রূপ ধারণ করেন। সময়েতে তাঁহার রূপের বিকার অথবা পরিবর্ত্তন হয় না। তুমি সময় বিশেষে তাঁহার এক এক ভাবের পক্ষপাতী হও বলিয়া কখনও মনে করিও না যে তাঁহার আর অন্য ভাব নাই। যখন তুমি তাঁহার দয়ার মূর্ত্তি দেখ তখন কদাচ মনে করিও না যে তাঁহার ন্যায়মূর্ত্তির তিরোভাব হইয়াছে। যখন তুমি দেখিতে পাও যে, প্রজাবৎসল হরি প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন, তুমি বিশ্বাস করিও যে সেই সময়েই তিনি আর একজনের কাছে সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নির্গুণ ব্রহ্মরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। এক ভাবে তিনি সগুণ অর্থাৎ অসংখ্যগুণবিশিষ্ট। আর এক ভাবে তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ সময়ে তাঁহার গুণের পরিবর্ত্তন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক ভাবে তিনি নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসী, আর এক ভাবে তিনি সংসারী কর্ম্মী।

মানুষের মনে কখন সংসারাসক্তি, কখন বৈরাগ্য, কখন দয়া, কখন নিষ্ঠুরতা; কিন্তু ঈশ্বর এরূপ বিকারবিহীন; তিনি এ সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। তিনি পূর্ণ, তিনি নিত্য। তাঁহার মধ্যে দয়া বৈরাগ্য অনন্তকাল এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। তিনি নিত্য দয়া, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় দয়ালু নহেন, অর্থাৎ আমাদের দুঃখ দেখিয়া

উক্ত আধার হইতে কেবল তৈল আকর্ষণ করিবে। সেইরূপ ব্রহ্ম আধারে অসংখ্য ভাব রহিয়াছে; কিন্তু তোমার যে যে ভাব প্রবল তুমি কেবল সেই সকল ভাবই গ্রহণ করিবে।

আমি যদি জ্ঞানী হইয়া কেবল বুদ্ধি সহকারে ব্রহ্মকে বুঝিতে যাই আমি কেবল তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার সরস্বতী-রূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমি যদি বল শক্তি সাধন করি এবং দৃঢ় ও পরাক্রমশালী হইবার জন্য চেষ্টা করি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম শক্তিরূপে আমার আত্মাতে অবতীর্ণ হন। যখন আমি সংসারে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে যত্ন করি তখন তিনি লক্ষ্মীশ্রীরূপে কাছে আসিয়া দেখা দেন। যখন আমার মনে ভক্তিভাব প্রবল হয় সেই ভাব ব্রহ্মের নানা মূর্ত্তির মধ্যে ভক্তবৎসল মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করে। এক দেবতা প্রাণ অথবা শক্তিস্বরূপ, এক দেবতা কেবল প্রেমস্বরূপ, এক দেবতা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, এক দেবতা কেবল পুণ্যস্বরূপ, তাহা নহে; কিন্তু একই ব্রহ্ম এই সমুদায় স্বরূপের নিত্য আধার।

সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বদ্ধ। কেহ জ্ঞানী, কেহ প্রেমিক, কেহ শাক্ত, কেহ ভক্ত, কেহ কর্ম্মী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ সুন্দর মূর্ত্তির উপাসক, কেহ ভীষণের উপাসক। প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তদুপযোগী ভাব ব্রহ্মস্বরূপের মধ্য হইতে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব গ্রহণ করে,

করিলাম যোগেশ্বরমূর্ত্তি দেখিলাম; সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তখনি গৃহদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম। আমার দেখা ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু যিনি দেখা দিলেন তিনি এক সময়েই রাজা, জননী, যোগেশ্বর ও লক্ষ্মী। পাত্রভেদে অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ এক ও অপরিবর্ত্তিত থাকে। আমাতে পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহাতে নহে, আমরা পাঁচ জনে পাঁচ ভাবে দেখিতেছি বলিয়া তিনি পাঁচ হইবেন না। তিনি একই রহিলেন, ভিন্ন হৃদয়ে তাঁহার জ্যোতির প্রতিভা বিভিন্ন হইল।

হে সৌন্দর্য্যের উপাসক, তুমি মনে করিও না তোমার দেবতার সৌন্দর্য্য ব্যতীত শক্তি জ্ঞান পুণ্য প্রভৃতি আর অন্য কোন স্বরূপ নাই। ঈশ্বর অসংখ্যস্বরূপের আধার, আবার তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপ অনন্তকাল স্থায়ী ও নিত্য। তুমি কেবল এখন সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, তোমার কাছে কেবল ঐ গুণের প্রকাশ অপর গুণের অপ্রকাশ। সাধকেরা আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতানুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সাধন ও দর্শন করে; কিন্তু তিনি একই আছেন। মনে কর একটি পাত্রে জল এবং তৈল উভয়ই আছে। তুমি যদি এক খণ্ড বস্ত্র আগে জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রে স্থাপন কর তাহা হইলে সেই বস্ত্রখণ্ড তৈল পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল আকর্ষণ করিবে, অথবা যদি ঐ বস্ত্রখণ্ড আগে তৈলাভিষিক্ত করিয়া ঐ পাত্রে রাখ তাহা হইলে ঐ বস্ত্র

না। ব্রহ্মের শান্তবক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে না। সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণা, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসম্ভব। তিনি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত অনন্ত সাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাঁহাতে উত্থিত হয় না। তিনি সর্ব্বত্যাগী ফকির, এমন ফকির আর নাই। তাঁহার ঘর নাই, সংসার নাই। কোন প্রকার মায়াতে তিনি মুগ্ধ হন না। সংসারের মহামায়া ব্রহ্মপ্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সংসারের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সকল অবস্থাতে তিনি অবিচলিত। বজ্রধ্বনি বা সাগরের মহা আস্ফালনে তাঁহার শান্তি ভঙ্গ হয় না। রাজ্যবিপ্লব হইল, নদ নদীর মহা-প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল, আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গিরণে সহস্র সহস্র লোক বিকম্পিত হইল, ভগবানের চিত্তস্থৈর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য হইল না! তিনি কঠোর ফকির নহেন, প্রেমিক উদাসীন। সন্তান পালনের সমুদায় উপায় করিতেছেন, কিন্তু নিজে অনাসক্ত, হাজার লোক কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার ক্লেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাঁহার উল্লাস হয় না। সৃষ্টির বিচিত্র ঘটনার মধ্যে উদাসীন মহাদেব উচ্চ বৈরাগ্যপর্ব্বতে যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয় তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি স্থির থাকিবেন, তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের যদি মৃত্যু হয়, তথাপি তাঁহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে না।

সৃষ্টি আরম্ভ হইতে কত রাজ্যের বিনাশ হইল, কত দেশ সমভূমি হইল; কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সুস্থির ও শান্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। নিগুর্ণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কিছুই দেখিলেন না, শুনিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রহিলেন।

ব্রহ্মের বাহ্যিক লীলা দেখিতে কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য বিচিত্রতা ও ব্যস্ততা! কত কার্য্য, কত ঘটনা কত রূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রহ্মের অন্তর কি গম্ভীর! একটু চাঞ্চল্য নাই, এক রূপ, এক ভাব, এক নিস্তব্ধ অচল পদার্থ। গভীর সমাধি। মনে হয় যেন বহির্বাটীতে কার্য্যের ধুমধাম, প্রেমের বাজার, সংসারলীলা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কেবল শক্তি ও প্রেমের অবিশ্রাম উচ্ছ্বাস। কিন্তু অন্তঃপুরে এক মৌনী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন! বাহিরের সমুদায় কার্য্য সুচারু নিয়মে চলিতেছে। মনুষ্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধন্য ধান্য সঞ্চয় করিতেছে। ভক্তেরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিয়া পরমার্থ ও ধর্ম্মান্ন সঞ্চয় করিতেছেন। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার সমস্ত রাজ্য সমস্ত সংসার চলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করেতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে, সমুদ্র দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য বহন করিতেছে। তাঁহার নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড

চলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্নেহের গুণে তাঁহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য দুগ্ধ আসিল, শিশু ঐ দুগ্ধ পান করিল, এবং পরিপুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত রহিলেন। তিনি নিজে আসক্ত হইয়া কিছুই করেন না, কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া সমুদয় করাইয়া দেন। তিনি তাঁহার নিয়ম দ্বারা সমস্ত ভৌতিক রাজ্য পরিচালিত করিতেছেন, এবং ধর্ম্মরাজ্যে ভক্তদিগের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র অনুরাগে তিনি উত্তেজিত হন না, তিনি প্রকাণ্ড প্রেম, অনন্ত বাৎসল্য, নিত্যকাল স্থায়ী অনুরাগ। তাঁহার প্রত্যেক গুণ অথবা স্বরূপ অনন্তকালস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয়।

পূর্ব্বে অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর কখন জাগ্রৎ, কখন নিদ্রিত, কখন দয়ালু, কখন নির্দ্দয়; কালভেদে এবং অবস্থাভেদে মানুষের ন্যায় তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। নববিধানের অভ্যুদয়ে এই মানুষ দেবতার তিরোভাব এবং অনন্তচৈতন্য ও অনন্ত প্রেমস্বরূপের আবির্ভাব হইল। উপধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বলে ঈশ্বর স্তব স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া কখন কখন পাপীকে ক্ষমা করেন, কিন্তু নববিধানের মত এই যে ঈশ্বর অনন্ত প্রেমস্বরূপ, তিনি সর্ব্বদা পাপীকে ক্ষমা করিতেছেন, তাহার পুনর্মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এবং তাহার উদ্ধারের উপায় করিতেছেন। পাপীর প্রতি নির্দ্দয়

ও ক্ষমাবিহীন হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। দেখ সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদের দয়াময় ঈশ্বর চিরদয়াময়, আমাদের গৃহলক্ষ্মী চিরলক্ষ্মী।

কেহ কেহ বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা, কখন কাহার প্রতি প্রসন্ন হন তাহার স্থিরতা নাই। প্রকৃত লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই। শ্রীরূপে কল্যাণরূপে তিনি চিরদিন সংসার-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রেম কোথাও দুগ্ধরূপে, কোথাও ধান্যরূপে কোথাও ধনরূপে, কোথাও সুখশান্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার কোন গুণ বা রূপ সাময়িক নহে, কিন্তু নিত্য। তিনি জ্ঞানকথা বলেন অনন্তকাল, তিনি কল্যাণ দান করেন অনন্তকাল, তাঁহার বাক্যের বিশ্রাম নাই, তাঁহার দয়ার বিরাম নাই। তিনি অনন্ত বাগ্‌দেবী এবং অনন্ত লক্ষ্মী। তাঁহার সমস্ত গুণ সময়ের অতীত ও নিত্য। আমরা সময়ের জীব, আমরা আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ ধারণ করি। আমাদের কখন এক ভাব, কখন আর এক ভাব। আমা-দের স্বভাব চরিত্র সময়ে বিভক্ত। কিন্তু অখণ্ড ঈশ্বর নিত্যকাল এক ভাবে রহিয়াছেন। সরস্বতী লক্ষ্মী, জ্ঞান প্রেম, প্রভৃতি প্রত্যেক গুণ অনন্ত ও নিত্যরূপে ভাব, এবং মনের মধ্যে সমুদয় একত্র সংযোগ কর, যে বস্তু নিষ্পন্ন হইবে তাহাই ব্রহ্ম জানিবে। মনুষ্য সময়ে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে, কিন্তু অনন্তকাল সেই সমুদয় মূর্ত্তি ব্রহ্মের

মধ্যে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই নিত্যে অসংখ্য রূপধারী ব্রহ্মকে দেখিলে ভূমানন্দ লাভ হইবে।

আত্মাশক্তি।

রবিবার ১৮ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক; ১লা আগষ্ট, ১৮৮০।

পরমেশ্বর পৃথিবী সৃজন করিয়া পালন করিতেছেন। সরস্বতীরূপে তিনি সন্তানদিগকে জ্ঞান বিতরণ করেন, এবং লক্ষ্মী শ্রীরূপে ঘরে ঘরে তিনি ধন ধান্য বিতরণ করেন। আবার অখণ্ড নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বাস করিতেছেন। তবে অবতার শব্দ কেন ধর্ম্মের অভিধানে স্থান পাইল? ঈশ্বরকে লক্ষ্মী সরস্বতী ও উদাসীনরূপে পূজা করিয়া কেন মনুষ্য ক্ষান্ত হইল না? লোকে কেন অবতার মানিল? জনসমাজের ঈশ্বরাবতরণকল্পনার নিগূঢ় কারণ কি? যখনই পৃথিবীর কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরের অবতরণ আবশ্যক, এ যুক্তি মানুষকে কে শিখাইল? অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পৃথিবীতে ছিলেন না? ঈশ্বর পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে, সমুদায় সৃষ্টিমধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া মনুষ্যের চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। মনুষ্যের মন ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। মনুষ্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অবতরণ প্রার্থনা করিল।

স্বর্গের ঈশ্বর কেবল স্বর্গের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি কেবল চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীর নদ নদী এবং বৃক্ষ লতাদিরও ঈশ্বর। স্বর্গের ব্রহ্মকে মনুষ্য পার্থিব সমস্ত বস্তুতে অবতীর্ণ দেখিল, কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যের আকারমধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করিল। অবতীর্ণ হইবার যথার্থ অর্থ মনুষ্য-সমাজে মানবদেহে অবতীর্ণ হওয়া। ঈশ্বর চন্দ্র সূর্য্য অথবা বৃক্ষেতে রহিলেন তাহাতে পাপীর কি? পুষ্পের লাবণ্যে, ঊষার সৌন্দর্য্যে হরি বর্ত্তমান, এ সংবাদ অধর্ম্মে উত্তপ্ত যে মন তাহার পক্ষে কি আদরণীয় হইতে পারে? যতক্ষণ না ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, ততক্ষণ তাহার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা প্রায় সমান। আমার আপনার অন্তরে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই তাহা হইলে তাঁহাকে এক দূরস্থ অপরিচিত অনিশ্চিত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাতে কি লাভ? পর্ব্বতে সমুদ্রে পাথরে মাটীতে সকল স্থানে হরি আছেন, কেবল মানুষের ভিতরে কি হরি নাই? ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট এই সুবিশাল বিশ্বমধ্যে রহিলেন তাহাতে আমার প্রাণের তৃপ্তি হয় না। আমার মন মনুষ্যপ্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে চায়। আমার মন জিজ্ঞাসা করে মনুষ্যের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই? যখন আমি আমার হস্ত দিয়া বক্ষের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পর্শ করি, যখন আমি দেখি মনুষ্যপ্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্ম আসিয়া বাস

করিতেছেন, তখন আমার সকল সন্তাপ দূর হয়, এবং হৃদয় পবিত্র ও সুখী হয়।

সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকল স্থানকে আপনার বাসস্থানরূপে মনোনীত করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি হেয় জ্ঞান ও পরিত্যাগ করিলেন? বৃক্ষ লতা ও ক্ষুদ্রতম তৃণমধ্যেও স্বীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি বলিলেন— অস্পৃশ্য মানব দূর হও? যদি মনুষ্যসমাজে হরি না থাকেন, যদি ইতিহাসের ঘটনামধ্যে তিনি না থাকেন তবে হরিলীলাভাগবত অসম্ভব। কে বলে মনুষ্যের দেহমন্দিরে ঈশ্বর নাই? যখনই বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া জনসমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে তখনই দেখিতে পাইবে, হরি নর নারীর দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। সেই হরির শক্তি মনুষ্যের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এক মহাশক্তি, এক প্রকাণ্ড তেজ মনুষ্যের দেহ মন ও আত্মার ভিতরে কার্য্য করিতেছেন। এই শক্তি কে জান? সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী।

যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি এখন কোথায়? তিনি কি সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন? না, যে শক্তি এই সমুদায় সৃজন করিল তাহা এখনও জীবিত রহিয়াছে। আমাদের যতগুলি শক্তি আছে সকল শক্তির মূলে তিনি। বন উপবনে, গিরি পর্ব্বতে, বিশ্বমন্দিরে আমরা হরি পূজা করিলাম, কিন্তু চিরকাল পরের বাড়ীতে ব্রহ্ম পূজা

করিয়া হৃদয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের মন এই বলিয়া আক্ষেপ করে;—"হায়! চিরদিন পরের বাড়ীতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হইল, কবে নিজের হৃদয়ে, নিজের বাড়ীতে তাঁহার পূজা করিব?" সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বজননী আমাদিগের প্রতিজনের দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে অধিবাস করিতেছেন। ঈশ্বর আপনি আমাদের প্রতিজনের মনের মধ্যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তবে কেন আমরা তাঁহাকে ভিতরে উপলব্ধি করিব না? যে শক্তি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। তুমি অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদয় তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধন ধান্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজবলে নিজচেষ্টায় আপনার পুষ্টিসাধন কর। এরূপ নাস্তিক কল্পনা পরিহার কর। তুমি কি এক মিনিট আপনাকে রক্ষা করিতে পার? তোমার নিজের একটীও মূলশক্তি নাই। যে সৃজনী শক্তি তোমাকে সৃজন করিল তাহাই তোমার জীবনসংরক্ষিণী শক্তি। সেই আদ্যাশক্তি, সেই অনন্তকালের মহাশক্তি ভিন্ন তুমি এক মুহূর্ত্তকাল বাঁচিতে পার না।

যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্ম্মসাধন করিতেছ সে শক্তি সামান্য শক্তি

নহে। ইহার ভিতরে স্বর্গীয় শক্তি আছে। ইহা অদ্যকার শক্তি নহে, অনন্তকালের শক্তি, অনন্তকালের ঘনীভূত শক্তি। এই ঘনীভূত শক্তি কালরূপে কেন বর্ণিত হইল? শক্তিমূর্ত্তি কেন কালীমূর্ত্তি হইল? হে মানব, তুমি যদি তোমার ভিতর দিয়া গভীর অনন্ত দেবশক্তি দর্শন কর তাহা হইলে দেখিবে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতিশক্তি আদ্যাশক্তি। অনন্তশক্তি জলরাশির ন্যায় গভীর ও ঘোর বর্ণ। অল্প জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। যতই জল অধিক হয় ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর হইলে ক্রমে সবুজ, নীল, ঘোর নীল, শেষে প্রায় কাল হইয়া যায়। যে জল স্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভীরতা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদ্রূপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ত্র অনুভব করিলে উহাতে কোন রং কল্পনা হয় না, কিন্তু যদি উহার নিম্নে গভীররূপে দেখি তাহা হইলে দেখিব শক্তির পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দৈবশক্তি ব্রহ্মশক্তি। শেষে একেবারে অতলস্পর্শ অনন্ত শক্তিসমুদ্রের ভয়ানক কালবর্ণ আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিত করে। দেখ কেমন ব্রহ্মের কালীমূর্ত্তি নিষ্পন্ন হইল।

যে সৃজনী শক্তি হইতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, সেই শক্তিই আমাদিগের জননী, তিনিই জীবপ্রসবিনী জগন্মাতা। তিনি স্বয়ং সৃষ্ট সন্তানদিগের অন্তরে মূলাধার ও মূলশক্তিরূপে নিয়ত অধিবাস করিতেছেন। এই মনুষ্যদেহে হরি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মনের

মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি নিহিত ও অন্তর্ভূত। কেমন, হে ভাবুক ব্রাহ্ম, এখন তোমার নিজের গৃহে ব্রহ্মদর্শনের স্পৃহা চরিতার্থ হইল তো? তোমার ঈশ্বর ঐ দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্যে ছিলেন, এখন তোমার নিজের দেহ মনের মধ্যে তাঁহার অবতরণ ও অন্তর্নিবেশ হইল। তিনি শক্তিরূপে তোমার শারীরিক ও মানসিক তাবৎ শক্তিমধ্যে বাস করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মকে আর দূর ভাবিও না। অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া কে কোথায় সুখী হইয়াছে? ছাড় পরকে, ভাব আপনাকে। তোমার অত্যন্ত নিকটস্থ আত্মীয়, আপনার সহোদরের ভিতরেও ঈশ্বরকে দেখিতে বলিতেছি না, একেবারে তোমার দেহমনের মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দেখিতে বলিতেছি। তোমার নিজের জীবনের মধ্যে তোমার হরিকে দেখাইয়া দিতেছি।

যেমন তুমি তোমার বক্ষের দ্বার খুলিবে তৎক্ষণাৎ অনন্ত কালীমূর্ত্তি অন্তরে প্রকাশিত হইবে। সেই কালীমূর্ত্তি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অথবা কোন ধাতুনির্ম্মিত কালী নহে; নিরাকারা চিন্ময়ী শক্তিরূপিণী কালী। সেই শক্তিরূপিণী কালী কি পদার্থ? কেবল মাত্র শক্তি। কি শক্তি? সৃষ্ট পরিমিত জড়শক্তি নহে, কিন্তু আদ্যা, প্রথমা শক্তি, চিৎস্বরূপা। তাঁহার মন্দির কোথায়? কোথায় গেলে তাঁহাকে দেখা যায়? তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মন্দির নাই। জীবদেহই প্রকৃত কালীমন্দির, সমস্ত বিশ্বরাজ্যই কালীঘাট। যেখানে যত শক্তি আছে সেই

শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত যে মূলশক্তি তিনিই আকার-প্রকার-নাম-বিহীন কালী, শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে আপনার প্রাণমন্দিরে দেখ ; আপনার প্রত্যেক বলে কালীমূর্ত্তি ধ্যান কর। তোমার চক্ষে তোমার বক্ষে, তোমার শোণিতে তোমার নিঃশ্বাসে, কালীরূপ দর্শন কর। তোমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মরণশক্তি, ধীশক্তিতে, তোমার ভুজবল বুদ্ধিবলে, কালীশক্তি উপলব্ধি কর। সেই সর্ব্বারাধ্যা কালীশক্তি তোমার হৃদয় মন আত্মা সমস্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর তোমার শরীর মনের মধ্যে শক্তি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন।

- যদি শক্তিমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তির পূজা করিবে প্রজ্ঞাবলে হৃদয়-কবাট উক্ত কর, এবং আপনার জীবনীশক্তিমধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার শরীরের নিপাত! মহাশক্তি তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়। সেই শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই স্থিতি করিতে পারে না। ঐ যে প্রকাণ্ড সমুদ্রের ন্যায় মহাকালী নিত্যকাল বাস করিতেছেন, ঐ সমুদ্রের বিন্দুমাত্র আমাদের সমস্ত শক্তির আধার। আমার দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি ঐ কণামাত্র শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মতেজ মনুষ্যের শরীর মনকে তেজ দিতেছে। অনন্ত ঘোরতরা কালীশক্তি বিবিধশক্তি মহাকালীর হস্তে অহঙ্কারী মানুষের মুণ্ড ঘুরিতেছে। সেই ভয়ঙ্করা বিশ্বজননীর কাছে

ভ্রূকুটি করিও না। হে মানব, শক্তির কাছে তোমার তেজ খাটিবে না, সেই দর্পহারিণীর নিকটে তোমার সমুদায় অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, কেন না তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার পদানত হইবে।

যে মা আমাদিগকে জন্ম দিলেন, যে জননী আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিলেন, তাঁহার মুখের পানে আমরা তাকাইতে পারি না। তাঁহার শক্তির প্রভাবে আমরা কম্পিতকলেবর হই। কি ভয়ানক শক্তি! সমুদ্র পর্ব্বত বায়ু বৃষ্টি অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য সকলে যাঁহার কাছে জোড় হাত করিয়া স্তব করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্টি, ইঙ্গিতে প্রলয়, তাঁহার মুখের দিকে কে তাকাইতে পারে? আমি কোন্ শক্তির কথা বলিতেছি জান? যে ভয়ঙ্করা সৃজনী শক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। যখন কিছুই ছিল না তখন সেই শক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,—"আয় সূর্য্য আয়, আয় চন্দ্র আয়, পৃথিবী গ্রহ তারা নক্ষত্র সকলে সারি গাঁথিয়া আয়।" অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটি কোটি পৃথিবীকে অঙ্গুলিতে ঘুরাইতেছে। সেই মহাশক্তি মহাকালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুদ্রের আস্ফালনে ও ভীষণ বজ্রধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হই। যখন এই শক্তি ভৌতিক রাজ্য হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মশক্তিরূপে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইহার মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়। ইহা

সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুর বধ করে।

বিশ্বসৃজনী শক্তিই অসুরসংহারিণী শক্তি। সেই একই শক্তি বিচিত্র ও বহুধা হইয়া জড়জগতে ও ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে। জ্ঞানশক্তি প্রেমশক্তি পুণ্যশক্তি সকলই সেই আদ্যাশক্তি। তিনি অজ্ঞান অপ্রেম অধর্ম্ম কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই সেই শক্তিদেবী মানুষের মনে কোন প্রকার অন্ধকার দেখিতে পান তখনই গম্ভীর শব্দে হুঙ্কার করিয়া বলেন;—"আবার অন্ধকার! এক অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ সৃজন করিলাম, আবার এই সৃষ্ট জগতের মধ্যে অবিদ্যা অন্ধকার আসিল!" এইরূপ হুঙ্কার করিয়া সেই মহাশক্তি কালী অজ্ঞান ও পাপের অন্ধকারকে জয় করিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন ধর্ম্মজগৎ উদ্ভাবন করেন। শক্তি একই। যে শক্তি সাধুদিগকে সুখ শান্তি বিতরণ করেন। সেই শক্তিই পাপী অধার্ম্মিকদিগকে দলন করেন। যিনি জননী হইয়া সন্তানদিগকে বক্ষের মধ্যে রাখিয়া পালন ও পোষণ করেন, তিনিই তাঁহার পদতলে মহাসুরকে ফেলিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কখন জগদ্ধাত্রী হইয়া সকলকে সন্তানবৎ রক্ষা করেন, কখন করালবদনা শাণিত অসিধারিণী হইয়া ঘোর রণে দানব দলন করেন।

সর্ব্বশক্তিময়ী মা জগজ্জননী মহাশক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা মানবহৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা অসত্য ও অধর্ম্মকে সংহার করিতে-

ছেন যদি আমাদের মনের মধ্যে কুবাসনা ও দুষ্প্রবৃত্তি থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সকল অসুরের উপরে কালীর ভীষণ অস্ত্র চালিত হইবে। যে এই শক্তিকে ঘাঁটায় সে নিশ্চয়ই মরিবে। তুমি কি মনে কর যিনি ঘোরান্ধকারের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিলেন তিনি তোমার পাপান্ধকার বিনাশ করিয়া আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না? শক্তির নিকটে কোন প্রকার পাপাসুর তিষ্ঠিতে পারে না। বিশ্বাসী মনুষ্যের বক্ষের ভিতরে সেই মহাকালী জাগিয়া উঠিয়া সকল শত্রু বিনাশ করেন। যখনই হৃদয়নগরে কোন সাংঘাতিক ব্যাধি প্রবল হয়, এবং জীবকে মৃত্যুগ্রাসে ফেলিবার জন্য উপক্রম করে, তখনই মহাকালী রক্ষাকালীরূপে উদিত হইয়া ব্যাধি ও মৃত্যুকে জয় করেন। রক্ষাকালীর অভ্যুদয়ে আত্মার রোগ শোক ভয় পলায়ন করে। যে অঞ্চলে মহাশক্তির পূজা হয় সে প্রদেশে পাপাসুর জীবিত থাকিতে পারে না। তিনি তাহার রক্ত বাহির করিবেনই করিবেন। শক্তিদেবী বলি-দানের প্রয়াসী নহেন, ছাগাদি রক্তপিপাসু নহেন। তিনি নরবলি চাহেন না, পাপবলি চাহেন। জীবরক্তে তাঁহার তুষ্টি হয় না, কিন্তু পাপাসুরের রক্তে তাঁহার মহোল্লাস ও নৃত্য। যদি মহাকালীর নৃত্য দেখিতে চাও তাহা হইলে তাঁহাকে অসি দ্বারা সমস্ত দানব ও অসুরের মস্তক ছেদন করিতে দেও, তিনি ঐ সকল ছিন্ন মস্তক লইয়া বিকটাকার

কাটা মুণ্ড হস্তে লইয়া ভয়ঙ্করা রিপুসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিবেন।

তুমি কি মনে কর কালী নির্দ্দয়হৃদয়? শক্তিও যিনি লক্ষ্মীও তিনি। কালী কমলা একই। অন্ধকার ও অধর্ম্ম সংহার করিবার, বিক্রম দেখাইবার সময় তিনি ভয়ানক শক্তি-রূপ ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমময়ী জননীর কোমল-হৃদয়। তাঁহার সকল শক্তি জীবের হিতের জন্য। মা হইয়া কি আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করিতে পারেন? দয়াময়ী কি নিরপরাধ ছাগ মহিষাদির শোণিতপাতে আমোদ করিতে পারেন? তিনি কেবল পাপাসুরের রক্ত চান। ভক্তহৃদয়ে তিনি কত পাপাসুর সংহার করিতেছেন। কত লাল রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে! স্থির হইলেই মনের মধ্যে শুনিতে পাইবে মা কালীর হুঙ্কার ও দুর্ম্মতিদলন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য ভিতরে বসিয়া অসুরদিগকে দলন করিতেছেন, এবং অসুররক্তে আপনার উৎসব সমাধা করিতে-ছেন। আমরা শক্তিপূজা করিয়া শাক্ত হইব; ভক্তবৎসলের পূজা করিয়া ভক্ত হইব। আমরা শক্তিকে ভক্তি করিব, কেন না তিনি আমাদের জননী। তিনি রক্ষাকালী, সকলকে রক্ষা করেন; তিনি মোক্ষদায়িনী, পাপ সংহার করেন। তিনি যে কাল, সে কুৎসিত কাল নহে; সে ভাল কাল; সে অনন্তের রূপ। সেই অনন্ত শক্তিকে যত পূজা করিবে ততই নিস্তেজ দুর্ব্বল ভীরু নিরাশ নিরুদ্যম মন তেজস্বী হইয়া উঠিবে, এবং

ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও পাপদমনে সক্ষম হইবে। যতই মহাশক্তি সাধন করিবে, ততই মৃত্যুকে জয় করিবে, এবং অন্তরে ও বাহিরে পুণ্যরাজ্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত শক্তির কত বিক্রম তাহা দেখাইতে পারিবে।

ব্রহ্মের আকাশরূপ।

রবিবার ২৫এ শ্রাবণ, ১৮০২ শক; ৮ই আগষ্ট, ১৮৮০।

অনেক ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা আছে। অনেক পৌত্তলিকের মনও সময়ে সময়ে গভীর ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করে। ব্রাহ্ম হইয়াও অনেকে মনের ভিতরে কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের নানা প্রকার রূপ সিদ্ধান্ত করে, বুদ্ধি দ্বারা নানা প্রকার নিরাকার মূর্ত্তি গঠন করে। আবার অনেক পৌত্তলিক সাকার দেবতার উপাসক হইয়াও সময়ে সময়ে বাহ্যিক উপকরণ পরিহার করিয়া যোগ ধ্যানে ব্রহ্মপদার্থের নিকট উপনীত হয়। অতএব ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া তোমরা অহঙ্কার করিও না, অথবা কাহাকেও পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ব্রাহ্ম, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার মনের চিন্তিত ব্রহ্মরূপ যথার্থই নিরাকার কি না? তোমার মন সহজে নিরাকার অনন্ত পুরুষকে ধরিতে পারে কি না? কেবল মুখে অথবা বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলে হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপন

হৃদয়ে পরীক্ষার প্রদীপ লইয়া গিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সেখানে যথার্থ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন কি না।

হে ব্রাহ্ম, তোমার রসনা ও হস্ত পৌত্তলিক নহে বলিয়া তোমার মন যে অপৌত্তলিক ইহা মানিতে পারি না। তুমি বাহিরের পুতুল না মানিতে পার; কিন্তু তুমি যে তোমার হৃদয়ের পুতুল পূজা কর না তাহা কে বলিল? সে সকল আন্তরিক পুতুল বিনাশ করাও ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি মুখে নিরাকার মানিতেছ; কিন্তু তুমি যে সত্য সত্যই প্রতিদিন নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা কর তাহার প্রমাণ কি? অতএব আপনাকে কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত কর। ধ্যানের সময় ঠিক নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাও কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। উদ্বোধনের সময় হইতে উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মকে কি অমিশ্রিত-ভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পার? বিশেষ বিশেষ গুণ যথা লক্ষ্মী সরস্বতী অথবা উদাসীন মহাদেব ভাবিতে ভাবিতে কি কোন সাকার মূর্ত্তি মনে উদিত হয়, না কেবল ব্রহ্মের অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত বৈরাগ্য অনুভব কর? কালী ভাবিতে ভাবিতে কি এক প্রকাণ্ড কাল পাথর ভাব, না ঈশ্বরের ঘনীভূত অনন্ত শক্তি দেখিতে পাও? অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মের কোন রূপ কোন গুণ অন্তবিশিষ্ট হইতে পারে না। তিনি অনন্ত লক্ষ্মী, অনন্ত সরস্বতী, অনন্ত মহাদেব, অনন্ত কালী। বুদ্ধিতে অনন্ত স্বীকার করিতে পার

বটে; কিন্তু উপাসনা ধ্যান প্রার্থনার সময় অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পার কি না? অনন্ত লক্ষ্মীকে কিরূপে তুমি পরিমিত ও ক্ষুদ্র ভাবিবে? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপের সঙ্গে অনন্তের সংযোগ। যদি অনন্তকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের লক্ষ্মী কিংবা অন্যরূপ ভাব, তাহা হইলে তোমাদিগের মন পৌত্তলিক হইবে। লক্ষ্মীদেবীকে যদি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট কল্পনা কর, তাহা হইলে নারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু অনন্ত সংযোগ না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে না। অতএব ঈশ্বরের কোন স্বরূপকে অন্তবিশিষ্ট মনে করিও না।

ব্রহ্ম যিনি তিনি অনন্ত আকাশস্বরূপ। প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আকাশস্বরূপ। এই কথাটী সেবকের মনে অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। ঈশ্বরের কোটি কোটি রূপের মধ্যে আকাশ একটি রূপ। তাঁহার প্রধান লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি যত রূপ দেখ না কেন প্রত্যেকটি আকাশস্বরূপ। যখন তাঁহাকে লক্ষ্মী ভাবিবে তাঁহাকে আকাশলক্ষ্মী ভাবিও, সাকার লক্ষ্মী ভাবিও না। ঈশ্বরকে আকাশস্বরূপ ভাবিলেই তাঁহার কোন আকার অথবা হস্ত পদ চিন্তা করা অসম্ভব। যদি ব্রহ্মের এই আকাশস্বরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ না কর তবে যোগ ধ্যানের সময় যতই কেন কল্পিত মূর্ত্তি বিদায় করিবার চেষ্টা কর না, বারংবার সেই সকল কল্পিত মূর্ত্তি আসিয়া তোমার দুর্ব্বল মনকে আক্রমণ

করিবে। তুমি অনেক সতর্ক হইয়া নিরাকার ব্রহ্মপূজা আরম্ভ করিলে; কিন্তু অর্দ্ধেক পথে যাইতে না যাইতে দেখিবে তোমার নিরাকার দেবতা যেন সাকার হইয়া যাইতেছেন, তিনি যেন কখন ভীষণ প্রকাণ্ড চক্ষু, কখন মনোহর সহাস্য বদন দেখাইতেছেন, কখন মঙ্গলহস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপাত্মাদিগকে প্রহার করিতেছেন। সাধক, তুমি অনেক সাবধানতার সহিত ব্রহ্মের নিরাকারত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে; কিন্তু তোমার পুরাতন অভ্যাসবশতঃ তোমার মন গোপনে ঈশ্বরের নানাবিধ পরিমিত রূপ গঠন করে। তুমি নিজের বুদ্ধিবলে তোমার মনের জঞ্জাল দূর করিতে যত চেষ্টা কর না কেন তোমার ভিতরের পৌত্তলিকতা নির্ম্মাণের কল সহজে বন্ধ হইবে না। তুমি বাহিরের কুমরটুলীর সমুদায় দরজা বন্ধ করিলে, কিন্তু তোমার মনের কুমরটুলীতে পুতুল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। হস্ত পুতুলগঠনে ক্ষান্ত হইল, কিন্তু তোমার মন নানামূর্ত্তি গঠন করিতে লাগিল। যখন যে প্রকার পুতুলের প্রয়োজন তোমার মন তখনই সেই প্রকার পুতুল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এই জন্য বলিতেছি, ব্রাহ্মগণ, খুব সাবধান হও।

যে সকল ব্রাহ্ম আপনাদিগকে পরীক্ষিত ও সিদ্ধ মনে করেন তাঁহাদেরও মনের ভিতরে দুই একটি কল্পনার পুতুল দেখা দেয়। এই জন্য মানুষ সর্ব্বদা আপনাকে ঈশ্বরের অনন্ত

ভাবের টানের মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। ঈশ্বর চিন্তা করিলেই মন স্বভাবতঃ অনন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এক অনন্ত মহাপুরুষ ক্ষুদ্র মানুষকে উর্দ্ধে আকাশের দিকে টানিতেছেন। যে ভূমা পূজা করে তাহার নিশ্চয়ই উর্দ্ধ গতি। যে অনন্ত ভূমার আকর্ষণে আপনাকে না ফেলিয়া নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে বাল্যসংস্কারবশতঃ নীচ ভূমিতে পতিত হয়। ব্রহ্মপুরাণ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব প্রভৃতি ব্রহ্মের বিবিধ রূপ প্রকাশ করিল, এখন, হে ব্রহ্মসাধক, তুমি ব্রহ্মোপনিষদের সাহায্যে এই লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, কালী-রূপ চারি মুক্তা মুখে লইয়া অনন্ত আকাশের দিকে উড়িয়া যাও। জ্ঞান, শ্রী, বৈরাগ্য শক্তিরূপ চারি মুক্তা চারিদিকে ছড়াইয়া দেও, দেখিবে অনন্ত আকাশে অনন্ত মুক্তামালা। অনন্ত আকাশে ব্রহ্মের বিচিত্র স্বরূপের অনন্ত মুক্তামালা। মানসপক্ষী যখন উপনিষৎপক্ষ সহকারে উর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন সে অনন্ত আকাশে ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। সেই আশ্চর্য্য অনন্ত ভূমা বিরাট মূর্ত্তি দেখিলে, আর পুতুলের ধর্ম্ম সেই পক্ষীকে টানিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের আকাশরূপ দেখিতে পান, পৃথিবীর পরিমিত ধর্ম্ম তাঁহাকে নিম্নদিকে টানিতে পারে না। উপনিষদের পাখী অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রিত, আকাশ তাহার আবাস।

ব্রহ্মের আকাশরূপ ভাবিলে মনের মধ্যে সাকার হাত পা আসিতে পারে না। চেষ্টা করিয়া দেখ, আকার চিন্তায়

কখন পরিমিত রূপ কল্পনা করিতে পারিবে না। যত দেহ বা আকার ভাবিবে, বড়ই হউক আর ছোটই হউক, প্রকাণ্ড আকাশ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অনন্ত আকাশ ভাবিলে চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ কিছুই ভাবা যায় না। যদি আকাশস্বরূপ ব্রহ্মের চক্ষু ভাব, সেই চক্ষু বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ হইয়া যাইবে। নিরাকার চক্ষু অনন্ত অনাদি চক্ষু। আকাশ চক্ষু আকাশ হস্ত ভাবিলে সাকার লক্ষণ অবলম্বনে কোন দোষ স্পর্শে না; কেবল উপমা বুঝায়। অসীম আকাশস্বরূপ এ কথা বলিলে মূর্ত্তি পূজার দোষ পড়ে না। আকাশ উপাধিশূন্য, আকাশের রূপ রস অথবা শব্দ গন্ধ নাই। আকাশ অখণ্ড অবিভক্ত। এই জন্য বেদান্তে ভগবানের এক নাম আকাশ, অর্থাৎ তিনি কোন সাকার বস্তুর ন্যায় নহেন। তিনি "নেতি নেতি।" যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি ইহার কিছুই তিনি নহেন, তিনি শূন্য আকাশ। আকাশরূপ ভূমা প্রকাণ্ড বিরাট মূর্ত্তি মহাদেব উপাস্য দেবতা। যদি তাঁহার এই মূর্ত্তি চিন্তা কর মনে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা চিত্ত বিভ্রম জন্মিবে না। বাস্তবিক ঈশ্বর যে ঠিক আকাশের ন্যায় শূন্য তাহা নহে। তিনি পরম বস্তু পরম সত্য। নিরুপম যিনি তাঁহার তুলনা কোথায়? কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না, আকাশের সঙ্গেও তাঁহার সাদৃশ্য নাই। পরন্তু সেই উপাধিহীন আকার-হীন বস্তুর যদি কোন উদাহরণ আবশ্যক হয় তবে ব্রহ্মকে

আকাশস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি বস্তুতঃ আকাশ নহেন। সাধনার সময় ব্রহ্মকে আকাশরূপ ভাবিলে সাকার মূর্ত্তি কল্পনা অসম্ভব হয়।

আকাশ আপন স্বভাববলে সাধককে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ঊর্দ্ধে টানিয়া লইয়া যাইবে। ঈশ্বরকে অনন্ত আকাশস্বরূপ ভাবিলে কোন প্রকার পরিমিত দেবতা কল্পনা করা অসম্ভব। এই জন্য যোগীদের মধ্যে আকাশ নামের এত গৌরব ও আদর। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ব্রহ্মকে আর সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিতে পারেন। আর দেখ এই অসীম আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যখন ছাদের উপরে উঠিয়া অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রখচিত আকাশের ভিতরে সেই গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি ঈশ্বরকে দেখি তখন শরীর মন বিস্ময়াপন্ন ও স্তম্ভিত হয়। অসীম ব্রহ্মবিস্তৃতি মধ্যে ক্ষুদ্র জীবাত্মা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যদি ব্রহ্মকে অনন্ত আকাশরূপে ভাব তাহা হইলে সাকার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সার সত্য গ্রহণ করিতে পারিবে। হে ব্রাহ্ম, এই সাধনপ্রণালী অবলম্বন কর। উপযুক্তরূপে আকাশ সাধন করিলে কোন প্রকার মূর্ত্তিভ্রান্তির ভয় থাকিবে না। ব্রহ্মকে আকাশরূপ জানিয়া সংসারে বিচিত্র হরিলীলা দেখ, কোন ভয় নাই। নির্লিপ্ত ঈশ্বর, উদাসীন ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ, এই সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া প্রেমময়ীর অনন্ত করুণা ভোগ কর।

অনন্ত ব্রহ্ম অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন আকারে তাঁহাকে তুমি বদ্ধ করিতে পার না। মূর্ত্তি গঠন কর, তিনি উহা ভেদ করিয়া আকাশে চলিয়া যাইবেন। প্রাচীর নির্ম্মাণ কর, উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভূমা মহাদেব মহাকাশে বিলীন হইবেন। আমরা ঈশ্বরের কোমল প্রেমের জন্য তাঁহাকে মা বলি বটে; কিন্তু যাঁহাকে আমরা মা বলিতেছি তিনি অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত। আমাদের মা কি ক্ষুদ্র মা? মাকে আমার পর্ণকুটীরে সংসারের কার্য্য করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম; কিন্তু তিনি কি কেবল আমার পর্ণকুটীরে বদ্ধ? পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব কালী পাইলাম বলিয়া কি ঈশ্বর পরিমিত? ইঁহারাই তো বেদান্তশাস্ত্রে চিদাকাশ ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আমি ছোট বলিয়া কি আমার দেবতাও ছোট? সাড়ে তিন হাত মানুষ কিন্তু দেবতা আধ হাত! কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পরিমাণ! কি আশ্চর্য্য! যিনি বৃহৎ ভূমা তিনি ক্ষুদ্র মনুষ্য অপেক্ষা ছোট হইলেন! সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকাশ-ব্যাপী ব্রহ্মকে কে ভাবিতে পারে? এই অনন্ত ব্রহ্ম আকাশে, হে ব্রাহ্ম, তুমি সাঁতার দাও, ডুব সাঁতার দাও, চিত সাঁতার দাও। ইহার মধ্যে অবিশ্রান্ত বিচরণ কর, খেলা কর। এই আকাশ মূর্ত্তি, এই বিরাট মূর্ত্তি ধ্যান কর, চিন্তা কর, পূজা কর, দেখ প্রকাণ্ড আকাশরূপ ব্রহ্ম মস্তকের উপরে। যতক্ষণ না ঐ চিদাকাশের গুরুত্ব অনুভব করিবে, ততক্ষণ

হৃদয়ের লঘুতা ক্ষুদ্রতা অসারতা ও নীচতা যাইবে না, এবং হৃদয় লঘু থাকিলেই জানিবে ব্রহ্মপূজা পূর্ণ হয় নাই।

ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভূত না হইলে উপাসনার পূর্ণতা হয় না। গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি না দেখিলে হৃদয়ের লঘুত্ব যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসী দেখিতে পান এবং সর্ব্বদা অনুভব করেন এক প্রকাণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম চারিদিক হইতে তাঁহাকে চাপিয়া আছেন। যে আকাশকে শূন্য মনে করে, যে আকাশের মধ্যে সেই গম্ভীর বিরাট ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না সে নাস্তিকপ্রায়। আমি যখনই বলিব, "আছ ঈশ্বর" তৎক্ষণাৎ এক আকাশব্যাপী অনন্ত সত্তার গুরুভারে আমার বুক আক্রান্ত হইবে, এবং সমুদায় মনের উপর ভার পড়িবে। ভারের অর্থ কি? এক বিরাট মূর্ত্তির গুরুত্ব। সেই বিরাট মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির সত্তা অনুভূত না হইলে, উপাসনা সাধন সকলই লঘু ও অসার বোধ হয়। যদি অনন্ত আকাশে অনন্ত পুরুষকে দেখিতে পাও, হৃদয় আপনা আপনি গুরুভারে অবনত হইবে। প্রকৃত ব্রহ্মের তুলনায় কোন বস্তুকে ভার বলিয়া বোধ হইবে না, সহস্র মন লৌহ কিংবা পাথর ওজনে এক ছটাকও হইবে না। ব্রহ্মের গুরুত্বের নিকট কি লৌহ প্রস্তরের গুরুত্ব? তিনি সার বস্তু আর এ সকল অসার ছায়াবৎ।

ব্রহ্ম পদার্থের গুরুত্ব যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাহা কি ভয়ানক ভার। সেই গুরুত্বের অণুমাত্র হৃদয়ে

অনুভূত হইলেই হৃদয়ের প্রেম আপনা আপনি উথলিয়া উঠে। তুমি সোলা জলে ভাসাও, জল সোলাকে গ্রাহ্যও করে না, জল সোলার প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না; কিন্তু জলে লৌহ কিম্বা পাথর ফেল, আপনা আপনি জলে উচ্ছ্বাস হইবে। তেমনি যখন পরম বস্তু ব্রহ্ম মানবহৃদয়ে আপনার গুরুতর সত্তা লইয়া প্রবেশ করেন, তখন গুরুভারবশতঃ আপনা হইতে প্রেমভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়। যখন একটি গুরুতর পদার্থ পাইলাম, ক্রমশঃ তাহা গভীরতর গাঢ়তর অনুরাগের সহিত ধারণ করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহা ধারণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভিতর হইতে গভীর প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল। বিরাট মূর্ত্তি ভাবিলে হৃদয় মহৎ হইয়া উঠে, হৃদয়ে উচ্চ ও গুরুভারের সঞ্চার হয়। আত্মা পরমাত্মার গুরুত্ব বুঝিয়া স্বীয় লঘুত্ব ছাড়িয়া দেয়। আত্মার উপরে ভূমা পরব্রহ্মের গুরুভার পড়িল, সে কোন বস্তুর ভার নহে, সে নিরাকার আকাশের ভার। নিরাকার ভার অতি ভয়ানক ভার, উহার ভারে সমস্ত জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উপাসনা সাধন ভজন গভীর হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় প্রেমাচ্ছন্ন হয়, বৈরাগ্য ও বিবেক ঘনতর ও দৃঢ়তর হয়, এবং ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবলতর হয় এবং সমস্ত ধর্ম্মজীবন ঘনীভূত হয়। গুরুভারাক্রান্ত সাধক আনন্দের সহিত তখন বলিয়া উঠেন, হরি হে, এত দিনে বুঝিলাম তোমার প্রেম পুণ্যের, তোমার জ্ঞান শক্তির কি ভার।

বাস্তবিক ঈশ্বর আকাশের মত শূন্য অথচ অনন্ত গুরুত্বে পূর্ণ। তুমি যত এই নিরাকার আকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিবে ততই তোমার মন মহৎ ও নির্ম্মল হইবে। তুমি দিনে নিশীথে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাতে চক্ষু খুলিয়া আকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের পূজা কর, যতই আকাশের দিকে তোমার চক্ষু তাকাইবে ততই তুমি সংসারের নীচ কামনা ছাড়িয়া মহৎ হইবে, এবং ক্ষুদ্র বস্তু ছাড়িয়া ভূমাতে আবদ্ধ হইবে। তুমি দেখিবে যে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ সমস্ত আকাশে আপন মহিমামধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার নাম নাই, আকার নাই, কেবল সত্তা মাত্র। আকাশ তাঁহার মুখ, আকাশ তাঁহার চক্ষু, আকাশ তাঁহার হস্ত, আকাশ তাঁহার চরণ, আকাশ তাঁহার রূপ, আকাশ তাঁহার মূর্ত্তি। এই অনন্ত আকাশরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, কালী রূপে ভাবিলাম। দেখিলাম। পরিমিত লক্ষ্মী, ক্ষুদ্র সরস্বতী, সাকার মহাদেব, সীমাবিশিষ্ট কালী মনে আসিল না, কিন্তু বিশ্বাসচক্ষে অনন্তরূপিণী লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব মূর্ত্তি দেখিলাম, শরীর ভক্তিভরে অবনত হইল, মন প্রণত হইল। এই অখণ্ড অনন্ত আকাশরূপ ব্রহ্মদর্শনে মনুষ্যের সদ্গতি, ইহাতেই জীবের পরিত্রাণ।

বিধাতার লেখা।

রবিবার ৩২এ শ্রাবণ, ১৮০২ শক ; ১৫ই আগষ্ট, ১৮৮০।

অদৃষ্ট কি? লোকে যাহাকে কপাল বলে, ভাগ্য বলে তাহা কি বাস্তবিক সত্য? যাহা কপালে আছে তাহা হইবেই হইবে, এই যে সাধারণের উক্তি ইহা কি সম্পূর্ণ অমূলক, না ইহার ভিতরে কোন যুক্তি নিহিত আছে? ব্রাহ্মেরা কি অদৃষ্ট ভাবিতে পারেন? অদৃষ্টবাদ কি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত, না ইহার বিরুদ্ধ? অদৃষ্টবাদ কি মনুষ্যের স্বাধীনতা হরণ করে না? উহা কি ঈশ্বরের প্রতি অবিচার দোষারোপ করে না? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া অনেকে শান্তি হারাইয়াছেন। সাধারণ লোকে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, তখন সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর ললাটে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি লিখিয়া দেন, সেই লিখিত স্থিরীকৃত বিধি অনুসারে বিশ্বসংসার চলিতেছে। বিধাতার সেই লেখা অনুসারে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা এবং পৃথিবীতে নরনারী ও যাবতীয় জীব স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছে। জনসমাজে কেহ রাজা হইতেছে, কেহ দরিদ্র হইতেছে, কেহ বড় হইতেছে, কেহ ছোট হইতেছে, কেহ সাধু হইতেছে, কেহ অসাধু হইতেছে, এ সমস্ত সেই বিধাতার লেখা! কেহ ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিল, কেহ ধন মান সকলই হারাইয়া পথের কাঙ্গাল হইল, কেহ

মহোল্লাসে সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, কেহ রোগ শোকে কাতর হইয়া পরিশেষে মৃত্যুগ্রাসে পড়িল, লোকে বলে এ সমস্ত বিধির লেখা।

ঈশ্বর যদি কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন তাহা হইলে অদৃষ্ট-বাদীদিগের এই কথা গ্রাহ্য হইত, ঈশ্বরের সঙ্গে যদি বিশ্বের এখন কোন সম্পর্ক না থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টির সময় সমুদয় অবস্থা স্থির করিয়া লিখিয়া রাখা সম্ভব মনে হইত। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এরূপ সৃষ্টির মত মানি না। আমরা ঈশ্বরকে কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া এখন নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সৃষ্টির সময় একবার তিনি যাহার সম্পর্কে যে বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সে সেই বিধি অনুসারে চিরকাল চলিতে লাগিল, তাঁহার সঙ্গে আর তাহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক রহিল না, আমরা এ মতকে কদাচ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সৃষ্টির সময় কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন আর তাহা-তেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কল চলিতেছে, ঈশ্বর নিজে আর এ বিশ্ব চালাইতেছেন না, এখন তাঁহার সঙ্গে জনসমাজের কোন সংস্রবই নাই এ কথা নিতান্ত অমূলক। আদিম মানবকে ঈশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন সেই পুরাতন বিধি অনুসারে সমুদায় মানব সন্তান বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে; সেই আদি

মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল, এখন আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার তেমন প্রত্যক্ষ যোগ নাই; ব্রহ্মবিশ্বাসীরা এই অসত্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

আমরা পরিষ্কার চক্ষে দেখিতেছি, ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তিনি প্রত্যেক শুভ কার্য্যের কর্ত্তা হইয়া নিত্য আমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন, এবং প্রত্যেক শুভ ঘটনা স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। আমরা বিশ্বাসনয়নে দেখিতেছি, ঈশ্বর নির্লিপ্ত হইয়াও জনসমাজে থাকিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমরা তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে মানিতে হইলে পুরাতন অদৃষ্টবাদ অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি দূরস্থ অথবা অবর্ত্তমান তিনিই লিখিয়া দেন, কিন্তু যিনি স্বয়ং কর্ত্তা, যিনি প্রাণের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান তিনি কেন লিখিবেন? সকলেই জানেন দূরস্থ ব্যক্তিরা লেখে কিন্তু কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলে সে স্বয়ং কার্য্য করে। ঈশ্বর যখন সংসার মধ্যে নিজ কল্যাণময়ী ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন তখন লেখার প্রয়োজন কি? যাঁহার শক্তি কার্য্য করিবে তিনি লেখনী ধারণ করিবেন কেন? যিনি বিধাতা হইয়া বর্ত্তমান কালে সমুদায় বিধান করেন তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার লেখক হইবেন কেন? বিধাতার অনুষ্ঠানে লেখকের ব্যবসায় স্থান পায় না। লেখা ও করা বিধাতার পক্ষে একই। বিধাতা পুরুষ

জীবের কপালে বিধি লেখেন ইহা যদি মানিতে হয় তাহা হইলে তিনি প্রতি মিনিটে লেখেন ও করেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর আমাদিগের বিধাতা। তিনি ভূত কালে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে বিধি স্থাপন করেন, এবং নিজেই বিধাতা হইয়া সেই বিধি পূর্ণ করেন। তিনি জগৎ সৃজন করেন, তিনি জগৎকে নিয়মিত করেন, এবং যিনি কর্ত্তা হইয়া স্বহস্তে জগৎ পরিচালিত করেন। তিনি কেবল পুস্তক রচয়িতা নহেন, তিনি কেবল আমাদের কপালে পুস্তক লিখিয়া দিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা নহে; কিন্তু যাহা কপালে লিখিয়াছেন তাহা নিজে ঘটাইতেছেন, অথবা যাহা স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া ঘটাইতেছেন তাহাই আমাদের জীবনে লিখিত হইতেছে। ঈশ্বরের সম্পর্কে ভূত ভবিষ্যৎ নাই; তিনি ভূতকালে লিখিয়া দিয়াছেন এখন আর লেখেন না ইহা হইতে পারে না। তিনি ক্রমাগত ঘটনা লিখিতেছেন। যিনি চিরবর্ত্তমান তিনি আর ভবিষ্যতের জন্য লিখিয়া দিবেন কি? ঈশ্বর তো আর পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান নাই যে, তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন। পৃথিবীর মহাজনেরা বিদেশে চলিয়া যাইবার সময়, বিষয়ীরা পরলোকে যাইবার সময় আপন আপন সন্তানাদির জন্য বিষয়াদি স্থির করিয়া লিখিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর কি পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও

চলিয়া গিয়াছেন? মৃত্যুর পর সন্তানেরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইবে এই জন্য তিনি কি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা লিখিলেন? কি আশ্চর্য্য, কি ভয়ানক মত! লেখা কোথায়? কলম কেন? হস্ত বল। তিনি বিশ্বাসীদের হস্ত ধরিয়া আপনি কার্য্য করান।

যাহা কিছু সৎকার্য্য সকলই ঈশ্বর করান। যেমন কোরাণে লিখিত আছে;—"হে মানব! তোমার যে কোন মঙ্গল হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কোন অমঙ্গল হয়, তাহা আপনা হইতে।" মনুষ্য যাহা করে তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। যাহা শুভকর, যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, যাহাতে স্বর্গ রাজ্যের স্থাপন ও বিস্তার হয়, যাহাতে অসাধু জগৎ সাধু হয় সে সমস্ত ঈশ্বর করেন। ঈশ্বর কেবল লিখিয়া দেন না, কিন্তু তিনি যাহা লেখেন তাহাই করেন, অথবা যাহা করেন তাহাই লেখেন। তিনি আমাদের প্রাণের ভিতরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন তাহাই তাঁহার লেখা। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার হস্তের রচনা। জগৎ সৃজন ও জগৎ লেখা একই। মানুষের হিতের জন্য তিনি যে সকল শুভ অনুষ্ঠান করেন তাহাই তাঁহার লেখা। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহার পুস্তক। তিনি যাহা করেন তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। বিধাতার লেখা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু বিধাতা কাহারও কপালে পাপ লেখেন না। পুণ্যময় বিধাতা কেবল পুণ্যই লেখেন। পাপ পুণ্যহস্ত

কিরূপে লিখিবে? পাপ মানুষ লেখে, মানুষ করে। বিধাতার সঙ্গে পাপের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব নাই। সুতরাং যাহা বিধাতা লেখেন না, তাহা অনতিক্রমণীয় নহে। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ অনিবার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পুণ্যের তেজ, যেখানে বিশ্বাস ভক্তি ও যোগের বল সেখানেই বিধির অখণ্ড লেখা। পাপ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। ইহা যে হইতেই হইবে এমন কিছু বিধি নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও অধর্ম্ম করিতে হইবেই হইবে এমন লেখা নাই। পুণ্য অনিবার্য্য, ঈশ্বর উহা লেখেন, উহা অবশ্যই হইবে।

যেখানে বিধাতার লেখা সেখানে প্রবলবেগে ব্রহ্মের সুদর্শন চক্র ঘুরিতে থাকে। ঈশ্বরের বল যখন চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে তখন জানিবে ইহা নিশ্চিত বিধির লেখা, ইহা বারণ মানিবে না। একবার যাহার হৃদয়ে বিধাতা প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সাধ্য নাই যে, সে বিধাতার কার্য্যে বাধা দেয়, অথবা বিধাতার লেখা লঙ্ঘন করে। বিধাতা যাহার সঙ্গে যাহা লিখিতেছেন তাহা হইবেই হইবে। তিনি কাহারও কপালে যোগ লিখিয়া দিতেছেন, কাহারও অদৃষ্টে ভক্তি লিখিয়া দিতেছেন। তাহাদিগের পক্ষে যোগ-ভক্তি অনিবার্য্য, কপালের লেখা বাস্তবিক কপালের লেখা নহে। মনুষ্যের সমস্ত আত্মাতে, সমস্ত শরীরে রক্ত দ্বারা বিধাতা অস্থির মধ্যে লিখিয়া দেন। এ লেখাকে মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না, এ দুর্জ্জয় বিধিকে মানুষ পরাজয়

করিতে পারে না। কে বিধাতার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? যাহা বিধাতা লেখেন তাহা হইবেই হইবে।

পৃথিবী সহস্র প্রকারে উৎপীড়ন করুক না কেন, রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি আনিয়া দিক না কেন, বিধাতা যাহার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সে করিবেই করিবে। যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর দয়া লিখিয়া দিতেছেন, সে সহস্র প্রতি-বন্ধক পাইলেও প্রাণ দিয়া পরের দুঃখ মোচন করিবে। যাহার জীবনে বিধাতা ধর্ম্মপ্রচারব্রত লিখিয়া দিয়াছেন সে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভয়ানক প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও তাহার আপনার প্রাণ মন ধর্ম্মপ্রচারে অর্পণ করিবে। ব্রহ্মাণ্ডপতির বিরুদ্ধে পৃথিবী দাঁড়াইবে? মানুষ, তুমি কে যে বিধাতার কার্য্যে বাধা দিবে? বিধাতার বল ভিন্ন তুমি কিছুই করিতে পার না, তুমি একটি ভ্রাতার দুঃখ মোচন করিতে পার না, যদি তোমার হৃদয়ের ভিতরে বিধির বল না আসে। যখন বিধাতা ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন তখন সেই মানুষ আপনার ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া সহস্র সিংহের মহাপরা-ক্রমের সহিত বিধাতার ইচ্ছা পালন করে।

বিধাতার অভিপ্রায় এবং বল ভিন্ন পৃথিবীতে কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। তিনি আমাদের সংসারে জাগ্রৎ জীবন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদায় শুভকার্য্য সংঘটন করিতেছেন। অভিনয়ক্ষেত্রের পশ্চাতে সেই অনন্ত পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপনে আপন অভিপ্রায় সাধন করিতেছেন। ইতিহাসের

সমস্ত ঘটনাপুঞ্জে তাঁহার মঙ্গলহস্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বিশ্বাস-নয়নে সুতীক্ষ্ণ যোগদৃষ্টিতে সমুদায় সাংসারিক ঘটনার মধ্যে ঐ হস্ত দেখা যায়। প্রত্যেক শুভ ঘটনার মূলে তাঁহার শক্তি কার্য্য করে। দাম্ভিক মনুষ্য, তুমি মনে কর তুমি জগতে কল্যাণ সাধন করিতেছ; কিন্তু দেখ তুমি তোমার দয়াব্রত ছাড়িয়া দিলে বিধাতার অন্যান্য উৎসাহী সেবকেরা আসিয়া তোমার কার্য্য করিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। বিধাতা স্বয়ং রাজা এবং কর্ত্তা হইয়া সকল মঙ্গল কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া লইবেন। হে অহঙ্কারী মানব, তুমি ভারতবর্ষের কুসংস্কার দূর করিবার ভার ছাড়িয়া দিলে কি আর কেহ ঐ কার্য্য করিবে না? বিধাতার ইঙ্গিতে সহস্র যুবা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইবে। তুমি কে? বিধাতাই সকল কল্যাণের মূলীভূত কারণ। তিনি সকলের প্রাণের ভিতরে থাকিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতেছেন। তিনি আমার বাগ্‌যন্ত্রের যন্ত্রী, আমি যে সকল সৎ-কথা বলিতেছি তাহার প্রত্যেক কথা তাঁহার কথা। যে দিন বলিব আমি নিজের বলে ও আমার নিজের বুদ্ধিতে শুভ কার্য্য করি- সে দিন আমি নাস্তিক হইব। প্রত্যেক শুভ কার্য্য ব্রহ্ম করাইতেছেন। 'আমি' বলিয়া যে এক ভয়ানক অহঙ্কারী আছে তাহার নিজের কোন শুভকার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। যখন আমি কোন শুভ কর্ম্ম করি তখন আমি আমার নহি, তখন আমি ঈশ্বরের। যখন মানুষ আপনার

নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ আত্মবিসর্জ্জন করে, তখন সে দেখিতে পায় স্বয়ং বিধাতা তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আপনার অভিপ্রায় সকল পূর্ণ করিতেছেন।

এই বঙ্গদেশে বিধাতা আসিয়া অলৌকিক ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবে নববিধানের প্রাদুর্ভাবে পুরাতন ভ্রান্তি কুসংস্কার ও অবিশ্বাস সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সত্যের বল, বিধানের বল প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আস্ফালন করিয়া বহুকালের সঞ্চিত অসত্য সকল দূর করিয়া দিতেছে। বিধাতার দুর্জ্জয় বলে এই দেশ টলমল করিতেছে। বিধাতার বল কি ভয়ানক! যেমন জলপ্লাবনে জল স্ফীত হয়, তেমনি মহাবেগের সহিত নববিধানের রাজ্য বিস্তার হইতেছে। সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতা এই নববিধানভুক্ত প্রতিজনকে বলিতেছেন,—প্রাণপণে আমার এই নূতন বিধান স্থাপন ও প্রচার কর। তিনি বঙ্গদেশের প্রতিজনকে বলিতেছেন,—নববিধান পূর্ণ কর। এই বিধাতা পুরুষ আমাদের সকলের মাথার উপরে নববিধানের গুরুভার স্থাপন করিয়াছেন, আমরা কি ইহা ফেলিয়া দিতে পারি?

সাধকগণ, দেখ তোমাদিগের স্কন্ধে কে বসিয়া আছেন, স্বয়ং বিধাতা। তাঁহার লিখিত বিধি, তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া তোমরা কি ক্ষান্ত হইতে পার? ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার সত্যরাজ্য স্থাপন করিতেছেন, তিনি যদি তোমাদিগকে যন্ত্র করেন, তোমরা কি অস্বীকার করিতে পার, না বাধা

দিতে পার? যাহা কিছু ভাল সকলই তিনি নিজে করিতেছেন, তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মস্রোতে পড়িয়া বহুকালের পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ অসাড় ভাব সমস্ত চলিয়া যায়। যাহাকে তিনি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন সে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। তিনি বিশেষ বিশেষ লোকের কপালে বিশেষ বিশেষ বিধি লিখিয়া দেন, তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোককে বিভিন্ন আদেশ করিতেছেন, যথা, তুমি প্রচারক হও; তুমি বৈরাগী হও; তুমি সপরিবারে যোগ সাধন কর; তুমি ধন ব্যয় করিয়া দয়াব্রত পালন কর এবং পরসেবায় সর্ব্বস্ব সম্প্রদান কর; তুমি রাজা হইয়া প্রজাদিগকে কুশল ও কল্যাণ দান কর; তুমি বিদ্যা দান করিয়া অজ্ঞানতিমির নাশ কর, এ সকল তোমার আমার কপালে লেখা। কপাল কি না ঈশ্বরদত্ত বিশেষ বল। সে বলকে আমরা প্রতিঘাত করিতে পারি না। দৈব বল চাপিলে, বিধির কলম স্পর্শ হইলে আমরা আর অন্যথা করিতে পারি না।

কপালে লেখা কি কেহ অতিক্রম করিতে পারে? যখন বিধাতা আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন আমি দৈবশক্তি পাইলাম, আমি সহস্র সিংহের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলাম; আমার উৎসাহাগ্নি এমনই প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যদি শত্রুরা মহাসমুদ্রের সমস্ত জল ঢালে তথাপি তাহা নির্ব্বাণ হইবে না, এবং আমার ভক্তিসিন্ধু এমনই প্রবল

বেগে উথলিয়া উঠিল যে, যদি ভয়ানক দাবাগ্নি প্রজ্বলিত কর তথাপি তাহা শুকাইবে না। জয় ধর্ম্মরাজ, জয় ধর্ম্মরাজ বলিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পৃথিবীকে জয় করিব, বৈরাগ্য অগ্নি লইয়া আসক্তিকে ভস্ম করিব। স্বয়ং বিধাতা লিখিতেছেন, আর ভয় কি? চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী। বিধাতা যাহা আমার মনের ভিতরে লিখিয়া দিতেছেন আমার কি সাধ্য যে তাহা লঙ্ঘন করি? তিনি লিখিয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন "ভক্ত, তুমি এই উপাসনার পর চক্ষু খুলিলে সৃষ্টির মধ্যে আমাকে দেখিবে।" যেমন উপাসনা শেষ হইল ঘূর্ণিত নয়নে আমি আকাশের পানে তাকাইলাম, চারিদিক হইতে এক প্রকাণ্ড নিরাকার বিধাতার বাহু আমাকে চাপিয়া ধরিল; আমি উন্মীলিত নয়নে সমস্ত বিশ্বমধ্যে সেই বিরাট মূর্ত্তি দেখিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন;—"দেখ্ রে বিধাতার সন্তান, তোর কপালে যাহা লিখিয়াছি তাহা কি লঙ্ঘন করিতে পারিস্।"

বিধাতার বিধি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার সম্পর্কে বিধাতা যাহা লিখিয়া দেন ও করেন তাহার তাহা হইতেই হইবে। যখন বিধাতা জীবের কল্যাণ সাধন করেন সমস্ত পৃথিবী বাধা দিতে পারে না। বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সন্তানকে তিনি যদি খাওয়াইবেন মনে করেন কে প্রতিবন্ধক হইতে পারে? নিরাশ্রয় অবস্থাতেও সেই ভক্ত আশ্রয় পাইবে, এবং অসম্ভব হইলেও অন্নাচ্ছাদন লাভ করিবে।

কেন না বিধাতার বিধি এইরূপ। ঘোর সংসারীরা যেখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে আশ্চর্য্য অলৌকিক প্রণালীতে ভক্তকুলের ভরণপোষণ হয়, এবং সমুদায় বিঘ্ন ও অভাব মোচন হয়। অনেকে বলে ভক্তের কপালে লেখা আছে, তাহার কল্যাণ হইবেই হইবে। বাস্তবিক হরি রাখিলে মারে কে? কপালে যদি বিধাতা ভক্তের শ্রীবৃদ্ধি লিখিয়া দেন, এবং নিজশক্তিতে তাহা করিয়া দেন, লক্ষ লক্ষ শত্রু আক্রমণ করিলেও অন্যথা হইবে না। যাহাতে ভাল হয় ভক্তাধীন বিধাতা এরূপ করিবেনই করিবেন। মন্দ যাহা তাহাতে তাঁহার হস্ত নাই। ভাল হওয়া, সাধু সত্য-বাদী হওয়া, জিতেন্দ্রিয় বৈরাগী হওয়া, অনাসক্ত সংসারী হওয়া এ সমুদয় বিধির লেখা। মঙ্গলময় বিধাতা কখন অমঙ্গল লিখিতে পারেন না। মন্দ, অমঙ্গল,-পাপ মানুষের। আমাদের ধর্ম্মজীবনে, আমাদের সাংসারিক কার্য্যে, জগতের সমস্ত হিতকর ঘটনাতে, বিধাতার বিধান দেখা যায়। আবার উৎসব আসিতেছে, এই উৎসব আমাদের কপালে লেখা, বলা যাইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত বিধাতাকে মানেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইবেন উৎসবের আয়োজন স্বয়ং বিধাতাই করেন। ঈশ্বর আমাদের কপালে লিখিলেন,—উৎসবের স্বর্গীয় সুখে সুখী হও; আমাদের ঐ সুখে সুখী হইতেই হইবে। উৎসবের আনন্দের জন্য সকলে প্রতীক্ষা কর।

জগজ্জননী এবং তাঁহার সাধু সন্তানগণ।

রবিবার রাত্রি ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ২২এ আগষ্ট, ১৮৮০।

কোথায় মার সঙ্গে সন্তানের মিলন হইবে, না পৃথিবীর বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে মার সঙ্গে সন্তানের বিবাদ ঘটাইয়া দিল। নানা প্রকার উপধর্ম্ম কুসংস্কার কুযুক্তি এই বিবাদ ঘটাইল। যে মা অতি উচ্চ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য সাধু সন্তানদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, মানুষ তাঁহার সে অভিপ্রায় না বুঝিয়া ঐ সন্তানদিগের সঙ্গে মার অনৈক্য সিদ্ধান্ত করিল। সন্তান প্রেরণের অভিপ্রায় কি? ঈশ্বর কি আপনার কার্য্য আপনি করিতে পারিতেন না? তিনি পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যোগী বৈরাগী ভক্ত-দিগকে কেন প্রেরণ করেন? এই জন্য কি যে ঈশ্বরের দ্বারা যাহা হইতে পারে না, তাহা তাঁহার সন্তান দ্বারা সম্পন্ন হইবে? পৃথিবীতে ব্রহ্মভক্তি যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি শিখাই-বার বাস্তবিক খুব প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সময়ে সময়ে এখানে যোগী বৈরাগী ভক্তদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে কেন শিক্ষা দিলেন না? ঈশ্বর নিজে ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত হইবেন কিরূপে? মা হইয়া তিনি মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। পিতা হইয়া ঈশ্বর নিজে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। পিতা মাতার কিরূপ চরিত্র হওয়া উচিত তাহা তিনি দেখাইতে

পারেন, কিন্তু সন্তানের কর্ত্তব্য কি তাহা তিনি নিজ ব্যবহারে বুঝাইতে পারেন না। পিতার এমন পুত্র চাই যিনি জগৎকে পিতৃভক্তি শিখাইবেন, মার এমন কন্যা চাই যিনি জগৎকে মাতৃভক্তি শিখাইয়া দিবেন। সন্তান গোপনে মার কাছে মাতৃভক্তি শিখে বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে সমুদায় ভাই ভগ্নীদিগকে মাতৃভক্তি শিক্ষা দেয়। সেই মাতৃভক্ত সন্তানের সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের নরনারী মাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। মার প্রতি সন্তানের ভক্তির দৃষ্টান্ত না দেখিলে পৃথিবী সহজে মাকে ভক্তি করিতে পারে না। মা শিখাইতে পারেন মার ভাব। জননী হইলে সন্তানদিগের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম সহকারে দিবস রজনী কেমন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হয় জগতের জননী সেই দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, এবং কেমন অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে সন্তানদিগের সমস্ত অত্যাচার বহন ও অপরাধ ক্ষমা করিতে হয় বিশ্বজননী তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন; কিন্তু মাকে কিরূপে ভক্তি করিতে হয় তিনি তাহার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না। তিনি কাহাকে ভক্তি করিবেন? ঈশ্বরের আবার গুরু কে আছে যে তিনি তাহাকে ভক্তি করিবেন? অতএব মাতৃভক্তি শিখাইতে হইলে পুত্র চাই! ধর্ম্মের এক ভাগ উপরার্দ্ধ, অর্থাৎ পিতা মাতা রাজা প্রভু প্রভৃতি গুরুজনের দিকে; আর এক ভাগ নিম্নার্দ্ধ অর্থাৎ পুত্র কন্যা প্রজা কনিষ্ঠের

দিকে। ঈশ্বর পূর্ব্বার্দ্ধের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন, শেষার্দ্ধের দৃষ্টান্ত মনুষ্য। পিতা মাতাদিগকে কিরূপ ভক্তি করিতে হইবে তাহা কেবল পুত্র কন্যারাই শিখাইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বর জগতে সময়ে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর সাধক প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যে যুগে যুগে মহাপুরুষ মহাত্মা সাধু সকল আসেন তাহার অর্থ এই। তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিরূপে অন্তরের সহিত সমস্ত প্রাণ দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হয়, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। পিতাকে ভালবাসিলে, মাকে ভক্তি করিতে হইলে কেমন করিয়া মার স্বভাব রুচি ও ইচ্ছা জানিতে হয়, এবং তাঁহার সঙ্গে কিরূপে নিগূঢ় প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে হয় সেই সাধক এ সকল বিষয় শিক্ষা দেন। যেমন ভক্তের প্রয়োজন সেইরূপ কর্ম্মী অথবা সেবকেরও প্রয়োজন। মা যদি কর্ম্ম করিতে বলেন কায়-মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, যদি তিনি আদেশ করেন, তাঁহার দুঃখী দুঃখিনী সন্তানদিগের দুঃখ মোচন করিতে হইবে। মার ইচ্ছাতে যেমন তাঁহার সন্তানদিগের সেবা করিবার জন্য নদ নদী অগ্নি বায়ু ফুল ফল উৎপন্ন হয় সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাতে সাধু সেবকেরাও জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন সাধুগণ ঈশ্বরের এক একটি বিশেষরূপ অথবা গুণ প্রকাশ করেন। ভ্রান্ত মনুষ্য সাধু-

দিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকতর সম্মান করে, এবং মার সঙ্গে অনৈক্য করিয়া দেয়। কোথায় সকলে সেই এক মাকে ভক্তি করিতে শিখাইবে, তাহা না করিয়া সাধুসন্তানগুলিকে মার সিংহাসনে বসাইল, এবং মাকে হাত ধরিয়া নীচে টানিয়া আনিল। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কদাচ মার প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করিও না। এই যে তোমরা নারদ ঈশা মূসা প্রভৃতির নাম করিতেছ, সাবধান, মা অপেক্ষা ইহাঁদের কাহাকেও বড় মনে করিও না। প্রভু অপেক্ষা দাসকে উচ্চতর জ্ঞান করিও না। সন্তান অপেক্ষা মাকে ছোট মনে করিও না। তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া কদাচ সাধু-দিগকে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় অথবা ঈশ্বর তুল্য মনে করিতে পার না। তোমরা মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছ, তাঁহার কোন পুত্রের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখ নাই। পুত্রের পূজা করিয়া জননীর নিকটে তোমাদের আসিতে হয় নাই। কোন অবতার তোমাদের হাত ধরিয়া ব্রহ্মের নিকটে আনেন নাই। তোমাদের সঙ্গে মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমরা আগে মাকে পূজা করিয়াছি। তাঁহার কোন সন্তানকে পূর্ব্বে বিশেষরূপে চিনিতাম না। মাকে বলিতাম, তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেখানেই যাইব, তুমি যাঁহাদিগকে দেখাইবে তাঁহাদিগকে দেখিব, যাঁহাদিগকে সমাদর ও প্রীতি করিতে বলিবে তাঁহাদিগকে আদর ও প্রীতি করিব। পরে মা যখন

তাঁহার একটি সাধু পুত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদিগকে চিনিতে লাগিলাম। বাস্তবিক যদি সত্য কথা বলিতে হয় ঈশ্বরের সাহায্য বিনা কেহ তাঁহার পুত্রকে চিনিতে পারেন না। মার সাহায্য বিনা কে তাঁহার সন্তানকে বুঝিতে পারে? ঈশ্বরের এক এক গুণ তাঁহার এক এক সন্তানের চরিত্রে অবতীর্ণ ও নিহিত। ব্রহ্মস্বরূপ মনুষ্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ, এক এক গুণ তাঁহার এক এক সন্তানের চরিত্রে অবতীর্ণ ও নিহিত। ব্রহ্মস্বরূপ মনুষ্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ কিন্তু যখন ব্রহ্মের একটি একটি গুণ সাধুর জীবনে প্রকাশিত হয় তখন জগতের লোক সহজে তাহা বুঝিতে ও সাধন করিতে পারে। এক একটি সাধু মার হৃদয়ের সন্তান, হৃদয় হইতে উৎপন্ন, হৃদয়ে প্রতিপালিত, হৃদয়ের স্তন্য পানে পরিপুষ্ট। কেহ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে প্রসূত। জ্ঞানেতেই তাঁহার জন্ম, জ্ঞানেতে পালিত ও পরিপুষ্ট। ঈশ্বরের এক এক দিক হইতে তাঁহার এক এক গুণ লইয়া এক এক সাধু জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি সেই গুণটি প্রকাশ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করেন। ঈশ্বরের কোমল দয়ার দিক্ হইতে যে সন্তান অবতরণ করেন তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ তাঁহার দয়াগুণে শীতল ও কোমল হয়! শ্রীগৌরাঙ্গের তনু হরিপ্রেমে গঠিত তনু। ব্রহ্মের দয়া তাঁহাতে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিল, এবং সহস্র

সহস্র নরনারীকে প্রেমের পথে লইয়া গেল। চৈতন্যমাতা জগজ্জননীকে লইয়া যদি চৈতন্যকে দেখিতে যাও তাহা হইলে যথার্থ শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। আর যদি পৃথিবীর চৈতন্যকে লইয়া মার কাছে যাও তাহা হইলে দুইয়ের কাহাকেও বুঝিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। চৈতন্য যাঁহার সন্তান তিনি যদি স্বয়ং চৈতন্যকে চিনাইয়া না দেন তোমার কি সাধ্য যে তুমি ঐ ভক্তকে চিনিতে পার? মা প্রদীপ ধরিয়া তাঁহার সুপুত্র-দিগকে না দেখাইয়া দিলে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহার বাড়ীতে অগণ্য ঘর। এক এক ঘরে তাঁহার এক এক রূপ, এবং এক এক সাধু তাঁহার এক এক রূপের অবতার, যখন তিনি এক এক ঘরে লইয়া গিয়া প্রদীপ হস্তে করিয়া দেখাইয়া বলেন, এই ঘরে আমার ঈশা, ঐ ঘরে মুসা, এখানে চৈতন্য, ওখানে শাক্য, ওখানে যাজ্ঞবল্ক্য, তখনই আমরা তাঁহার সাধু সন্তানদিগকে দেখিতে পাই, এবং চিনিতে পারি। তাঁহার এক এক শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন। তিনি সেই শক্তির পূজা প্রকাশ করেন ও জগতে সেই শক্তিকে মহীয়সী করেন।

বিশ্বজননীর নিকট শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদের হস্ত ধরিয়া আপনার সাধু সন্তানদিগের ভবনে লইয়া যান। এই জন্য সময়ে সময়ে আমাদের তীর্থযাত্রা

হয়। সেই তীর্থযাত্রা আর কিছু নয়, মা আদর করিয়া এ পৃথিবীর ভক্তদিগকে বৈকুণ্ঠবাসী সাধু তনয়দিগের সঙ্গে মিলিত করেন। মা নিজে সাধক সন্তানকে তাহার নিকটস্থ আত্মীয় বন্ধুর কাছে লইয়া যান। মার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মা তাঁহার ঘরের পার্শ্বে যত সাধু অধিবাস করেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। মার বাড়ীতে গেলে তাঁহার সন্তানদিগকে দেখিয়া আসা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যখনই কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মার বাড়ীতে যাই, মা বলেন, এলে যদি স্বর্গে তবে তোমার ভাইগুলিকে দেখিয়া যাও। বাস্তবিক যদি পৃথিবী হইতে আকাশ অতিক্রম করিয়া স্বর্গে গেলাম তবে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবহিত সাধুদের শান্তিনিকেতনে যাইব না কেন? আর যখন মার একান্ত ইচ্ছা যে সাধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তখন আমরা সাধুদিগকে না দেখিয়া কিরূপে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিব? মার ইচ্ছা নয় যে আমরা তাঁহার কোন সাধু পুত্রের বিরোধী হই।

মা ধরাধামে স্বর্গের কীর্ত্তি দেখাইতে ইচ্ছা করেন। মার ইচ্ছা যেমন স্বর্গেতে তেমনি পৃথিবীতে পূর্ণ হউক। বৈকুণ্ঠে যেমন তাঁহার সকল সাধু সন্তানের মধ্যে সুন্দর ঐক্য তেমনি পৃথিবীতেও হয় এই তাঁহার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি বর্ত্তমানকালে নববিধান প্রেরণ করিলেন। এই নববিধানের জয় হইলে মার সঙ্গে সন্তানের বিরোধ থাকিবে

না, এবং সন্তানদিগের পরস্পরের মধ্যেও আর বিবাদ থাকিবে না। নববিধান আগে কোন বিশেষ সাধুর নিকটে না গিয়া একেবারে মার কাছে গেলেন। মার কাছে গিয়া নববিধান মার প্রাণের মধ্যে সমুদয় ধর্ম্মবিধান এবং সমুদয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মিলন দেখিলেন। মার হৃদয়ের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টীয় প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের ঐক্য দেখিলেন। জগজ্জননীর বক্ষে এক দিকে শুকদেব নারদ প্রভৃতি যোগী ঋষিগণ, অপর দিকে ঈশা মুসা চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ। ইঁহারা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, ইঁহারা মার স্বভাবের বিচিত্রতার পরিচয় দিতেছেন। মা এক কিন্তু তাঁহার রূপ গুণ অসংখ্য। তিনি যেমন এক, যদি তাঁহার রূপ গুণও এক প্রকার হইত তাহা হইলে তাঁহার সন্তানগুলিও এক প্রকার হইত। সমস্ত প্রেরিত মহাপুরুষ এক প্রকার হইতেন, এক ভাব প্রকাশ করিতেন এবং একই প্রকার কর্ম্ম করিতেন। পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত না। মা এক, কিন্তু মার অনেক গুণ এবং অনেক রূপ আছে। সেই এক এক গুণ হইতে তাঁহার বিচিত্র রূপ সাধু সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ঈশা একরূপ, চৈতন্য একরূপ, এবং অন্যান্য সাধুরা মার অন্যান্য রূপ প্রকাশ করেন। মার কোটি রূপ, অসংখ্য রূপ হইতে অসংখ্য প্রকার সাধু চরিত্র গঠিত হয়। পৃথিবী এত দিন বিভিন্ন সাধুদিগের মধ্যে এবং বিভিন্ন ভক্ত জীবনে বিচিত্র হরিলীলার সামঞ্জস্য

দেখিতে পায় নাই, এই জন্য পৃথিবীতে এত বিরোধ এবং অনৈক্য। এখন নববিধান পৃথিবীতে আসিয়া বলিলেন ;— "আমি রহস্য শিখিয়া আসিয়াছি, আমি সমুদায় বিরোধের মীমাংসা কিসে হয় তাহা জানিয়াছি। সমুদায় রোগের ঔষধ আনিয়াছি। জগজ্জননী এক ; কিন্তু তাঁহার রূপ অসংখ্য এবং গুণ বিচিত্র এই জন্য সন্তানও বিচিত্রগুণ-সম্পন্ন। বিরোধ নাই, কেবল বিচিত্রতা। এত দিনের পর সমুদায় ধর্ম্মের মীমাংসা হইল। মাতৃক্রোড়ে সাধু-সম্মিলন হইল।"

স্বর্গীয় জননীর এক এক গুণের মধ্যে তাঁহার সেই গুণসম্ভূত শত শত সন্তানকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি মার জ্ঞানস্বরূপ ভাবি তাহা হইলে সেই রূপের ক্রোড়ে সক্রেটিস্ প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানীদিগকে দেখিতে পাইব। তাঁহার ঘনীভূত জ্ঞানরূপের মধ্যে বাগেদবী সরস্বতীর ক্রোড়ে শত শত সুপণ্ডিত সন্তানকে দেখিতে পাইব। সেই জ্ঞানীরা জ্ঞানের সন্তান, ভক্তির সন্তান নহেন। জ্ঞানের পুত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিবে, কদাচ তাঁহাদিগকে প্রেমের সন্তান বলিয়া ভ্রান্ত মত পোষণ করিও না। জ্ঞানী ও ভক্ত. সক্রেটিস্ ও চৈতন্য উভয়ই বিশ্বমাতার সন্তান বটে, কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানস্বরূপের পুত্র এবং যিনি ভক্ত তিনি প্রেমস্বরূপের সন্তান। এই প্রভেদ, বুঝিতে না পারিয়া পৃথিবীর অশেষ অকল্যাণ হইয়াছে। যখন ঈশ্বরের জ্ঞানের

ঘরে যাইবে তখন তাঁহার জ্ঞানী সন্তানদিগকে দেখিতে পাইবে। জ্ঞানী বলিয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করিবে। আবার যখন তাঁহার প্রেমের ঘরে যাইবে সেখানে তাঁহার প্রেমিক ভক্ত সন্তানদিগকে দেখিতে পাইবে। তাহাদিগকে প্রেমপুত্র বলিয়া যথোচিত সম্মান দিবে। আবার যখন লক্ষ্মীমূর্ত্তির ঘরে যাইবে, কতকগুলি লক্ষ্মীর সৌভাগ্যশালী সন্তান দেখিতে পাইবে; দেখিবে তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছেন, আশ্রিতদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতেছেন, এবং হতভাগ্যদিগের সৌভাগ্য বৰ্দ্ধন করিতেছেন। মার শক্তি যখন দেখিবে অমনি দেখিবে মার কোলে শত শত কর্ম্মী শক্তিসন্তান জগতের কল্যাণ জন্য কায়মনোবাক্যে নানাবিধ সাধুকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং পরোপকারের ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ ধর, এক একটি স্বরূপের অনুরূপ এক একজন প্রধান সাধু দেখিতে পাইবে।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। নববিধান স্বর্গ হইতে মীমাংসার গূঢ় রহস্য জানিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে সকল তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। নববিধানের সাহায্যে সকলকেই তোমরা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। তাঁহারা তোমাদিগকে বন্ধু বলুন আর না বলুন তোমরা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে তোমাদের আপনার মার সন্তান বলিয়া আদর করিতে পারিবে। হে নব-

বিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি কাহাকেও অনাদর করিতে পার না। তুমি দীন হীন সামান্য একটি ফকিরকেও অপমান করিতে পার না। যদি একটি ক্ষুদ্র ফকিরকে তুমি অবহেলা কর, মার বৈরাগ্যস্বভাবের অপমান হইবে। মাকে ভালবাসিলে তাঁহার সমুদয় সন্তানগুলিকেও ভালবাসিতে হইবে। আমরা সাধু-বিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা কোন সাধুকে ঈশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। আমরা সর্ব্বাগ্রে মাকে ভালবাসিয়াছি, এবং মার কথাতেই তাঁর সাধু সন্তানদের সেবা করিয়াছি। যদি মা বলিয়া না দিতেন, যদি মা দেখাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা এ সকল সাধুদিগের নামও উচ্চারণ করিতাম না। সাধুদিগের মধ্যে আমরা মার নানাপ্রকার শক্তি ও গুণ দেখিতেছি। এক এক মনুষ্যাধারে এক এক দৈবশক্তি। মাকে খুঁজিতে গিয়া সাধুভবনে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা মাকে অন্বেষণ করিয়াছি, আমরা কোন সাধুকে অন্বেষণ করি নাই; কিন্তু এখন যখন মা তাঁহার সাধু সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বলিতেছেন তখন কিরূপে মার কথা লঙ্ঘন করিব? আমরা এখন মার। আমরা আর আমাদের নহি। আমাদের উপর আর নিজের কোন অধিকার নাই। মার হাতে সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি। আমরা আগামী কল্য কি করিব কোথায় যাইব জানি না। মা যাহা করান তাহাই করিব। মা স্বাধীন, তিনি আমাদের সমুদায় প্রেম ভক্তি

পাইয়াছেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; তাঁহার উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আমাদিগকে পৃথিবীর কাঙ্গালদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন, কিংবা তাঁহার সাধুদিগের স্বর্গীয় ভবনে লইয়া যাইতে পারেন তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর শুভ দিন আসিয়াছে। এই নববিধানে সমুদয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরস্পরের গলা ধরাধরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রেমময়ীর একান্ত ইচ্ছা আমরা তাঁহার সাধু সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হই। সমুদয় ভাইগুলি সদ্ভাবে মিলিত হউক, ইহা মার ইচ্ছা। মার সেই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আমার মা সত্য কি না?

[একাদশ ভাদ্রোৎসব]

রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক; ২২এ আগষ্ট, ১৮৮০।

তোমরা অনেক ভদ্র লোক এই মন্দিরে বসিয়া আছ। এই আনন্দের দিনে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া উৎসব সম্ভোগ করিতেছ। তোমাদিগকে আজ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কোন ক্ষতি নাই, বরং আমি বিবেচনা করি লাভের সম্ভাবনা। সে প্রশ্নটি এই, তোমরা আমার মাকে দেখিয়াছ

কি না? আমার মন জানিতে চায় তোমরা কেহ কি এই মন্দিরের ভিতরে আমার মাকে দেখিয়াছ? আমার জননীকে তোমরা কি এই বিশ্বমধ্যে এই নগরে কোন স্থানে এই মন্দিরের মধ্যে কখন দেখিয়াছ? তোমরা বিশ্ব-জননীকে দেখিয়াছ কি না সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মাকে দেখিয়াছ কি না, এ কথা বলিয়া আমার প্রশ্নকে শিথিল ও ক্ষীণ করিব না; কিন্তু আমার মাকে কি তোমরা কেহ দেখিয়াছ, অদ্যকার এই প্রশ্নের উত্তর দাও। মাতায় মাতায় বিরোধ উপস্থিত করিতেছি না। তোমাদের মা কি আমার মা নহেন? বিশ্বজননী কি আমার জননী নহেন? পূর্ব্বাঞ্চলের মা কি পশ্চিমাঞ্চলের মা নহেন? প্রাচীন জগতের মা কি বর্ত্তমান জগতের মা নন? আর্য্য যোগী ঋষি এবং ভক্তদিগের মা কি তোমার আমার মা নহেন? সকলেরই স্রষ্টা এক, সে বিষয়ে কোন তর্কের সম্ভাবনা নাই। সমুদায় মনুষ্যপরিবারের একই মাতা। আমার প্রশ্ন তত্ত্বসম্বন্ধীয় নহে, ভক্তিসম্বন্ধীয়। তোমরা ভক্তিভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা কর।

আমি যে একজন লোক ক্রমাগত এই বেদী হইতে আমার মার মহিমা ঘোষণা করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে তাঁহার গুণের কথা শুনাইয়াছি, আমি অবশ্যই এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, তোমরা কি আমার সেই মাকে কখন দেখিয়াছ? এই মন্দিরের ভিতরে আমার

মা লুকাইয়া আছেন। তোমাদিগের পার্শ্বে তিনি বসিয়া আছেন। ঐ সঙ্গীতের স্থলে এবং ঐ যবনিকার অন্তরালে যেখানে মহিলারা বসিয়া আছেন সেখানেও আমার মা বসিয়া আছেন। কেহ কি তাঁহাকে দেখিয়াছ বল ঠিক করিয়া। এই বেদী হইতে এত বৎসর আমি যে মার কথা বলিলাম সেই মাকে কি তোমরা বিশ্বাস কর? তোমরা কি মনে কর একজন যাদুকর তাহার নিজের কল্পনা দ্বারা নানা প্রকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া এই বেদী হইতে প্রতি সপ্তাহে সেই সকল নূতন নূতন ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখাইয়া ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে লোকের মন কি মোহিত করে? তোমরা কি মনে কর এই যাদুকরের কথার জালে শ্রোতাদের বুদ্ধি এমনি জড়িত হয় যে আর বিচার করিতে পারে না, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া মনোহর কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া উহার পূজা করে? আমি কি তবে এই মন্দিরে যাদুকরের ব্যবসায় চালাইতেছি, এবং কল্পিত ঠাকুর দেখাইয়া তোমাদের মন ভুলাইতেছি? এরূপ ভয়ানক অসত্য কথা বলিয়া যদি আমার নামে অভিযোগ কর তাহা হইলে আমাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

আমার মার সম্পর্কে আমি মিথ্যা কল্পনা প্রচার করিয়াছি, এ অপবাদ আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি কি তোমাদিগকে এই বেদী হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রবঞ্চনা করিয়াছি? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা

আমার মাকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লও। যদি তোমরা আমার যথার্থ জীবন্ত মাকে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া না লও তবে ভবিষ্যদ্বংশের জন্য তোমরা কল্পনা রাখিয়া যাইবে। যদি আপনারা বাঁচিতে চাও, এবং জগতের কল্যাণ সাধন করিতে চাও তবে মাকে কতকগুলি কল্পনার সমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে দিও না। কি কলিকাতা কি অন্য স্থানে মা বাস্তবিক নাই, এবং মার প্রেমরাজ্যও নাই, কেবল একখানি কল্পনাচিত্রিত ছবি আছে, এরূপ ভয়ানক মিথ্যা কথা এ পৃথিবীতে তোমাদের থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। এই জন্য আজ তোমাদিগকে মাতৃ-পরীক্ষা করিতে বলিতেছি। যে মার কথা তোমাদিগকে এত কাল বলিলাম, যদি তোমরা তাঁহাকে আমার কল্পনা মনে কর তবে এই অপরাধী মিথ্যাবাদীকে উপযুক্তরূপে দণ্ড দিয়া তোমাদিগের সমাজ হইতে নির্ব্বাসন কর। কিন্তু ভাই পরীক্ষকগণ, তোমরা যদি নিজে অপরাধী হও, আমার নিকট সমুচিত দণ্ড লইয়া তোমাদিগকে আমার মার শরণাগত হইতে হইবে। আমি আমার মাকে কল্পনা দ্বারা সৃজন করিয়াছি এরূপ ভয়ানক অপবাদকে আমি কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি বিবিধ কল্পনার সাজে সাজাইয়া এক বিশ্বজননী প্রস্তুত করিয়াছি, এই অপবাদ খণ্ডনের জন্য আমি তোমাদিগের বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি।

আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি মাকে কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করি নাই। মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি যে সকল বর্ণনা করিয়াছি সে সমস্ত সত্য অভ্রান্ত সত্য। সে সকল বর্ণনাতে ভ্রান্তি ভ্রম কিছুই নাই। মার রূপ ঠিক যেমন দেখিয়াছি সেইরূপ বলিয়াছি। মার মুখে যাহা শুনিয়াছি ঠিক তাহাই বলিয়াছি, আমার নিজের কল্পিত কথা কিছুই নাই। তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা এক বলেন আমি তাঁহাকে তেত্রিশ কোটি বলিয়াছি। আমি একক বহু কল্পনা করিয়াছি। আমি এখনও বলিতেছি, যদিও আমার মা এক তাঁহার রূপ গুণ অসংখ্য ও অগণ্য। আমি চিরকাল কল্পনার প্রতিবাদ করি; আমি নিজে কল্পনার দাস হইব? যদি মার কোটি রূপের কথা বলিয়া থাকি সে এই জন্য যে অনেকগুলি রূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নির্জ্জনে, পরিবারমধ্যে, বন্ধুদিগের মধ্যে, দেশ বিদেশে, নানাস্থানে তাঁহার অনেকরূপ দেখিয়াছি। তাঁহার একরূপ নহে, তাঁহার অসংখ্য রূপ, যে দেখিয়াছে সে বলিবেই বলিবে। যে তাঁহার এক রূপ অথবা এক বর্ণ বলিবে সে অসত্যকথনদোষে অপরাধী হইবে। অপরাধ আমার নহে, যে মার অসংখ্য রূপ অস্বীকার করে তাহার। এই মন্দিরে এক এক রবিবারে সেই রূপের এক একখানি ছবি চিত্রিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক রবিবারের ছবি অন্য রবিবারের ছবির সঙ্গে মিলে না। বিচিত্র ছবি, যেন ভিন্ন ভিন্ন মা।

কখন সরস্বতী, কখন লক্ষ্মী, কখন যোগেশ্বরী, কখন মহাকালী। এবার কি ? এত ভিন্ন প্রকার দেবমূর্ত্তি! আমি কি করিব ? যাহা দেখিলাম তাহাই বলিলাম। মার বিচিত্র রূপ, সুতরাং ছবি এবং বর্ণনাও বিচিত্র হইল। এ বিচিত্রতা তোমরা অস্বীকার করিতে পার না।

আমি যে মার কথা বলিতেছি তিনি তোমাদেরও মা, আমারও মা। যদি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ কর বা সঙ্কুচিত হও তবে তিনি দেশ বিদেশে কেশবের মা বলিয়া পরিচিত হউন। যদি সে বিষয়ে লজ্জা ভয় না থাকে তাহা হইলে আমার মাকে এখনি তোমাদেরও মা বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহার যতগুলি মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়াছি সমুদায় মানিয়া লও। আমার মা সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া লও। তাঁহাকে দেখিলে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। যদি আমি মার কোন একটি রূপ মিথ্যা কল্পনা করিয়া থাকি তবে আমি মিথ্যাবাদীর অপরাধে কলঙ্কিত হইব। কিন্তু আমি কি সেই ভয় করি ? সর্ব্বারাধ্যা মোক্ষদায়িনী মার সম্পর্কে মিথ্যা বলিতে পারি না। আমি কি পুতুল বিক্রয় করিবার জন্য এই মন্দিরে দোকান খুলিয়াছি। আমি কি মার কল্পিত মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিলে আমার দিন চলে না, তাই কি লক্ষ্মী, বাগ্দেবী, প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লোকের নিকট সে সকল

মূর্ত্তি উপস্থিত করিতেছি? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে জগজ্জননীর এ সকল রূপ আছে? আমি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিতরূপে বলিতেছি মার এ সকল রূপ অবশ্য আছে। আমার হাতে মার এ সকল রূপের গঠন হয় নাই।

আমি এক ব্রহ্মের অসংখ্যরূপ ও গুণ মানি। সেই বেদ বেদান্তের বর্ণিত নিরঞ্জন নিরাকার সনাতন পরব্রহ্মকে আমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, আদ্যাশক্তি ভুবনমোহিনী, রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিয়াছি। হিমালয়ে যোগেশ্বরী, দীনের ঘরে দীনবন্ধুরূপে দেখিয়াছি। যখন স্বচক্ষে সেই জগজ্জননীর বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিলাম তখন কিরূপে সে সকল অস্বীকার করিব, কিরূপেই বা গোপন করিব? যদি তোমরা বল, লক্ষ্মী বলিলে, সরস্বতী বলিলে সাকার রূপ মনে হয়, মা বলিলেই একজন স্ত্রীলোক মনে হয়, তোমাদের যদি পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ এরূপ ভাব মনে হয় আমি কি করিব? বিরুদ্ধ দেশাচারের অনুরোধে সত্য বিনাশ করা যায় না। আমি কোন মতেই মার মূর্ত্তিসম্পর্কে সাকার ভাব আসিতে দিব না। মার অসংখ্যরূপ কিন্তু তাঁহার কোন রূপের আকার নাই। মার মুখ সহস্র প্রকার, কিন্তু সমুদয় নিরাকার। এই মন্দিরের মধ্যেই তাঁহার নানা মূর্ত্তি দেখ, এই বেদীর সমক্ষে, ঐ কাষ্ঠাসনে, ঐ সঙ্গীতস্থলে, ঐ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মার বিচিত্র রূপ দর্শন কর। ঐ মাকে যে দেখিয়াছে সে জানে তাঁহার কত রূপ। যদি তোমরা মাকে দেখ আপনা আপনি

তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির জল উথলিয়া পড়িবে, এবং সেই জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় মার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হইবে। মার অসংখ্যরূপ, অসংখ্য বর্ণ। প্রেমোন্মাদিনী মার মিনিটে মিনিটে বর্ণপরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মগণ, এই অসংখ্যরূপধারিণী মা তোমাদিগের নিকট পরীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন, তোমরা আজ ভক্তির সহিত ইঁহার বিচিত্র নিরাকার রূপ পরীক্ষা কর। মার রূপেতে ত্রিভুবন আলোকিত। মা, আজ হাসিয়া বলিতেছেন, "সন্তান, আমার মা কি তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে? আমি তোমার মা বিচিত্রবর্ণা, মানবকুল উদ্ধারের জন্য আমি বিবিধ-রূপ ধারণ করিব। আমার বিবিধ স্বরূপ আছে কি না তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ। পরীক্ষিত হইবার জন্য আমি তোমার নিকট প্রকাশিত হইতেছি, মার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখ, কত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। একই মার মুখে জ্ঞান শক্তি পুণ্য আনন্দ প্রভৃতি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। প্রতি মিনিটে আমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, তোমার চক্ষের সমক্ষে প্রতি পলকে মার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ আমি এক বর্ণা কি বিচিত্র বর্ণা। সন্তান যদি সত্য সত্যই আমার মুখের নিত্য নূতনরূপ দেখ, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইবে, আনন্দে মুগ্ধ হইবে।"

মার পরীক্ষকগণ, মার বিচার কর্ত্তৃগণ, এখন কি বল?

মার এত রূপ, এত গুণ, আজ মা কোটি রূপ ধারণ করিয়া এই উৎসবমন্দিরে আসিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরে মা তাঁহার আপনার অসংখ্য মূর্ত্তি আমাদের চক্ষের সমক্ষে বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার কোন সন্তানের যোগের বর্ণ, কাহারও ভক্তির বর্ণ, কাহারও সেবার বর্ণ, এক এক সন্তান মার এক এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। জননী তাঁহার সমুদয় শিষ্য প্রশিষ্য-দিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। মার রূপের আকর্ষণ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার চক্ষে একবার মার স্নেহের রূপ প্রতিভাত হয় সে আর উঠিতে পারে না। কে বলে, মার রূপ নাই? নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, ইহা কেবল ফাঁকি দিবার কথা। তোমরা কি মার রূপ দেখিবার জন্য এত দিন আকুল হইয়াছিলে? এত দিন জননীর বিচিত্ররূপ তোমাদের কাছে কেন প্রচ্ছন্ন ছিল? মা, তোমাদের ঘরে কেন অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না? তোমরা যে বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছ সেই এক পুরাতন জীর্ণ কল্পিত ব্রহ্মরূপ প্রত্যহ দেখিবে। তোমরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক এক মৃত মাকে গ্রহণ করিলে। কিন্তু আমার মা সেই আদ্যাশক্তি জীবন্ত শক্তি মৃত নহেন, তিনি প্রতিদিন নব নব রূপ ধরেন, এবং নবজীবন দান করেন।

সাধকগণ, তোমরা প্রতিদিন মাকে বলিতে পার, "মা, আজ আবার তোমার এ কি রূপ?" তিনি হাসিয়া বলিবেন, "আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" মা সর্ব্বদাই রূপ

পরিবর্ত্তন করিতেছেন। কেন তাহা কে বুঝিবে, কে বলিবে? এ মধুর রহস্য জননীই জানেন, আর কে বুঝিতে পারে? মা পলকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ঘুরাইয়া ভক্তকে মোহিত করিতেছেন; তিনি কেবল বসিয়া দেখিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন। এই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখাইলেন, একটু পরেই আবার শান্তমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। এই অবাত-কম্পিত দীপশিখার ন্যায় প্রশান্ত ছিলেন, এই আবার মহা-ব্যস্ত হইয়া ভক্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। এই যোগীদিগের সঙ্গে গম্ভীররূপে বসিয়াছিলেন, আবার এক মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতে নৃত্যগোপালরূপ ধরিয়া বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন। সেই গম্ভীর-প্রকৃতি যোগেশ্বর যোগিবন্ধু বালকদিগের সঙ্গে বালকবন্ধু হইয়া এমন আনন্দের বাল্যখেলা খেলিলেন যে, তদ্দর্শনে সকলে মোহিত হইয়া বলিতে লাগিল, ইনি আবার গম্ভীর হইবেন কিরূপে? মার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার বিচিত্র লীলা দেখিয়া ভক্তেরা মুগ্ধ হন এবং পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করেন। সন্তানদিগকে মাতাইবার জন্য তিনি নিরন্তর রূপান্তর হইতে-ছেন, এবং বিবিধরূপে সদাকাল নাচিতেছেন। সেই নৃত্য দেখিলে তোমাদিগের প্রাণ মন আর তোমাদের বশে থাকিবে না। আমার মা, তোমাদের মা, তোমার আমার প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে নাচিতেছেন, আনন্দময়ী আনন্দ বিস্তার করিতেছেন। প্রতিজনের দেহমন্দিরের মধ্যে তিনি নৃত্য

করিতেছেন। তাঁহার যে কোন রূপ ভক্তের নয়নগোচর হউক না কেন তাহাতে ভক্ত মোহিত ও অবাক্ হন। যখন দেখিবে তিনি মা হইয়া জীবকে স্তন্য পান করাইতেছেন. সেই মধুর মাতৃরূপের মাধুর্য্যে তোমার মন ভুলিয়া যাইবে। মার মুখ সৃষ্টির আবরণে আবৃত বটে; কিন্তু ভাবুক ভক্ত-দিগের নিকট মা সেই আবরণের ভিতর হইতে তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। মা তাঁহার ভক্ত প্রেমিকদিগকে দেখা দিবার জন্য অসংখ্য রূপ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক, মা আপনার মুখের আবরণ খুলিবেন। এই মন্দিরের কোণে তিনি বসিয়া আছেন, তোমরা তাঁহাকে অন্বেষণ কর। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার হাতে তোমার হাত ঠেকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার পুণ্যের সুমিষ্ট সৌরভ তোমার নাসিকা অনুভব করিবে ততক্ষণ খুঁজিয়া বেড়াও। তিনি এই মন্দিরেই লুকাইয়া আছেন, উপযুক্ত সাধনের পর ভক্তের মন যখন প্রস্তুত হয়, তখন তিনি তাঁহার নিকট আপনার মুখ খোলেন। সেই মুখ দেখিয়া ভক্ত স্তম্ভিত হন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং অবশেষে আবার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করেন।

হে ভক্ত, মনে করিও না তুমি মাকে দেখিলে বলিয়া সকলেই মাকে দেখিবেন। ভিড়ের মধ্যে মা তোমাকে

ইঙ্গিত করিলেন তুমি মার ক্রোড়ে উঠিলে, আবার মা ইশারা করিলেন, সঙ্কেত বুঝিয়া তুমি স্তন্য পান করিতে লাগিলে। সে মধুর ইঙ্গিত কি সকলে বুঝিতে পারে? শত শত লোকের মধ্যে দুই একজন মাকে দেখিলেন সেই দুই এক জন ছাড়া অবশিষ্ট লোকেরা যেন বলাবলি করিতে লাগিল, কৈ মা? মা তো এখানে নাই। ব্রাহ্মগণ তোমরা সকলে কেন আজ মাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর না। তিনি তোমাদের খুব নিকটে আছেন, তিনি এই মন্দিরে ঠিক তোমাদের চক্ষের সমক্ষে আছেন। ভাবের নৈকট্য হইতেছে না বলিয়া দেখিতে পাইতেছ না। একবার ভাবের ঘরে প্রবেশ কর, দেখা হইবে। ব্রাহ্ম, ক্রমাগত তিনি তোমাকে ঐ ভাবের ঘরে ডাকিতেছেন, তুমি যাও না কেন? মার নিমন্ত্রণ পাইয়া মধুময় কল্যাণকর আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া মার নিকটে যাও, সেই বিচিত্ররূপধারিণী উজ্জ্বলবর্ণ মাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক কর, তাঁহার স্নেহে বশীভূত হও। আর কেন বিলম্ব কর? এখনি দেখা সাক্ষাৎ করিয়া লও। সেই মাকে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এমন গম্ভীর আনন্দের ভিতরে পড়িবে যে মাতৃদর্শন ভিন্ন তোমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, এবং মাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র মাকে দেখিবে। তখন দেখিবে স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইয়াছে, পৃথিবী দেবলোক এক হইয়াছে, সংসার বৈকুণ্ঠ এক হইয়াছে।

যখন মার হস্ত তুমি স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার হাত মাকে ধরে নাই, কিন্তু মার হাত তোমাকে ধরিয়াছে। তুমি ধরিলে ছাড়িতে পার, স্বয়ং ব্রহ্ম ধরিয়াছেন তোমার হস্ত, তুমি আর কিছুতেই ছাড়াইয়া যাইতে পার না। মা বলিতেছেন ;—"আমার লোক অতি অল্প, আমি তোমাকে চলিয়া যাইতে দিব না।" মার মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তের মনে কত আহ্লাদ হয়। যে ভক্ত বিধাতার করতলন্যস্ত তাহার কত সুখ। শরণাগত জীব মার স্নেহশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিল। মা বলিলেন, আজ কোন মতে সন্তানকে ছাড়িব না। আজ উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, আজ ভক্তকে চলিয়া যাইতে দিব না। এই বলিতে বলিতে সন্তানের প্রতি মার অনুরাগ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া ক্রন্দনের আকার ধরিল। মার স্নেহের কথা শুনিয়া ছেলে আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন সাকার, চক্ষের জল চক্ষে দেখা যায়। ওদিকে মার গভীর ঘন প্রেমের উচ্ছ্বাস নিরাকার ক্রন্দনে পরিণত হইল। ভক্তকে পাইয়া মা অনুরক্ত, উপাসনান্তে পাছে ভক্ত চলিয়া যায় এই ভাবে উদ্বেলিত ঘনতর অনুরাগ মাকে কাঁদাইল। মার গাঢ় অনুরাগই ভক্তের পক্ষে অসহ্য ক্রন্দন। মা প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ভক্তকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন; ভক্ত বলিল "আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার আমাকে ডাকিতেছে, আমার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইবে, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি সংসারে

ফিরিয়া যাই।" মা বলিলেন, "কি বলিলে কি বলিলে সন্তান," বলিতে বলিতে মার স্নেহচক্ষু হইতে বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। আহা মরি কি সুন্দর মার প্রেমাশ্রু! ছেলে মার স্নেহ দেখিয়া বিগলিত হইল। মা এই সুযোগে ছেলের হাত দুখানি আরও দৃঢ়তার সহিত আপনার অঞ্চলে বাঁধিলেন। সন্তানকে নিজের অঞ্চলে বাঁধিয়া আপনার অনুরাগের কত ছবি কত মনোহর মূর্ত্তি, কত সুন্দর রূপ দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে মার ব্যবহারে পরাস্ত হইয়া সন্তান বলিল,—"আর ফিরে যাব না মা, এবার যে তোমার কাছে উত্তমরূপে ধরা দিলাম, আর তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। মা তোমার ভুবনমোহিনী শক্তি আছে ইহা ভাল করিয়া আজ প্রমাণ করিয়া দিলে। আজ দেখিলাম, মা, তুমি কেবল নির্লিপ্ত উদাসীন বৈরাগী ব্রহ্ম নহ, কিন্তু তুমি যথার্থই আমার মা হইয়া আমাকে তোমার স্নেহের বিচিত্র রূপ দেখাইতেছ। জননি, তুমি কাহারও কল্পনাসমুদ্ভুত নহ, তুমি সত্য সত্যই আমার জীবন্ত প্রেমময়ী মাতা। তুমি আমাকে, সত্য সত্যই ভালবাস।"

সাধে কি মাকে আমরা ভালবাসি। এমন মাকে যে দেখিয়াছে সে যে মার রূপের ছটা দেখিয়া প্রেমানন্দে পাগল হয় না এই আশ্চর্য্য। আমার মা কেমন এখন দেখিলে তো? ছাড়িবে? কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবে? কেমন, আমার

মাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইল! এমন মাকে ছাড়িয়া কি কোন সন্তান বাঁচিতে পারে? আজ ব্রহ্মমন্দির আমার মার গুণকীর্ত্তন করুক। কেবল কীর্ত্তন করিয়া যেন ক্ষান্ত না হয়, কিন্তু মাকে দেখিয়া আজ সকলে মোহিত হউন। আজ জগজ্জননী প্রত্যেক সন্তানের কাছে দাঁড়াইয়া বলুন,—"বৎস, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, নারদ, ঈশা, মুসা, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি সকল ভক্তই আমার রূপে মোহিত হইয়াছে, তুমিও আমাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর। তোমার মা কেমন সৌন্দর্য্য ও প্রতাপ-পূর্ণ দেখ। তোমার মা বিদ্যাতে সরস্বতী, ধন ধান্যে লক্ষ্মী, বলে আদ্যাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমার মার রূপে ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, তুমি মোহিত হইবে না? তোমার মার অনুরোধ কাটাইয়া তুমি মাকে ছাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।" যে মা এমন মধুর কথা বলেন বন্ধুগণ সে মা কেমন? খুব ভাল না? সকলে সেই মার হাতে ধরা দেও।

এই উৎসব মন্দিরে আজ মা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া সভা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কোটি রূপ চারিদিকে বিকীর্ণ। তাঁহাকে দেখিলে পাপ তাপ রোগ শোক সমুদয় চলিয়া যায়। মাকে দেখিয়া আজ আমরা পুণ্যবান পুণ্যবতী হইলাম। এই মন্দির সন্তাপহারিণী সুখমোক্ষ-দায়িনী মার মন্দির, এই মন্দিরে যে কেহ আসিবে মার রূপ

দেখিয়া শীতল হইবে। এখানে মা যে ভক্তকে শ্রীচরণ দিবেন তাহাকে আর ছাড়িবেন না। ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, প্রত্যেকে আজ প্রতিজ্ঞা কর এমন মাকে আর ছাড়া হইবে না। মার কোটি কোটি রূপের জালে জড়িত হইবে, চারিদিকে মার রূপ, ভিতরে বাহিরে মার রূপ, সর্ব্বত্র মার রূপ। মাকে দেখিতে দেখিতে মার সহাস্যমূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন তোমার নয়নগোচর হইবে। মার সহাস্য বদন সকল নাস্তিকতার ও অবিশ্বাসের উত্তর। মা বলিতেছেন;—"বৎস, অবিশ্বাসীরা বলে আমি নাই; কিন্তু এই দেখ আমি হাসিতেছি।" মার মুখের সুন্দর হাস্য একটি সোণার শৃঙ্খল, ভক্তকে বাঁধিলে আর ছাড়ে না। সেই হাস্য দেখিলে আর ভক্ত সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে না। তাহার সকল সন্দেহ দুঃখ পাপ চলিয়া যায়। সেই হাস্য অমৃত সরোবর, সেই অমৃত পান করিলে এ জীবনে প্রমত্ততা শেষ হইবে না। সেই হাস্যে যে মুগ্ধ হইল তাহার আর মৃত্যু নাই। মার কোটি রূপের সার রূপ এই হাস্যমূর্ত্তি। ভ্রাতৃগণ, এই সহাস্যবদনা মাকে দেখিয়া বালকের মত তাঁহার সমক্ষে খেলা কর। মার মধুর হাস্যে সমস্ত নাস্তিকতা চূর্ণ হইল। আর আমার মাকে তোমাদের পরীক্ষা করিতে হইবে না; বিচার করিতে হইবে না। মা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আমাদিগের পানে মধুর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আনন্দ বদনে হাসিয়া সমুদয় বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। আইস আমার

ভাই, মার সুন্দর বাগানে মার হাত ধরিয়া বেড়াই। মা আমাদিগকে বালক সন্ন্যাসীরূপে সাজাইয়া দিবেন। মার যেমন অনেক রূপ আমাদিগকেও তেমনি বিচিত্র সাজে সাজাইবেন। মার বশীভূত হইয়া, হে ভক্তগণ, এই পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

নৃত্য।

রবিবার ২৮এ ভাদ্র, ১৮০২ শক; ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় কথা যোগ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; অন্য কোন উপায়ে সে সকল কথা বুঝা কঠিন। যোগরূপ অঞ্জন যখন আমরা চক্ষে লেপন করি তখন চক্ষু উজ্জ্বল হয়, এবং সেই চক্ষে ধর্ম্মরাজ্যের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে যাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না যোগবিহীন অবস্থাতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। সে সকল ব্যাপারের মধ্যে নৃত্য একটি ব্যাপার। নৃত্য ধর্ম্মসঙ্গত কি না, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না, তাহা যোগ ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে এবং সকল জাতির মধ্যে নৃত্যের প্রথা প্রচলিত। অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, সাঁওতালদিগের মধ্যে যাও, দেখিবে যাহারা ঘোরতর অসভ্যতার অন্ধকারে আবৃত তাহারাও সপরিবারে

সবান্ধবে আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করে। কে সেই অসভ্য-দিগকে নৃত্য শিখাইল? কোন্ রাজা কোন্ শাস্ত্রকার, কোন্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অসভ্য জাতিকে এমন নৃত্য শিখাইল, ইতিহাস তাহা বলিতে পারে না। বাস্তবিক রাজবিধি কি ধর্ম্মবিধি মনুষ্য জাতিকে কখন নৃত্যে প্রবৃত্ত করে নাই। উহা স্বাভাবিক, উহা শিক্ষা বা শাসনের ফল নহে। মনের আনন্দ উথলিয়া উঠিলেই মানুষ নৃত্য করে। এ বিষয়ে স্বভাবই গুরু। সভ্যজাতির মধ্যেও নৃত্য প্রবর্ত্তিত। সভ্য-তম সমাজে নরনারী মহা সমারোহ করিয়া নৃত্য করে। তাহাদিগকেই বা কে নৃত্য শিখাইল? মনুষ্যপ্রকৃতি দেখিলে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় নৃত্য স্বাভাবিক। লেখা পড়া দ্বারা এ স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিনাশ করা যায় না, বরং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সভ্য দেশে নৃত্য শিখিবার বিদ্যালয় আছে, সাধনের নিয়মাদি আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম স্থানের লোকেরা যাবতীয় বড় বড় ঘটনার সঙ্গে নৃত্যের আমোদকে সংযোগ করিয়াছে। বস্তুতঃ মনুষ্যস্বভাব হইতেই এই নৃত্যের প্রথা উৎপন্ন হইয়াছে।

অনেকে নৃত্যের গূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া মনে করে বুঝি মনুষ্য বিকৃত হইলেই নাচে। তাহারা মনে করে যদি মনুষ্য প্রকৃতিস্থ থাকিত পৃথিবীতে নৃত্যের অসভ্যতা ও পাপ আসিত না। তাহারা বলে ঈশ্বর যদি আদেশ করিতেন তিনি হয় তো

বলিতেন, "মনুষ্য কদাপি নাচিও না, সাবধান।" কিন্তু যদি নৃত্য সত্য সত্যই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত হয় তবে ভক্তেরা নাচেন কেন? বিষ্ণুভক্ত, চৈতন্যভক্তেরা নাচেন কেন? সাধুগণ কেহ প্রকাশ্যে কেহ গোপনে নাচেন কেন? যদি নৃত্য বিকার হইল তবে ধার্ম্মিকেরা কেন এত উৎসাহের সহিত নাচেন। যেখানে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের শাসন, যেখানে শরীর মন বিশুদ্ধ, যেখানে মদ খাওয়া নাই, কোন প্রকার দুর্নীতি নাই, যেখানে হরিনাম মুহুর্মুহুঃ কীর্ত্তিত হয় সেখানে কেন নৃত্য? মহাযোগী মহাদেব কেন নাচিলেন? যোগের মধ্যে নৃত্য কিরূপে এবং কেন প্রবিষ্ট হইল? ভক্ত নাচেন, যোগী নাচেন, সকল শ্রেণীস্থ সাধুই নৃত্য করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই ব্রাহ্মেরা কি নৃত্যকে পাপ মনে করিয়া ঘৃণা করিবেন? যোগিগণ, ভক্তগণ, দেবগণ নৃত্য করেন, মহাদেবও নৃত্য করেন, দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, ইহার যুক্তি আছে। যদি যোগী ঋষি এবং সাধু মহাত্মাদিগের সম্পর্কে নৃত্য পবিত্র হইল তবে কিরূপে বিশ্বাস করিব যে মনুষ্যের সম্বন্ধে নৃত্য মহাপাপ?

মনুষ্যসমাজ ছাড়িয়া জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও ঈশ্বরাভিপ্রেত পবিত্র নৃত্য দেখিতে পাই। আকাশের চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদিকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা নৃত্য করে কি না? তাহারা সকলে সমস্বরে বলে;—"এই দেখ আমরা কেমন সুন্দররূপে আমাদের প্রাণেশ্বর ভুবনেশ্বরকে

প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে নিত্য নৃত্য করিতেছি।" যোগ-চক্ষে জ্ঞাননেত্রে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যাহারা মনুষ্য নহে, স্বাধীন নহে, যাহাদের কোন অবস্থাতে পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, সেই সকল জড় পদার্থও নৃত্য করিতেছে। নৃত্য করিলে ঘুরিতে হয়। দেখ আকাশের জ্যোতিশ্চক্রে সকল নৃত্য করে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পথে ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে, চন্দ্র ঘোরে, গ্রহতারা ঘোরে। যাহারা নৃত্য করে তাহারা তালে তালে নৃত্য করে। নভোমণ্ডলে তারানক্ষত্রাদিও দেখ তালে তালে ঘুরিতেছে ও নৃত্য করিতেছে। তাল কি? তালে তালে নৃত্য করা কি? ঠিক সময়ে পদনিক্ষেপ। চন্দ্র তারা সকলও ঠিক সময়ে পা ফেলিয়া ঘুরিতেছে। কৌতুকপ্রিয় লীলারসময় হরির কি সুন্দর লীলা! বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি কত আশ্চর্য্য খেলা খেলিতেছেন! দেখ আকাশরঙ্গ-ভূমিতে তিনি যতগুলি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা কেমন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে। তাহা-দিগের গতি নিয়মিত। আকাশে মনোহারিণী নারীরূপে চন্দ্র নাচিতেছে; আপনার সৌন্দর্য্য, আপনার ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না দেখাইতে দেখাইতে ঐ নর্ত্তকী দুই ঘণ্টার মধ্যে কত দূর চলিয়া গেল। বেতাল হইবে না, একবারও পদস্খলন হইবে না। চন্দ্র আপনার অসংখ্য সখীদিগের সঙ্গে চিরকাল তালে তালে নাচিয়া বেড়াইতেছে। কেন উহারা নাচিতেছে? কে তাহাদিগকে নাচিতে শিখাইল? আনন্দময়ের রাজ্যে

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের নৃত্য হইতেছে। সকলের মধ্যে থাকিয়া দেব দেব মহাদেব ঈশ্বর আপনি নাচিতেছেন, তাঁহার চারিদিকে আর সকলে নাচিতেছে। কে কতক্ষণ ও কি ভাবে নাচিবে সমস্ত ঠিক আছে। আকাশনাট্যভূমিতে ইহারা কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে ও হরিসংকীর্ত্তন করিতেছে, সহাস্য শশী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, এই আমাদের চক্ষের সমক্ষে নাচিতেছিল আবার কিয়ৎকাল পরে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া কোথায় নাচিতে গেল; আবার পর রজনীতে ফিরিয়া দেখা দিল। আমরা যে পৃথিবীতে আছি এ পৃথিবীও নাচিতেছে, কিন্তু আমরা ইহাতে বাস করিতেছি বলিয়া ইহার নৃত্য দেখিতে পাই না। প্রকাণ্ড গোলাকার লোকমণ্ডলী সকল আকাশে নাচিতেছে। আহা! কি চমৎকার নিয়মে তালে তাঁলে এ সকল ভ্রাম্যমান জগৎ শূন্যে নাচিতেছে!

আবার যখন নিকটে আসিয়া দেখি তখন নিজের শরীরের মধ্যে সুন্দর নৃত্য দেখিতে পাই। কেমন সুন্দর তালে তালে আমার শরীরের মধ্যে রক্ত নাচিতেছে! শরীর, তোমার ভিতরে দিন রাত্রি কেমন আশ্চর্য্য নৃত্য হইতেছে! যে সময়ে রক্ত সৃজন হইল সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া রক্ত শরীরের ভিতর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। কেবল যে রক্ত নাচিতেছে তাহা নাহে, আবার উহা ঠিক তালে তালে নাচিতেছে। যদি শরীরের একটু জ্বরবিকার হয়

অমনি রক্তের তালভঙ্গ হয়। চিকিৎসকেরা ঘড়ী ধরিয়া রক্তের তাল শ্রবণ করে, এবং বেতাল রক্ত সঞ্চালন দেখিলেই রোগ সিদ্ধান্ত করে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে নিশ্চয়ই দেহমধ্যে রক্ত, ঠিক মিনিটে মিনিটে চলে, কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় না। যোগীর রক্ত, ভক্তের রক্ত, সেবকের রক্ত নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মপদ প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে রক্ত, তুমি হরিভক্ত, তুমি হরিনাম গান করিতে করিতে নৃত্য কর, তোমাকে নমস্কার করি। রক্ত, তুমি ব্রহ্মের প্রেমানুরঞ্জিত শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া লাল হইয়াছ। হে রক্ত, তুমিই আমার প্রাণ বল, উদ্যম, সুস্থতা, সৌন্দর্য্য সকলি। যতক্ষণ তুমি আমার শরীরের মধ্যে নাচিতে থাক ততক্ষণই আমার জীবন। তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার আশা ভরসা, তোমার নৃত্য বন্ধ হইলেই আমার মৃত্যু। যে দিন তোমার নাচ বেতাল হয়, সেই দিন ভয়ানক রোগ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। যত দিন তুমি আনন্দে নৃত্য কর, তত দিন আমি সুখ স্বচ্ছন্দতা, আনন্দ সুস্থতা সম্ভোগ করি। রক্ত, কি চমৎকার তোমার নৃত্য! তোমার নৃত্য ভক্তির নৃত্য যখন তোমার ভিতরে ব্রহ্মোন্মত্ততা প্রবেশ করে, তখন তোমার নৃত্য প্রগল্‌ভা ভক্তির নৃত্য ও মহোল্লাসের নৃত্য হয়। তুমি ব্রহ্মের হস্তে উৎপন্ন, ব্রহ্মচরণে প্রণত।

হে ব্রাহ্ম তুমি যদি প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতে চাও তবে রক্তের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিয়া নৃত্য কর! রক্তের নৃত্য

মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বিধাতা যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, রক্ত ঠিক সেই নিয়ম অনুসারে নৃত্য করে। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে রক্ত নাচিতেছে। কেহ দেখে না, কেহ তাহার প্রতি মনোযোগ করে না, তথাপি উহা অহর্নিশি আপনার আনন্দে নাচিতেছে। রক্তের নাচ গান কেবল হরিই গোপনে বসিয়া দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। নৃত্য আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ। মনে প্রবল আনন্দ হইলেই মানুষ নৃত্য করে। যখনই কোন বাদ্যযন্ত্রে নৃত্যের বাজনা বাজে তখনই শরীরের অস্থি মাংস সমুদায় নাচিয়া উঠে। সেই বাদ্যে তোমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে, শরীরের সঙ্গে উহার এমনি নিগূঢ় যোগ। বেহালা হউক, পিয়ানো হউক, বীণা হউক, মৃদঙ্গ হউক, যে কোন সুমধুর যন্ত্র হউক, উহার শব্দ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। একজন যন্ত্র বাজাইতেছে তাহার বাদ্য শুনিয়া শত শত লোকের শরীর মন নাচিয়া উঠিল। বাদ্যযন্ত্র যেন সাঙ্কেতিক ভাষায় বলে ;—"এস, কে নাচিবে এস। আয় না ভাই নাচি।" পথিমধ্যে কোন দুঃখী বৈষ্ণব মধুর মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, আমি উপরের ঘরে বসিয়া বাদ্য শুনিলাম, তৎক্ষণাৎ মন নাচিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, আমি বড় মানুষের সন্তান, বৈষ্ণবের বাজনা শুনিয়া আমি নাচিব ? যেখানে যন্ত্র বাজিতেছিল সে স্থানে আমি গেলাম না ; কিন্তু যতক্ষণ আমি উপরে বসিয়া

রহিলাম ততক্ষণ আমার প্রাণ নাচিতে লাগিল। আমি অপবাদভয়ে, সম্মান লাঘবের ভয়ে সে মৃদঙ্গের দিকেও গেলাম না, কিন্তু মন, তুমি লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যের ন্যায় নাচিলে? বাহিরে আমি নৃত্য সংবরণ করিলাম, কিন্তু ভিতরে তুমি নির্লজ্জ হইয়া নাচিলে।

এই যে নৃত্য করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বক্তৃতা দ্বারা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা সকলেই ইহা বুঝিতে পারিতেছ। সমস্ত সৃষ্টি নাচে, স্বয়ং ভগবান নাচেন। কেবল কাপুরুষ নাচে না। যে না নৃত্য করে সে দুঃখীদিগের মধ্যে অত্যন্ত দুঃখী ও হীন। যে হাতে চাঁদের সৃষ্টি, যিনি চাঁদকে নাচান, তুমি তাঁহার হাতে নাচিবে না? ঈশ্বর নিজে নাচেন, তাঁহার সমুদায় সৃষ্টি নাচে, আর অধম মনুষ্য, তুমি নাচকে নীচ মনে করিবে? ঈশ্বরের এক নাম নৃত্যগোপাল, অর্থাৎ তিনি বালকের ন্যায় নৃত্য করেন। বৃদ্ধ নাচে না, বালক নাচে; বালককে একটি সন্দেশ দিলাম, সে সন্দেশটি পাইয়া নাচিতে লাগিল। প্রিয় বালক, তোকে সন্দেশ দিলাম, তুই সন্দেশটি মুখে না দিয়া সহাস্য বদনে নাচিস্ কেন? আর একটি সন্দেশ দিলাম, বালক মাথায় হাত দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যত উল্লাস ততই দেখি নৃত্যের উৎসাহ। পবিত্র নৃত্য কখন আরম্ভ হয়? যখন সাধক বালকপ্রকৃতি ধারণ করে। কুটিল বুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধি বৃদ্ধেরা নৃত্য করিতে পারে না,

চায় না। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার অবস্থায় কেহ নাচিতে পারে না। যে দিন দুঃখে যায় সে দিন কেহ নাচে না। রোগ শোক বন্ধুবিয়োগ ধনহানি, ঘোর বিপদ বা বিষাদের অবস্থায় কেহ নাচে না। কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইলে মানুষ নাচে না, নৃত্যসমাজে যায় না। আনন্দ ভিন্ন অন্য অবস্থাতে নৃত্য হয় না। শিশু যখন কাঁদে তখন নাচে না। যার মন বিষণ্ন, মুখ বিরস, তার পা কদাপি নাচিবে না। সংসারে যেমন ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ, সুখোদয় হইলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। যাই ঘরে আনন্দ আসিল, যখনই ভক্ত হরির দর্শন পাইল, যখনই উপাসকের উপাসনা ভাল হইল, তখনই সে আনন্দে নৃত্য করিল। যখন অনুশোচনার বিষে মন জর্জ্জরিত, যখন পাপ ব্যাধিতে হৃদয় সন্তপ্ত, তখন মানুষ নাচিবে কিরূপে? নাচ কখন্ সম্ভব? আনন্দের সময়, সন্দেশ পাইবার সময়। যখন হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গের কোন মধুর যন্ত্রধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মন আপনাকে আপনি বলে; "আয় না ভাই ঐ স্বর্গীয় বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নাচি। কোন্ গুপ্ত নারদ বীণা বাজাইয়া আমার মন ভুলাইল? কে আমাকে নাচিতে ডাকিল?"

সৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া এক গুপ্ত বাদ্যকর মধুর বীণা বাজাইতেছেন, সেই বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে সমস্ত সৃষ্টি নাচিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ জ্যোতিষ্ক আকাশ পথে নাচে। তাহার সঙ্গে পৃথিবী নাচে, এবং পৃথিবীর সকল বস্তু নাচে।

স্রোতস্বতী নদী সকল পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া মিশিতেছে। সাগর মহাসাগরবক্ষে তরঙ্গরাজি মহা আস্ফালন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। গাছে পাখী আনন্দে নাচে, জলে মাছ উল্লাসে নাচে। বায়ু নাচে তার সঙ্গে বৃক্ষের লতা পল্লব সকল নাচে। সুমন্দ সমীরহিল্লোলে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সুশোভন ধান্যশীর্ষক সকল কেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচে। গাছে নানা বর্ণের ফল ফুল বায়ু সহকারে এদিক ওদিক দুলিয়া নৃত্য করে। গোমেষাদি প্রহৃষ্ট মনে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়। আকাশে দলে দলে বিহঙ্গগণ নৃত্য করিতে করিতে উড়িয়া বেড়ায়। সমস্ত প্রকৃতি নাচিতেছে. আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত জীব নাচিতেছে। যাহারা রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ, যাহারা কুটিল বিষয় বুদ্ধিতে বিকৃত, তাহারাই নাচে না। অতএব হে ভক্ত, যদি তুমি তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে এক আত্মা এক প্রাণ হইয়া থাকিতে চাও তবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তালে তালে নৃত্য কর। চাঁদের সঙ্গে, বৃষ্টির ধারার সঙ্গে, সমুদ্রের হুঙ্কারের সঙ্গে, বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে, রক্তের গতির সঙ্গে, তালে তালে নৃত্য কর। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্ত নৃত্য করেন তাঁহাকে আর দুঃখ বিকারে অভিভুত করিতে পারে না। জননীর নাম করিতে করিতে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করেন। নৃত্য না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন

না। ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই নৃত্য করিতেছেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার আনন্দে আপনি নৃত্য করিতেছেন। স্বয়ং ভগবানের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্ত-দিগের হৃদয়েও আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যাঁহার পা নাই তিনি নাচিবেন কিরূপে? যাঁহার পা নাই যিনি অনন্ত নিরাকার আনন্দস্বরূপ তিনিই নাচিতে পারেন। পা কি নাচে? মনই নাচে, শরীর কখন নাচে না। যথার্থ নৃত্য অন্তরে, বাহিরে উহার প্রকাশ মাত্র। কেবল পদসঞ্চালন করিলেই কি নৃত্য হয়? হৃদয়ের উল্লাসই প্রকৃত নৃত্য। বাস্তবিক ঘনীভূত আনন্দই নৃত্য। ইহা নিরাকার। বাহিরের চক্ষে উহা দেখা যায় না। যিনি চিদানন্দ, যিনি সুখস্বরূপ তিনি অনন্ত নৃত্য। তাঁহার নাচই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আদর্শ নৃত্য। তিনি আপনাতে আপনি নাচেন। নিত্যানন্দই নৃত্যানন্দ। নিত্যহরিই নৃত্যহরি। আনন্দময়ী মধ্যে নৃত্য করেন, আর চারিদিকে বিশ্বসংসার নাচিতেছে, তিনি স্বয়ং সকলকে নাচাইতেছেন, তাই সকলে নাচিতেছে। আনন্দময়ীর ভক্ত সন্তানগণ না নাচিয়া থাকিতে পারেন না। যখনই হৃদয়ে যোগানন্দরস উথলিয়া উঠে তখনই প্রাণের মধ্যে ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ হয়। সে অনিবার্য্য দুর্জ্জয় নৃত্য কি কেহ সংবরণ করিতে পারে? যখন মন নাচে, তখন শিরা স্নায়ু অস্থি মাংস সমুদায় নাচে, মাথার প্রত্যেক

চুল নাচে। ভক্তের মনের সঙ্গে তাঁহার শরীর মন এবং সমস্ত প্রকৃতি তালে তালে নাচিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির এক সুর, এক তান এবং সকলে এক তালে পা ফেলিতেছে। যখন এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে ভক্তের প্রাণ এক হইয়া যায়, তখন ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গে এক হৃদয় ও এক তান হইয়া ভক্তেরা নৃত্য করেন। তখন দেবলোক, নরলোক, স্বর্গ মর্ত্য এক মনে হয়।

বাস্তবিক সৃষ্টি এক প্রকাণ্ড অবিশ্রাম নৃত্যের ব্যাপার। এই অনন্ত কালের নৃত্যের সঙ্গে আমরা যোগ দিতে চাই। যে দিন আমরা এই নৃত্যে যোগ দিতে পারিব সে দিন আমরা পুণ্য ও আনন্দের নব জীবন লাভ করিব। যখন পুণ্যাত্মা ভক্তেরা বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রহ্মের চারিদিকে নৃত্য করিবেন, তখন বুঝিব পৃথিবী স্বর্গধাম হইতেছে। বন্ধুগণ, আকাশে চন্দ্র তারকা সকল নাচে, ভূতলে জীব জন্তু কীট পতঙ্গ নাচে, মহানন্দে বালক বালিকা নাচে, ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া, হরি হরি বলিয়া তোমাদিগের প্রাণশিশুও নাচিতে আরম্ভ করুক। যোগ ভক্তি একত্র করিয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়া খুব উৎসাহের সহিত মহাযোগী মহাদেবের ন্যায় প্রমত্ত তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া ধরাধাম কাঁপাইয়া দেও। স্বর্গের সমস্ত যোগী ঋষি বঙ্গদেশে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে নৃত্য করুন। হরিগুণ গান করিতে করিতে তোমাদিগের হৃদয়রূপ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে

সকলে আসিয়া নৃত্য করুন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এইরূপ পবিত্র নৃত্য করিতে করিতে আমরা জীবন শেষ করিতে পারি।

লজ্জারূপিণী।

রবিবার ২১এ ভাদ্র, ১৮০২ শক; ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

ঈশ্বরের সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তিন ভাগে বিভাগ করা যায়; যথা রাজপথ, রাজভবন এবং অন্তঃপুর। এই তিন বিভাগই অতুল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রশস্ত রাজপথে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও মহিমা। কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ পথে আলোক দিতেছে। অকূল জলপথ দেখ। কত সমুদ্র মহাসমুদ্র আস্ফালন করিতেছে, এবং তন্মধ্যে অসংখ্য জীব ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিকে দেখ কত জাতীয় বৃক্ষ লতা পথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত তুষারাবৃত পর্ব্বত স্থির অটলভাবে সেই মহাদেব মহেশ্বরের যশ ঘোষণা করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শত্রুদিগকে কম্পিত করিতেছে। সেই রাজাজ্ঞাতে কত নদ নদী চলিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, কত ফল পাকিতেছে, কত বিচিত্র বর্ণের পাখী গান করিতেছে। রাজপথে মহারাজের সৃষ্টিকৌশল এবং অপার মহিমা বিস্তৃত রহিয়াছে। পণ্ডিত মূর্খ সকলেই এই সৃষ্টির মধ্যে

বিশ্বরাজের বিজ্ঞানকৌশল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়। কেহ কেহ এত চমৎকৃত হয় যে কোন কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা জ্ঞানে পূজা করে। তাহারা নদ নদী সাগর পর্ব্বত এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করে, এবং প্রকৃতিকে প্রকৃতির দেবী জ্ঞানে অর্চ্চনা করে।

পথিক রাজপথে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে মনে করিল রাজপথে রাজার এত বিভব শ্রী সম্পত্তি দেখিলাম; কিন্তু এখনও রাজভবনে প্রবেশ করি নাই। যখন কৌতূহলাবিষ্ট পথিক রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজসদনে প্রবেশ করিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে প্রিয়দর্শন সহাস্যবদন প্রশান্তমূর্ত্তি রাজকুমারবৃন্দ দেখিতে পাইল। রাজভবনের বহির্বিভাগে রাজকুমারদিগের ঘর। কি মনোহর শ্রী! কি আশ্চর্য্য শোভা! প্রত্যেক রাজকুমার আপন আপন গুণে ভূষিত হইয়া বিচিত্র স্বর্গীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথিক মনে মনে বলিতে লাগিল,— "আহা মরি ঠিক যেন দেবসভা! ব্রহ্মসন্তান সাধুরাজকুমারদিগের কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য! এক একজন এক এক দেব ভাবে শোভান্বিত। ঐ রাজপুত্রের কেমন বৈরাগ্য! ইহাঁর কেমন অচলা পিতৃভক্তি! ইহাঁর কেমন দুর্জ্জয় বিশ্বাস! উহাঁর কেমন প্রেমোন্মত্ততা! উহাঁর কেমন গভীর যোগানন্দ! রাজপুত্রদিগের বিবিধ গুণ ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথিকদল, ভক্তমণ্ডলী মোহিত হইল। বিশেষ

বিশেষ সাধুর রূপ গুণ দেখিতে দেখিতে কতকগুলি লোক এত দূর মুগ্ধ হইল যে তাহাদের ভ্রম হইল তাহারা পিতা পুত্রকে এক মনে করিল, রাজপুত্রকে রাজা মনে করিল। তাহাদিগের এই ভ্রমহেতু পৃথিবীতে পিতার পরিবর্ত্তে পুত্রের, রাজার পরিবর্ত্তে রাজপুত্রের পূজা অর্চ্চনা প্রবর্ত্তিত হইল। এক প্রকার পৌত্তলিকতা বস্তুপূজা, দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতা সাধুপূজা। এক পৌত্তলিকতা রাজপথে, অন্য পৌত্তলিকতা কুমারভবনে।

পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের ভবনে রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত হইল। পরিশেষে অন্তঃপুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এবং তাঁহার সাধু সন্তান-দিগের মধ্যে পথিক ঈশ্বরতত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য সে আকুল হইল। তিনি কোথায়? অন্তঃপুরে। ব্রহ্মপিপাসু পথিক সেই নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিবার জন্য স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইল। কার্য্য দেখিয়া অথবা সন্তান দেখিয়া ব্রহ্মনিকারণে কি মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে? পরোক্ষ জ্ঞান হইল, এখন সাক্ষাৎ তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাঁহার কেমন রূপ? যাঁহার সন্তান সকল দেখিতে এমন সুন্দর তিনি নিজে কেমন? এ সকল প্রশ্ন পথিকের মনে উদিত হইল। সৃষ্ট বস্তুতে ও পুত্রেতে কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের জ্ঞান, বল, প্রেম উপলব্ধি হইল,

কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে কিরূপে দেখিব? এই চিন্তায় ভক্ত পথিকের প্রাণ আকুল হইল। যেখানে ঈশ্বর লুকাইয়া আছেন ভক্ত সেই অন্তঃপুরে যাইবার সঙ্কল্প করিল। পথিক রাজপথে এবং রাজপুত্রদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তঃপুরে রাজ্যেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিতে চলিল। মাতৃদর্শন করিবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইল। ভক্ত ভাবুকের একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি তাঁহার আপনার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আলাপ করেন। ধর্ম্মপথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে ভুলিয়া যায়, এবং পুত্রদর্শনে মাকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু যথার্থ ভক্ত রাজপথ ও রাজভবনের বহিঃপ্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সাক্ষাৎ জননীকে দেখিবার জন্য সৃষ্টির তৃতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভাগে অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। ভক্ত বলিলেন ঈশা, মুসা, সক্রেটিস, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, নারদ চৈতন্য নানক প্রভৃতি সাধুগণ বসিয়া আছেন দেখিলাম; কিন্তু আমার মা কোথায়? মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে মধুর ধ্বনি শুনা গেল; "যদি মাকে দেখিবে তবে অন্তঃপুরে অন্বেষণ কর।" দূর হইতে সুমধুর স্বর শুনিয়া মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের প্রাণ আরও আকুল হইল। যে স্থান হইতে সেই মধুর ধ্বনি আসিল কোথায় সেই অন্তঃপুর? ভক্তের

প্রাণে ব্যাকুলতাসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার খুলিল।

সাধক মনে করিলেন এবার বুঝি ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে আসিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে দেখিলেন ঈশ্বর অবগুণ্ঠনে আবৃত, কিছুতেই দেখা দেন না। ঈশ্বরের মুখ যে শ্রী ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ তাহা প্রকাশিত হইল না। যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না তরল মেঘের ভিতর দিয়া অল্প অল্প প্রকাশ হয় সেইরূপ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্যোতি অল্প পরিমাণে প্রকাশিত হইল; কিন্তু স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে দেখা গেল না। সুতরাং ভক্তের ব্রহ্মদর্শনস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল না। তিনি ক্রমাগত সাধন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমুখের আবরণ তিনি সরাইতে চেষ্টা করিলেন। বাস্তবিক ঈশ্বর অত্যন্ত লজ্জাশীল ও গোপনপ্রিয়। তিনি আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সমুদায় বস্তু আবরণরূপে সৃজন করিয়াছেন। সূর্য্য এত উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছে, চন্দ্র এমন মনোহর জ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু যে মা এ দুই জ্যোতিষ্ক সৃজন করিয়া জগৎ আলোকিত করিলেন, তিনি আপনি আপনার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রের জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু সমুদ্রের জল কখনও তো চন্দ্রের চন্দ্রকে প্রতিভাত করিতে পারিল না। গোলাপ ফুল আপনার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লোকের মন হরণ করে; কিন্তু যে প্রেমময়ীর হস্তে গোলাপ রচিত সেই প্রেমময়ী

মাতাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু একত্র হইলেও সেই আদিকারণ আদিজ্যোতিকে প্রকাশ করিতে পারে না।

এই সৃষ্টি ব্রহ্মের পরিধেয় বস্ত্র ও আবরণ। জগদীশ্বর এই সৃষ্টির আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সহজে সৃষ্টির ক্রিয়া সকল দেখিতে পায়, অনেক সময় সৃষ্টির ঘটনাপুঞ্জের কার্য্যকারণ অবধারণ করে। যেমন বৃষ্টির কারণ মেঘ, মেঘের কারণ বাষ্প, বাষ্পের কারণ জল এবং সূর্য্যের উত্তাপ ইত্যাদি; কিন্তু অবিশ্বাসী অভক্ত মানুষ আদিকারণ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বাহিরের কারণ সকল দেখিল, কিন্তু ভিতরের গূঢ় আদিকারণ দেখিতে পাইল না। কেবল অন্ধকার যে বিশ্বস্রষ্টাকে আবরণ করে তাহা নহে, আলোক অন্ধকার দুইই মার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মার মুখ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সৃষ্টির তাবৎ বস্তু যেন শিক্ষিত ও অনুরুদ্ধ। মা লজ্জাশীলা হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। অন্তঃপুর ভিন্ন জননী আর কোথাও থাকিতে পারেন না। যেখানে নির্জ্জনতা, যেখানে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা, যেখানে গভীর অন্ধকার সেইখানেই বিশ্বজননী। গোপনে অন্ধকারে লজ্জারূপিণী জগজ্জননী বাস করেন। তিনি তো নিশ্চয় সকল স্থানেই আছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু হে যোগী, বৈরাগী, প্রেমিক, তোমরা তাঁহাকে সকল স্থানে দেখাও দেখি। মা আপনার

লজ্জা বিনয়েতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। সত্য শিবসুন্দর ব্রহ্ম সৃষ্টি আবরণের ভিতরে আপনাকে অপ্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন।

যাহার অধিক গুণ সে আপনাকে ঢাকে; যে নিগুর্ণ সে ঢাক বাজাইয়া বেড়ায়। যাহার ভিতরে পদার্থ অল্প, সেই বাহিরে অধিক আড়ম্বর করে, এবং খুব বক্তৃতা করিয়া ধূমধাম করিয়া বেড়ায়। জগজ্জননীর অনন্ত শক্তি অনন্ত গুণ, কিন্তু দেখ তাঁহার এত লজ্জা যে তাঁহার চারিদিকে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইতেছে, কোটি কোটি লোক চীৎকার রবে স্তব স্তুতি করিতেছে; কিন্তু জননীর মুখে একটি কথা নাই, যেন তিনি বিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। হে অল্পবিশ্বাসী, তুমি কি মনে কর মা সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনেন না, এবং তাহাদের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন না। মা তাঁহার অন্তঃপুরে লুক্কায়িত বটে, কিন্তু সেখানে থাকিয়া সন্তানদিগের সকল কথা শুনিতেছেন, এবং যাহা যাহা আবশ্যক তাহা বিধান করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নিয়ম জীবের অভাব মোচন করিতেছে, নিজে লুকাইয়া বসিয়া আছেন। সর্ব্বরাজ্যেশ্বরী-জননী প্রত্যহ নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সন্তানদিগের ঘরে আসিয়া সমুদায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কথা কহিলেন না, গোল করিলেন না, তাঁহার কোন আড়ম্বর নাই, কিন্তু

সকল হিতকর কার্য্যই তিনি করিতেছেন। মা গোপনে কার্য্য করেন। নির্লজ্জ অহঙ্কারী পুরুষদিগের ন্যায় তিনি আড়ম্বর ভালবাসেন না। মা এমনি ভাবে কাজ করেন যেন তিনি কিছুই করেন না। মানুষকে তিনি সকল শুভ কর্ম্মের সুখ্যাতি লইতে দেন, আপনি লুকাইয়া থাকিয়া মনুষ্যকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজে গৌরব আকাঙ্ক্ষা করেন না। মা সন্তানদিগকে বলেন ;—"তোমরা সুখ্যাতি লও, মা সুখ্যাতি চান না।"

মা লজ্জায় মাথা ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তিনি সমুদয় কুলবধূর দৃষ্টান্ত, তিনি তাঁহার অন্তঃপুরের বাহিরে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। মা কি যাকে তাকে দেখা দেন! স্ত্রীস্বরূপা জগন্মাতা কি রাস্তার লোকদের নিকট প্রকাশিত হন? মার নামে নির্লজ্জতার কলঙ্ক আরোপ করে এমন পাষণ্ড কে আছে? নাস্তিক পাষণ্ডদিগের নাস্তিকতা দম্ভ এবং পরিহাসও মাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনিতে পারে না। মার এমন উজ্জ্বল রূপ আছে যাহা প্রকাশ হইলে পৃথিবীতে একজনও নাস্তিক থাকিতে পারে না। যদি মা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এত সন্দেহ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা থাকিত? মার অসংখ্য রূপ গুণ আছে, কিন্তু কয় জন লোক মাকে দেখিতে পায়? এত সৌন্দর্য্য, কিন্তু কেবল অন্তঃপুরই তাহা দেখিল। এত শ্রী, কিন্তু জননী তাহা গুপ্ত রাখিলেন।

সুনীল আকাশ মার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হে শূন্য, তোমাতে তো কিছু নাই, তুমি কেন ব্যবধান হইয়া ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করিতেছ? বস্তু তাঁহাকে ঢাকিল, শূন্যও তাঁহাকে ঢাকিল? কি আশ্চর্য্য! মা আকাশরূপ নীলাম্বর সুনীল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মা এমনি লজ্জাশীলা যে পথের কোলাহলমধ্যে তাঁহার কথা তো কেহই শুনিতে পায় না, অন্তঃপুরেও যখন তিনি কথা কহেন, অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ করেন। সর্ব্বসাধারণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করে না। অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহার গুপ্ত রহস্য শুনিবার অধিকারী। নিভৃত অন্তঃপুরে যোগগৃহে তিনি কেবল অনুরক্ত ভক্তের সহিত চুপি চুপি কথা কহেন। মা ভক্তের কাছে এমনি নিঃশব্দে আসেন যে চারিদিকে হাজার লোক থাকিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না যে মা আসিয়াছেন। ভক্তের ঘরে মা যে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতেও কোন শব্দাড়ম্বর নাই।

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছেন। এদিকে নাস্তিকেরা অহঙ্কার করিতেছে, পাষণ্ডেরা আস্ফালন করিতেছে, তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে ও তাঁহার প্রাপ্য গৌরব তাঁহাকে না দিয়া আপনারা ভাগ করিয়া লইতেছে। কিন্তু লজ্জাবতী জননী একটী কথা বলিয়াও প্রতিবাদ করেন না। সকলেই পরিশ্রমের পুরস্কার, সুখ্যাতি

ও বেতন গ্রহণ করিল, মা কিছুই পাইলেন না। কর্ত্তা কর্ত্রী দাসী সকলেই সুখ্যাতি গ্রহণ করিল, মা লক্ষ্মী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিলেন, মনে মনে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য!" হে ভক্ত, তুমি যে অন্ন আহার করিলে, কে ঐ অন্ন প্রস্তুত করিল? সকলই মা লক্ষ্মী করিলেন, কিন্তু কেহ মাকে রন্ধন করিতে দেখিল না, কেহ মার শব্দ শুনিল না। লক্ষ্মীর সংসারে স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পাইল, কে তাহাদিগকে অলঙ্কার শ্রী সৌন্দর্য্য দিলেন? স্বয়ং লক্ষ্মী সমুদায় দিলেন; কিন্তু সুখ্যাতি পাইলেন না। লোকে বলে গোলাপের কি চমৎকার সৌন্দর্য্য! চন্দ্র কেমন মনোহর! কিন্তু পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভিতরে যে অন্তঃপুর আছে তন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রচয়িত্রী এবং চন্দ্রের নির্ম্মাতাকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়।

হে ব্রাহ্ম, তুমিও যদি অন্য লোকের ন্যায় বাহিরে বেড়াও, তুমিও যদি অন্তঃপুরে গিয়া ভক্তবৎসলা মাকে না দর্শন কর তবে কে মাকে দেখিবে? মা অন্তঃপুরে থাকিয়া আপনার রূপ ও সৌন্দর্য্য সেখানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যোগবলে সেই গুপ্ত রূপ দেখিতে হইবে। সেই অন্তঃপুরে গিয়া যাঁহারা মার রূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া কিরূপ পুলকে পূর্ণ হইয়া ভুবনমোহিনী জগজ্জননী বিরলে বসিয়া হাসিতেছেন! একবার সেখানে গিয়া যে মার মুখের মধুর

হাস্য দেখিতে পায় সে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পদার-বিন্দে পড়িয়া থাকে। মার রূপ গুণের কথা বলিও না। যত রূপ তত লজ্জা; যত গুণ তত বিনয়। পৃথিবীর নর নারীর একটু রূপ থাকিলে তিলার্দ্ধ গুণ থাকিলে কত দেখায়! কি অহঙ্কার! ধিক্ নির্লজ্জ পুরুষ, ধিক্ লজ্জাহীনা নারী! পৃথিবীর মহিলাগণ, তোমরা মার নিকট লজ্জা ও বিনয় শিক্ষা কর। আত্মসংগোপন তোমাদের জননীর ধর্ম্ম—বিদ্যা ও রূপ প্রকাশ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ও রুচি নাই। তোমরা তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা হও। তাঁহার এত লজ্জা, তিনি কদাপি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারেন না, দৌড়া দৌড়ি করিয়া প্রকাশ্য স্থানে আসিতে পারেন না। সজন নগরে, কোলাহলপূর্ণ পথে মা কখন দেখা দেন না, তিনি কখন অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহার লজ্জা তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দেয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতরে, অন্তরের অন্তরে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন।

মার হস্তের রচিত রসনা মাকে গোপন করে। রসনাকে এত অনুরোধ করি মার সুন্দর রূপের কথা বল, সে কিছুতেই বলিবে না। সে বলে, মা বারণ করিয়াছেন; অন্তঃপুরের নিগূঢ় রহস্য আমি কখনই প্রকাশ করিব না। রসনা বাহিরের সকল কথাই আহ্লাদের সহিত বলে, কিন্তু অন্তঃপুরের কথা, গুপ্ত যোগানন্দের তত্ত্ব কিছুতেই বলিতে চায় না। গূঢ়

হরিরূপের কথা, হরিগুণের কথা বাস্তবিক অনির্ব্বচনীয়। যদিও হরির রূপ দেখিয়া মন কখন কখন মুগ্ধ হয়, পৃথিবীর অভিধানে এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা সেই রূপ ব্যাখ্যা করা যায়! হরিরূপের কথা ভক্তেরা বলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না, চক্ষু কেবল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে। অতএব যদি সুখী হইতে চাও সেই লজ্জারূপিণী মা জগদ্ধাত্রীকে বিশ্বের অন্তঃপুরে মনের অভ্যন্তরে অন্বেষণ কর। হে ব্রাহ্ম যাত্রিগণ, কেবল বাহিরে বিচরণ করিও না, কেবল রাজপথে বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং ভক্তদিগের ভবনে সাধুচরিত্র-শোভা দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না; কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া সেই আদ্যাশক্তি সেই হ্রীস্বরূপা জগজ্জননীকে দর্শন কর। তিনি তোমাদের জীবনের অন্তঃপুরে, তোমাদের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে বসিয়া আছেন। ভক্তির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে প্রণত হও। মা বলিবেন;—ধন্য ধন্য সন্তান, অন্তঃপুরে মার দর্শন পাইলে।

ঈশা ও চৈতন্যের গূঢ় যোগ।

রবিবার ৪ঠা আশ্বিন, ১৮০২ শক; ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

লোকে বলে যে মহর্ষি ঈশার সঙ্গে ভক্তোত্তম শ্রীচৈতন্যের ঘোরতর বিবাদ। এই বিবাদের আশু মীমাংসা কর্ত্তব্য। সাধারণ লোকের এই সংস্কার, শ্রীচৈতন্যের একটি উপদেশ

মহর্ষি ঈশার উপদেশের বিরুদ্ধ। দুইজনের দুই বিধি। অর্থাৎ যে বিষয়ে একজনের বিধি সেই বিষয়ে অপরের স্পষ্ট নিষেধ। এই দুয়ের মধ্যে কোনটি সত্য পৃথিবী তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল। পৃথিবী মহামতি ঈশার নিষেধ মানিবে, না শ্রীগৌরাঙ্গের বিধি পালন করিবে? একজনকে আদর করিলে যদি অন্যের প্রতি অবজ্ঞা হয়, একজনকে গ্রহণ করিলে যদি অন্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, এই ভয়ে পৃথিবী আকুল। বিষম সঙ্কট। বুদ্ধি যদি একের ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া অন্যের ধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে বুদ্ধির অপরাধ হইবে। নববিধান বলিতেছেন দুইয়েরই মান্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় দুইয়ের সম্মিলন পৃথিবী তাহা জানে না। পৃথিবী মনে করে, ঈশা এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে এ বিষয়ে চিরবিবাদ থাকিবে। কি বিষয়ে এই দুইজনের বিরোধ? ঈশ্বরের নাম গ্রহণ সম্পর্কে।

ঈশা বলেন "বৃথা অনেকবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণসম্পর্কে বহুভাষী হইবে না, নিরর্থক ঈশ্বরের নামের পুনরুক্তি করিবে না, সংক্ষেপে ঈশ্বরের নাম লইবে। বিশ্বাস ভক্তির সহিত একবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। ঈশ্বরের কাছে অল্প কথাতে প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বরের নামসম্পর্কে বহুভাষা, পুনরুক্তি ত্যাগ করিবে। পুনরুক্তি দোষ ও নামাপরাধ হইতে রসনা এবং হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে চিরকাল দূরে রাখিবে।" পক্ষান্তরে

শ্রীচৈতন্য বলেন, "অবিশ্রান্ত হরিনাম সাধন করিবে, হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্ত হইবে, যতবার পার হরিনাম করিতে করিতে প্রাণকে আনন্দিত করিবে। হরিনামে ক্রমশঃ পুণ্যবৃদ্ধি শান্তিবৃদ্ধি এবং অবশেষে আনন্দোচ্ছ্বাস হইবে।" এই দুই উপদেশ আপাততঃ পরস্পর এত দূর বিপরীত বোধ হয় যেমন উত্তর ও দক্ষিণ। তবে কি প্রাণের ঈশা এবং প্রাণের গৌরাঙ্গের সঙ্গে বন্ধুতা ও ঐক্য নাই? তাঁহারা দুইজন কি পরস্পরের বিরোধী? শ্রীচৈতন্যের উপদেশ কি মহর্ষি ঈশার কথার প্রতিবাদ? দুইজন যদি পৃথিবীতে এক সময়ে আসিতেন, তাঁহারা কি পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতেন, না পরস্পরের মধ্যে গূঢ় সম্মিলন দেখাইতেন? নববিধান তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রাণগত গূঢ় যোগ দেখিতে পাইয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে নববিধানের বিচার নিষ্পত্তি জগতে ঘোষণা করা নিতান্ত আবশ্যক।

কোন টোলের পণ্ডিত কিংবা কোন বিজ্ঞানবিদ্ যাহার মীমাংসা করিতে পারেন না, নববিধান তাহার মীমাংসা করেন। আমাদের মনে এই আশা হইয়াছে ধর্ম্মরাজ্যের যত কঠিন গূঢ় সমস্যা আছে নববিধান সে সমুদায়ের মীমাংসার পথ আবিষ্কার করিবেন। নববিধান দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছেন, উল্লিখিত বিষয়ে মহর্ষি ঈশার কথাও ঠিক, ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কথাও ঠিক। ভাববিহীন হইয়া বারংবার এক শব্দ উচ্চারণ করিলে হৃদয় কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কায়

মহর্ষি ঈশা বারংবার নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। বৃথা পুনরুক্তি ঈশার অনভিপ্রেত। বাস্তবিক ভাববিহীন হইয়া যদি বারংবার ঈশ্বরের নাম কর, তাহাতে ঈশ্বরের নামের অবমাননা, সুতরাং তোমার পাপ হইবে। ভক্তিবিহীন হইয়া বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিলে পরিত্রাণ লাভ করা দূরে থাকুক তাহাতে হৃদয় কঠোর এবং নির্জীব হয়। যদি ভক্তিশূন্য বহুভাষণ দ্বারা স্বর্গলাভ হইত তাহা হইলে কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের বহুভাষী বক্তাগণ সর্ব্বাগ্রে বৈকুণ্ঠধামে যাইত। কিন্তু স্বর্গ বহুভাষীর জন্য নহে। স্বর্গ বহুভাষণ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে।

ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা কহা পাপ। এক শব্দ এক ভাবে দুইবার উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। শব্দের প্রাণ ভাব। নব নব ভাবের সহিত যদি এক শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতে পার তাহাতে হৃদয় সরস হইবে; কিন্তু নূতন ভাব-বিহীন হইয়া যদি এক নাম বারংবার উচ্চারণ কর তাহাতে কপটতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি হইবে। আবার এক দিকে যেমন ভাববিহীন পুনরুক্তি অথবা বহুভাষণ পাপ, তেমনি অন্য দিকে সংক্ষেপে দুই একটি উপাসনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করা ভয়ানক অপরাধ। যদি সংক্ষিপ্ত উপাসনা অথবা অল্প কথায় জীবের পরিত্রাণ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনই স্বর্গারোহণ করিত। ভাববিহীন হইয়া অনেক কথা বলাও

পাপ, আবার ভাবশূন্য হইয়া অল্প কথায় ঈশ্বরকে প্রবঞ্চনা করাও পাপ। মহর্ষির কথা এবং ভক্তের কথা উভয়ই পালন করিতে হইবে। মহর্ষির উপদেশানুসারে ভাবশূন্য পুনরুক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, ভক্তের আদেশ মতে নব নব ভাবের সহিত বারংবার হরিনাম উচ্চারণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইতেই হইবে।

উভয়ের উপদেশের গূঢ় ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ লোক এই দুই আপাততঃ বিরুদ্ধ মতের ভাবার্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে। অল্পবিশ্বাসী অসাড়হৃদয় লোক সর্ব্বদা ভাবের সহিত ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য তাহারা প্রায়ই পুরোহিতের উপরে ঈশ্বরোপাসনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। প্রায় সকল দেশেই পুরোহিতের দ্বারা দেবপূজা করাইয়া লওয়ার প্রথা দেখা যায়। পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যদি অল্প মূল্যে স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে আর কেন গৃহস্থ নিজে কষ্ট স্বীকার করিবে? নিজের নির্জীবতা এবং সংসারাসক্তি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য নির্ব্বোধ মানুষ প্রতিনিধি দ্বারা, পুরোহিতের দ্বারা, দেবার্চ্চনা সম্পন্ন করিয়া লয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা পুরোহিত রাখিতে পারে না। তাঁহাদিগের ব্রহ্মের আদেশ এই যে তাঁহারা ব্রহ্মের অব্যবহিত সন্নিধানে আরাধনা করিবেন, কিন্তু যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার

অর্চ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা একটি পুরোহিত দ্বারা ব্রহ্মপূজা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য লোক এবং ব্রাহ্মের এই প্রভেদ যে অন্যান্য লোকের পুরোহিত বাহিরে, ব্রাহ্মের পুরোহিত আপনার শরীরের মধ্যে। সেই পুরোহিতের নাম রসনা।

যখন হৃদয় মন নির্জীব ও অবসন্ন হয়, যখন ব্রহ্মজ্ঞানী হৃদয় মনের ঐক্য করিয়া একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মধ্যান করিতে পারে না, তখন উপাসনার ও সঙ্গীতের পুস্তক খুলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী তাহার নিজের রসনাকে বলে, "হে রসনা-পুরোহিত, আজ আমার পরিবর্ত্তে তুমি ব্রহ্মপূজা কর।" যেমন ওদিকে গৃহস্থ সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, অথচ পুরোহিত তাহার প্রতিনিধি হইয়া প্রত্যহ দেবার্চ্চনা করিতেছে, সেইরূপ সাধন ভজনে অলস ব্রহ্মজ্ঞানীর মন সহস্র প্রকার কুচিন্তা করিতেছে, অথচ তাহার রসনা-পুরোহিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত-রূপ চণ্ডীপাঠ করিতেছে। অন্য লোকের পক্ষে পুরোহিতের হাতে পূজার ভার দেওয়া যেমন পাপ, আমাদের পক্ষে রসনার উপরে ব্রহ্মপূজার ভার দেওয়াও তেমনি পাপ। অতএব সাবধান, কেহই কখনও মুক্তি অন্বেষণের ভার পুরোহিত অথবা রসনার উপরে দিও না। মনের মধ্যে ভাব নাই, প্রেম ভক্তি নাই, রসনা কতকগুলি শিক্ষিত শুষ্ক স্তবস্তুতি পাঠ করিতে লাগিল, ইহাতে কি প্রকৃত ব্রহ্মপূজা অথবা পরিত্রাণ হয়? তোমার আমার কি এরূপ করা উচিত?

রসনাকে বেতনভুক্ পুরোহিত করিয়া কে কোথায় পরিত্রাণ পাইয়াছে? ভাববিহীন হইয়া রসনা কতকগুলি শুষ্ক স্তবস্তুতি করিবে মহর্ষি ঈশা তাহা সহ্য করিতে পারেন না; এই জন্যই তিনি গম্ভীর ধ্বনিতে বলেন "বৃথা বারংবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না।"

যদি হৃদয় মন ঈশ্বরের উপাসনা করিতে না পারে তবে অচেতন রসনা কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিবে? রসনা একটি বীণাযন্ত্র, রসনা আপনাকে আপনি বাজায় না। রসনাযন্ত্রের এক মুখ বাহিরের দিকে, আর এক মুখ ভিতরের দিকে। ভিতরের মুখ দিয়া রসনা প্রেমরস, ভক্তিরস আকর্ষণ করিবে, বাহিরের মুখে রসনা সেই সুধারস জীবের কর্ণে ঢালিয়া দিবে। এক মুখে রসনা হৃদয়সমুদ্র হইতে ভাবামৃত টানিয়া লইবে, আর এক মুখে তাহা দান করিবে। এক মুখে অমৃতসঞ্চয়, আর এক মুখে অমৃতদান। রসনা রসের আধার। কোথা হইতে রস আনে কেহ জানে না। ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, যদি সমস্ত শরীর শুষ্ক হয় তথাপি রসনাতে রস থাকে। রসনার মূলদেশে রসসাগর রহিয়াছে, প্রেমরস, ভক্তিরস প্রস্তুত রহিয়াছে। এক মুখে রসনা সেই প্রেমরস, ব্রহ্মরস, অমৃতরস, হরিনামামৃতরস পান করিয়া যখন অন্য মুখে সেই রস জীবের কর্ণে ঢালিয়া দেয়, তখন জীবের কল্যাণ হয়। রসনাই কেবল হরিনামামৃতের আস্বাদন বুঝিতে পারে। হস্ত কিংবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে মিষ্ট রস

বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মধু রসনাতে রাখ, তাহা কেমন মিষ্ট বুঝিতে পারিবে। মধু রসনাতে রাখিবামাত্র উহা তোমাকে আনন্দিত করিবে। সেইরূপ সুমিষ্ট ব্রহ্মনাম রসনার উপরে রাখ, ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া রসনা দ্বারা বারংবার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ কর, যতবার উচ্চারণ করিবে ততই ব্রহ্মনামরস গাঢ়তররূপে সুপক্ক হইয়া আসিবে। পাক ভিন্ন পক্কতা হয় না। যতই রসনাযন্ত্রে হরিনাম পাক হয়, ততই সেই নাম মিষ্টতর, মিষ্টতম এবং মিষ্টতম হইতে মিষ্টতর হয়। পাঁচবার, সাতবার, অনেকবার পাকের পর মিষ্টরস আরও গাঢ়তর হয়। এইরূপে বারংবার হরিনাম উচ্চারণের পর জিহ্বা সেই মিষ্ট নামকে জড়াইয়া ধরিবে। আর কিছুতেই সেই নামের সঙ্গে জিহ্বার বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ হইবে না। তখন অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ করিলে অপরাধ হইবে না। এই শ্রীগৌরাঙ্গের মত। এখানে ঈশা এবং শ্রীচৈতন্যের কেমন গূঢ় মিল! সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি সপ্তস্বরে যত সুর ভাঁজিলাম, ততই সেই সুর মিষ্ট হইল। এক মিশ্রী অগ্নির উপরে পাকে ফেলিলাম, দুই ঘণ্টা পরে গাঢ় মিষ্ট হইল, চারি ঘণ্টা পরে গাঢ়তর মিষ্ট হইল। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এমন অনির্ব্বচনীয় মধুরতা কোথা হইতে আসিল?" যে হরিনামে সমস্ত ভক্তদল উন্মত্ত হইয়া ভূতলে পড়ে তাহা সামান্য মিষ্ট নহে। অনেকবার পাকের পরে সেই মিষ্ট নাম প্রস্তুত হয়। অতএব ঈশা এবং চৈতন্যকে পরস্পরের বিরোধী

মনে করিও না। ভাববিহীন হইয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা পাপ; কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন এবং নব নব ভাবে বারংবার ব্রহ্মনাম সাধন কর তোমার ভয় নাই, তোমার পাপ হইবে না। হৃদয়ের ভিতর হইতে প্রেমরস তুলিয়া হরিনাম কর, তাহাতে ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে। যে ভাববিহীন হইয়া কেবল লোককে শুনাইবার জন্য হরিনাম করে তাহারই বিপদের সম্ভাবনা। হরিনাম করিতে করিতে যদি নিজের মন সরস না হয়, তাহা হইলে জানিবে সেই নাম বৃথা হইতেছে। এমন শব্দ উচ্চারণ করিবে না, এমন বক্তৃতা করিবে না, যাহাতে নিজের উপকার না হয়। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে ভাববিহীন বক্তৃতা করা মহাপাপ। যে বক্তৃতা দ্বারা নিজের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় না, সেই বক্তৃতা করা অপেক্ষা মহাপাপ কি আছে? কেবল পরকে শুনাইবার জন্য যে বক্তৃতা করে, অথবা হরিনাম করে, সে কপট।

যদি তুমি ভক্ত হও, তবে তোমার উচ্চারিত প্রথমবারের হরিনাম অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের হরিনাম মিষ্টতর হইবে। তুমি নিজে হরিনাম করিয়া নিজে সুখী হইবে। নিজের রসনার কথায় নিজে মুগ্ধ হইবে। রসনাবীণা বাজাইয়া হরিনামকে মিষ্টতর করিলে। আগে পিতা নাম মধুর ছিল, এখন মা নাম আরও মিষ্টতর হইল। এই মা নাম আগেকার ব্রহ্মনাম হইতে আরও কত মিষ্ট হইয়াছে। এক সময় দয়াময় নাম কত মিষ্ট ছিল। তৎপর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে

হরিনাম কেমন মিষ্টতর হইয়া আসিল। এখন আবার সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতম মা নাম পাইয়াছি। এই মিষ্টতম মা নাম এবং সেই পূর্ব্বেকার দয়াময় ও হরিনামে কত প্রভেদ! ভক্তির সহিত বারংবার মা শব্দ উচ্চারণ কর, এক ভাবে মা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিও না; কিন্তু নিত্য নূতন ভাব-রসের সহিত মা নাম উচ্চারণ কর, দেখিবে হৃদয় ফাটিয়া ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে এবং ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া সেই নাম করিতে করিতে পরিশেষে আনন্দসাগরে মন মগ্ন হইবে। এই যে রসনা বীণাযন্ত্র, এই যন্ত্রে সাত সুরে সাতগুণ সাত সুরে সেই মা নাম ভাঁজিবে, ভক্তিভাবে যতবার ভাঁজিবে ততই ইহা মিষ্ট হইবে। হে রসনা, তোমাকে আমরা চিনি-লাম না। কোন্ নারদের বীণা তুমি? তোমার মধুর স্বরে আমার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছে। রসনা, তুমি এক মুখে সুধাপান করিতেছ, আর এক মুখে সুধা ঢালিতেছ। রসনা তুমি ছিলে কোথায়? আসিলে কোথায়? স্বর্গের বীণা তুমি, তোমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে কে আনিল? তোমা দ্বারা এই পৃথিবীতে সুখের বৈকুণ্ঠ সৃষ্ট হইল। একে মার নাম মিষ্ট, তাতে কোমল নরম রসনা তুমি, তোমাতে মার সুমিষ্ট নাম সংযোগ হইলে পৃথিবী আর কঠিন থাকিতে পারিবে না। রসনা, তুমি খুব ভক্তির সহিত মা নাম সাধন কর। মার নাম ও মা অভিন্ন। "নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ।" ভাই, তোমার রসনা-বীণাতে সুখমোক্ষদায়িনী মার নাম সংযোগ কর, স্বরের দ্বার

বন্ধ করিয়া দিয়া মাকে মা, মা, বলিয়া ডাক, চক্ষে ভক্তিজল পড়িবে, হৃদয়ে ভক্তিরস উথলিয়া উঠিবে।

ক্ষমা ও ক্রোধের সামঞ্জস্য।

রবিবার ১১ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ২৬এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

ধর্ম্মরাজ্যে কত বিবাদ কত সংগ্রাম আমাদের দেখিতে হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধই দেখা যায়, সামঞ্জস্য শান্তি বহু দূরে। ক্ষমাশীল হিন্দুধর্ম্ম শত্রুকেও ক্ষমা করিতে উপদেশ দেয়, আক্রমণকারী মহম্মদ-ধর্ম্ম শত্রুকে নিপাত করিতে উৎসাহ প্রদান করে। হিন্দু যোগী ঋষি স্থিরচিত্ত ও প্রশান্ত, কিন্তু মুসলমান ভয়ানক উগ্র ও উদ্ধত। প্রধান প্রধান আর্য্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলিয়াছেন, শত্রুকে ক্ষমা কর, যে তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত হয়, তুমি তাহাকে ছায়া দান কর, যে তোমাকে আক্রমণ করে তুমি তাহার উপকার কর, যে তোমার ধনহানি, মানহানি করে, তুমি তাহাকে ধন মান দেও। যে তোমাকে অভিশাপ দেয় তুমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ কর। মনের রাগ সংবরণ কর, মনে প্রতিহিংসা উত্তেজিত হইতে দিও না। যেমন মিত্রের মঙ্গল চেষ্টা করিবে তেমনি শত্রুর কল্যাণ সাধন করিবে।

হিন্দুধর্ম্ম এরূপ ক্ষমার উপদেশ দেন, কিন্তু মুসলমানধর্ম্ম ভয়ানক তেজের সহিত শত্রু নিপাত করিতে আদেশ করে।

কাফেরবিনাশ মহম্মদধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যত লোক দাঁড়াইয়াছে সকলকে নির্যাতন করিয়া পরাজয় করিবে, ইহা মহম্মদের একটি প্রধান আদেশ। এক দিকে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশে রক্ত ঠাণ্ডা হয়, অপর দিকে মুসলমানধর্ম্মের উপদেশ শুনিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে। এ স্থলে মুসলমান ও আর্য্যদিগের কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে? যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মহাপুরুষগণ ঈশ্বরপ্রেরিত হন তাহা হইলে বাহিরে এরূপ অসামঞ্জস্য কেন দেখা যায়? ঈশ্বরের কি এই অভিপ্রায় যে পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ চলিবে? যদি ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় হয় তবে তিনি ক্ষমার শাস্ত্র কেন প্রচার করিলেন? হিন্দুধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। হিন্দুজাতি শান্ত ও ক্ষমাশীল, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রভাবে আরও শান্ত ও ক্ষমাশীল হইবে। ব্রহ্মপরায়ণ হিন্দুর মনে এখনও যতটুকু তেজের ভাব রাগের ভাব আছে তাহাও ক্রমে সাধন দ্বারা বিলুপ্ত হইবে। যথার্থ সাত্ত্বিক হিন্দুর ধৈর্য্যগুণ সহজে ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হয় না। নববিধান হিন্দুজাতিকে আরও অধিক পরিমাণে সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ করিতেছে। নববিধানের ক্ষমা ও উদারতা অতীব আশ্চর্য্য। সহস্র শক্রতা, নির্যাতন ও আক্রমণের পরিবর্ত্তে উহা ক্ষমা, শান্তি ও প্রেম দিবে। যাবনিক ধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ঋষিধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম, শান্তির ধর্ম্ম; মহম্মদের ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। মহম্মদ-ধর্ম্ম, বৈরনির্যাতন ও কাফেরদলনের ধর্ম্ম। কাফের কে?

ঈশ্বরের শত্রু। মহম্মদের ধর্ম্মগ্রহণ করিলে কাফের নিগ্রহ করিতেই হইবে। এই দুই ধর্ম্ম আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ। এক দিকে জলের স্রোত, আর এক দিকে অগ্নিকুণ্ড। এক দিকে "মার মার কাট কাট" শব্দ উত্থিত হইতেছে, অপর দিকে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" যবনের উষ্ণ শোণিত, হিন্দুর শীতল রক্ত। এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে কি বন্ধুতা সম্ভব? পৃথিবীতে পরিণামে হয় ক্ষমার প্রাদুর্ভাব নতুবা ক্রোধের প্রাদুর্ভাব হইবে। বল হে নববিধান, পৃথিবীতে এই দুয়ের কোনটি জয় লাভ করিবে? ক্রোধ না ক্ষমা? নববিধান, তুমি সকল বিরুদ্ধ দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে আসিয়াছ, আপাততঃ এই দুই দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেও। হিন্দু মুসলমান একত্র কর দেখি।

নববিধান অতি সুন্দররূপে এই দুই আপাতবিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিলেন। তাঁহার নিষ্পত্তি এই;—শত্রু দুই প্রকার, এক ঈশ্বরের শত্রু, আর এক মানুষের শত্রু। ক্ষমা মানুষের শত্রুর প্রতি, যুদ্ধ ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে। নব-বিধানের এই বিধি অনুসারে আমি আমার প্রত্যেক শত্রুকে ক্ষমা করিব। যে শত্রু আমার অন্ন বস্ত্র বন্ধ করে, আমি তাহার অভাবের সময় অন্ন বস্ত্র দান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের গৌরব পরিচ্ছদ অপহরণ করে, তাহার অবিশ্বাস ছেদন করিবার জন্য আমার

পঞ্চাশখানি বিশ্বাসের খড়্গ উত্থিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিবে। যখন ভুবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী নববিধান হাতে করিয়া পাপী দুঃখীদিগকে ধর্ম্মের অন্ন বিতরণ করেন, তখন যদি কোন পাষণ্ড সেই অন্নদানের বিরোধী হয়, শত শত ভক্ত সেই পাষণ্ডের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দাঁড়াইবেন। মনুষ্যকে যদি কেহ শত্রু হইয়া মারিতে চেষ্টা করে সে বরফের মত শীতল হইয়া তাহার সমস্ত শত্রুতা নির্ব্বাণ করিবে।

এই ক্ষমা কঠোর সাধনসম্ভূত নহে। যথার্থ ক্ষমাশীল যিনি তিনি সহজে ক্ষমা করেন। তিনি যে কঠোর সাধন অথবা বিবেক দ্বারা রাগ দমন করেন তাহা নহে; তাঁহার সহজে রাগ হয় না। তাঁহার মনের উপরে ঈশ্বর এমনি ক্ষমাজল, নির্ব্বাণজল ঢালিয়া দিয়াছেন যে, সে রাগ করিতে পারে না। দুরন্ত শত্রুদিগের দ্বারা ঈশা ক্রুশে আহত হইলেন, তথাপি তিনি হিংসার বিনিময়ে প্রতিহিংসা না দিয়া ক্ষমা দিলেন। শত্রুদিগের হস্ত হইতে কষ্ট পাইলেও তাহা-দিগকে কষ্ট দিবে না। চারিদিকে ভয়ানক নির্যাতনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ সাধু শীতল শ্বেত প্রস্তরের থামের ন্যায় স্থির অটল হইয়া রহিলেন, নিজে পড়িলেন না, কিছুমাত্র ক্ষত বিক্ষত হইলেন না, বরং নিজের শীতলস্বভাবগুণে শত্রুদিগের দ্বারা যত আগুন নিক্ষিপ্ত হইল সমুদায় ঠাণ্ডা করিলেন। চারিদিকে শত্রু-তার আগুন জ্বলিতেছে, মধ্যে ক্ষমাশীল ব্যক্তি দৃঢ় অচল

স্তম্ভের ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছেন। নিজের শত্রুদিগকে ক্ষমা করা তাঁহার স্বভাব, নিজের শত্রুদিগকে ক্ষমা করা উচিত কি না যিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তিনি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাধক। উৎকৃষ্ট ভক্ত যিনি তিনি বলেন, নিজের শত্রুর প্রতি ক্ষমা না করা ভয়ানক অধর্ম্ম। কিন্তু এ সকল বিধানাশ্রিত লোক যেমন এক দিকে ক্ষমাশীল তেমনি অপর দিকে যুদ্ধশীল। নিজের শত্রুর প্রতি ক্ষমা-সাধন ইহাদিগের পক্ষে অনিবার্য্য; কিন্তু ঈশ্বরের শত্রুর প্রতি ইহারা সর্ব্বদা খড়্গহস্ত। যেখানে স্বার্থ নাই, যেখানে আমি নাই, যেখানে কেবল ঈশ্বর আছেন সেখানে যদি কোন ঈশ্বরবিরোধী পাষণ্ড ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে অথবা কোন কার্য্য করে, নববিধানাশ্রিত লোক তাহা সহ্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরভক্ত কোন মতেই ঈশ্বরনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কাহারা? যাহারা মাকে ভালবাসে। যেখানে ব্রহ্মভক্তি, বৈরাগ্য, ক্ষমা, সেখানেই ব্রহ্মের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জা। যাহারা মাকে ভালবাসে না তাহারা কাপুরুষ। যাহারা মার শত্রুদিগের হস্ত হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ করে না, তাহারা নীচ স্বার্থপর ভীরু। কাপুরুষ, তুই মুখে বলিস্ মার প্রতি তোর অগাধ অচলা ভক্তি, অথচ মার নামে যত অপমান হয় তৎসমুদায় তুই সহ্য করিস্? যে সাধক সত্য সত্যই মার নাম সাধন করে,

যাকে ভালবাসে সে কদাচ যার নামে নিন্দা অপবাদ সহ্য করিতে পারে না।

যত পরিমাণে ব্রহ্মভক্তি বৃদ্ধি হয় তত পরিমাণে ব্রহ্মনিন্দা অসহ্য হইয়া উঠে, যদি ভক্তকে কোন পাষণ্ড এই কথা বলে;— "তোর আবার ঈশ্বর কে? তুই আপনি পরিশ্রম করিয়া আপনার এবং আপনার পরিবারের অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় করিস্। ঈশ্বর তোকে অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করেন, কেন তুই এই মিথ্যা কথা বলিস্?" এই কথা শুনিবামাত্র, ভক্তের আপাদ-মস্তক স্বর্গীয় তেজে পূর্ণ হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ তিনি রাগ, দয়া ও ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া সেই পাষণ্ডের মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আপনার প্রভুর বিরুদ্ধে, আপনার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, একটী কথা অগ্নি-সমান, উহা কিছুতেই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। যখনই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা শুনেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিতে চেষ্টা করেন। ভক্তের অস্ত্র কি? বিশ্বাস। ভক্তের খড়্গ কি? জিহ্বা। ভক্ত তাঁহার বিশ্বাস অস্ত্রে নাস্তিকের অবিশ্বাস কাটিতে থাকেন, এবং জিহ্বাযন্ত্রে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্ম সঙ্কীর্তন করিয়া, লোকের অভক্তি ও অপ্রেম বিনাশ করেন। ভক্তদল বিস্তীর্ণ মাঠে দাঁড়াইয়া তীব্র বিশ্বাসবাণে ঈশ্বরের শত্রুদিগের অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করেন। এ স্থলে যুদ্ধ করা অন্যায় ব্যবহার নহে, কিন্তু ন্যায় ব্যবহার।

পাষণ্ডদিগের নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করা বিশ্বাসী ভক্তের প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি মাতৃনিন্দা, পিতৃনিন্দা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভক্ত সন্তান। নিজের কর্ণের নিকট সহস্র প্রকারে ঈশ্বর নিন্দা হইতেছে অথচ সে ব্যক্তি একবারও কাঁদিল না, সে কখনও ঈশ্বরের ভক্ত নহে। নিজের শত্রুকে ক্ষমা করিব; কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র শত্রুতা সহ্য করিব না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের শত্রুও প্রবল থাকুক, মিত্রও আদৃত হউক, এরূপ ভাব কদাপি পোষণ করিবে না, এমন কথা মুখে আনিবে না। জনসমাজে কতকগুলি ঈশ্বরবিরোধী উপাসনাবিরোধী ধর্ম্ম ও সতীত্ব-বিরোধী লোক থাকিবে, অথচ ঈশ্বরভক্ত ঘরে বসিয়া হাসিবেন ইহা অসম্ভব। এই পৃথিবী বিশ্বাসীদিগের জন্য, বিশ্বাসী ভিন্ন এই পৃথিবীর মাটী আর কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল ঈশ্বর-ভক্তেরাই থাকিবেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন তাঁহাদিগেরই জন্য ঈশ্বরের গৃহ। যাহারা ঈশ্বরের বিরোধী নাস্তিক কাফের তাহাদিগের ঈশ্বরভবনে থাকিবার অধিকার নাই। তবে কি কাফের বধ করিতে হইবে? অস্ত্র দ্বারা কি তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে? না। শরীর তো কাফের নহে, তাহাকে নির্যাতন করা অধর্ম্ম। নাস্তিক বিধর্ম্মী ভাবই কাফের, তাহাকে বধ করিতে হইবে, পৃথিবী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে হইবে। কাফের বিনাশের যথার্থ অর্থ কি? পাপ

ও নাস্তিকতা বিনাশ। কাফের জয় কাহাকে বলে? ব্রহ্ম-বৈরীদিগের বৈরভাব পরাজয়। এই ভাবে ঈশ্বরভক্তেরা কাফেরবি.দ্ধে যুদ্ধ করিবেন, মানুষের প্রতি আক্রমণ করিবেন, না; মানুষের শরীরের বিরুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও রাগ হইবে না, কিন্তু যেখানে কাফের, অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু সেখানে তীব্র অস্ত্র সঞ্চালন করিতে হইবে।

পৃথিবীতে যত রকম অবিশ্বাস নাস্তিকতা পাপ ব্যভিচার আছে, সে সমুদয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। ইহারা ঈশ্বরের মহাশত্রু। ইহারা ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিয়া আপনারা পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লইতে চায়। নাস্তিকতা, উপধর্ম্ম, বিষয়াসক্তি, ব্যভিচার, এই চারি দল পৃথিবীর চারিদিক অধিকার করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। নাস্তিকের ইচ্ছা যে পৃথিবী শুদ্ধ লোক নাস্তিক হয়, ইন্দ্রিয়াসক্ত মদ্যপায়ীর ইচ্ছা যে পৃথিবী শুদ্ধ লোক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও সুরাপায়ী হয়। পাষণ্ডের ইচ্ছা যে পৃথিবীর কেহই ঈশ্বরের পূজা না করে। যাহারা ঈশ্বরকে মানে না, নানা প্রকারে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা করে তাহাদিগের মনে মনে এই কুবাসনা যে পৃথিবীর সকলেই এরূপ করে। বিকৃত লোক যেমন আপনি অধর্ম্মে ডুবিল তেমনি অপর সকলকেও অধর্ম্মে ডুবাইতে চেষ্টা করে। ইহাদিগের পাপাচারে কাফেরবংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহাতে অসুরদল বৃদ্ধি না হয়, ব্রহ্মভক্তদল সর্ব্বতোভাবে এরূপ চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা

হুঙ্কাররবে বলেন আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কাহার সাধ্য পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রচার করে? যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া আমরা এমন সুখী হইতেছি কাহার সাধ্য পৃথিবী হইতে সেই ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দেয়?

ব্রাহ্মগণ, কাফেরদিগের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করিতেই হইবে। আমরা আমাদের শত্রুকে ক্ষমা করিব; কিন্তু ঈশ্বরের শত্রু নাস্তিকতা, ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়াসক্তির বিরুদ্ধে আমরা হুঙ্কার করিয়া বিশ্বাস কামান ছুড়িব, তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা এ সকল শত্রু নিপাত করিব। পাপকে কাটিবে; কিন্তু সাবধান ভাইকে ভগ্নীকে কাটিবে না। ক্ষমা করিবে হিন্দুর ন্যায়, যুদ্ধ করিবে মুসলমান সিপাহিদের ন্যায়। নাস্তিকের প্রাণের উপরে কোন আঘাত করিবে না, কিন্তু নাস্তিকতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। শস্ত্রবিদ্যানিপুণ শস্ত্রধারী কেমন আশ্চর্য্যরূপে অস্ত্রাঘাত করিয়া ধরাশায়ী লোকের বক্ষঃস্থিত সূক্ষ্ম কদলীপত্র ছেদন করে, অথচ সেই লোকের অঙ্গে কিছু মাত্র আঘাত লাগে না। মানুষের প্রাণের উপর তোমার কোন অধিকার নাই, ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কাফেরভাব বিনাশ করা তোমার ধর্ম্ম। পাপ নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। ঈশ্বরবিরুদ্ধে, বিধানবিরুদ্ধে, সাধুদিগের বিরুদ্ধে, সতীদিগের বিরুদ্ধে আক্রমণ সহ্য করিবে না। ঈশ্বরনিন্দা, গুরুনিন্দা, মাতৃনিন্দা শুনিবে না।

প্রকৃত ধর্ম্মবীর বলেন, আমাকে সহস্র কষ্ট দেও, অপমান

কর, আমি সহ্য করিব, কিন্তু পিতা মাতা গুরু সতী স্ত্রীর নিন্দা কখনও সহ্য করিতে পারিব না, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম যিনি সেই প্রাণেশ্বরের নিন্দা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। মোক্ষদায়িনী জগদীশ্বরী সন্তানদিগের পাপ দুঃখ মোচন করিবার জন্য যে নববিধান বিস্তার করেন, সেই নববিধানকে যদি কেহ মিথ্যা বলে তাহা হইলে ভক্তের বিশ্বাসখড়্গ তেজের সহিত দাঁড়াইয়া উঠে। ভক্তেরা মেদিনী কাঁপাইয়া বলেন, "হে বিধাতার বিরোধী, হে ঈশ্বরবিরোধী, যতক্ষণ তোমাদিগের নাস্তিকতা চূর্ণ না হইবে, ততক্ষণ আদ্যাশক্তি ভগবতী প্রদত্ত এই খড়্গ, এই শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমাদের প্রতিজনের হাতে ঝক্‌মক্ করিবে।" ঈশ্বরনিন্দা শুনিয়াও যে বরফের ন্যায় শীতল হইয়া থাকে, ঈশ্বরবিরুদ্ধ ভাব বিনাশ করিবার জন্য একটী কথাও বলে না, সে কখনই প্রকৃত ভক্ত নহে। সতী যেমন পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, ভক্ত তেমনি বিশ্বপতির নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। সং-পতির নিন্দায় যে স্ত্রী আমোদ করে সে নারীকে কে শ্রদ্ধা করে? আমাদের মধ্যে যদি কেহ নিজের প্রতি শত্রুতা জন্য রাগে, নিজের মানহানি কিংবা ধন হানিতে উত্যক্ত হয় সেও কাপুরুষ, তাহারও অনুতাপ গৃহে গিয়া লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া রাখা উচিত। নিজের সম্পর্কে সহস্রবার অসংখ্যবার ক্ষমা। কিন্তু সেই ক্ষমাশীল মাটীর মানুষ যিনি নিজের শত্রুর প্রতি

কখনও রাগেন না, যাই ঈশ্বরবিরুদ্ধ কোন কথা শুনেন, তখনই তেজস্বী যোদ্ধার স্বভাব ধারণ করেন। তিনি হুঙ্কার করিয়া বলেন, "কি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার ঈশ্বরের নিন্দা? ওরে কাণ, এখনও তুই ঈশ্বরনিন্দা শুনিতেছিস্? ওরে ক্ষুদ্র জীব, তুই কি জানিস্ না যে তুই ঈশ্বরের সন্তান, সর্ব্বশক্তিমান্ তোর সহায়, লক্ষ লক্ষ শত্রু তোর কি করিবে? তোর কাহাকে ভয়? ঈশ্বর তোর দিকে, তুই কি নাস্তিক পৃথিবীকে ভয় করিস্? ঈশ্বর যে দিকে নাই সে দিক শূন্য। শূন্যকে ভয় কি? যাহারা ইন্দ্রিয় ও নাস্তিকতার দাস তাহাদিগকে কি ব্রহ্মদাস ভয় করেন?" ব্রহ্মদাসের তেজ ভয়ঙ্কর, যেমন সম্প্রতি নৈনীতাল পর্ব্বতের প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়াতে বড় বড় অট্টালিকা সকল নিমেষে চূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিক টল্‌মল্ করিতে লাগিল, এবং তথাকার হ্রদ হইতে ভয়ানক ঢেউ উঠিয়া মহা আস্ফালন করিতে করিতে এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত বেগে চলিয়া গেল সেইরূপ বিশ্বাসীর রাগ কাফের বংশ ধ্বংস করে। সকলে বিশ্বাসী হউক, সচ্চরিত্র হউক, এই জন্য সাধুর এত রাগ ও তেজ। সাধুর রাগ কেবল ব্রহ্মানুরাগ। দেখ ক্ষমা ও রাগের কেমন সুন্দর মিলন। ঈশ্বরের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার কর।

এক আধারে নরনারী প্রকৃতি।

রবিবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক; ৩রা অক্টোবর ১৮৮০।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম কি? স্ত্রী পরিবার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পরিবর্জ্জন করিলে কি অধর্ম্ম হয়? শ্রীচৈতন্য তাঁহার মাতা স্ত্রী আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করাতে কি তাঁহার অপরাধ হইয়াছিল? চৈতন্য সংসারী, চৈতন্য সন্ন্যাসী, এই দুয়ের মধ্যে কি এক ভয়ানক পাপ হ্রদ দেখা যায়? সংসার হইতে সন্ন্যাসে যাইতে হইলে কি কলঙ্কনদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়? যখন গৌরাঙ্গ সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বাহির হইলেন তখন কি তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইল, তখন কি তাঁহার মহিমা সূর্য্য অস্তমিত হইল? আজ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক লোক যাঁহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া কত ভক্তি ও সম্মান দিতেছে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া কি তিনি অধার্ম্মিক হইয়াছিলেন? সংসার ত্যাগ করাতে কি তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে হইয়াছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কোন বৈরাগী আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া এত বড় করিতে পারেন যে তাহা সমস্ত পৃথিবীকে কুটুম্ব মনে করিতে পারে তাহা হইলে সেটি দৌর্ব্বল্য বা অধর্ম্ম নহে। যখন চৈতন্য আপনার জন্মভূমি এবং আপনার ক্ষুদ্র

পরিবার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, সাধারণ লোকে মনে করিল তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার যে প্রেম অল্প লোকে বদ্ধ ছিল, তাহা এখন সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ হইল। ইহাতে ত্যাগ কৈ হইল? প্রেমের হ্রাস হইল না, কিন্তু উহা প্রশস্ত হইল। যে প্রেমকে ক্ষীণ করে, সঙ্কীর্ণ করে, অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ করে, সেই দোষী। কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা প্রেমের ভূমি বিস্তীর্ণ করেন। ধন্য ঈশা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাসী, যাঁহারা একটী মার পরিবর্ত্তে সহস্র মাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন, এবং দুই একটি অতিথির পরিবর্ত্তে হৃদয়গৃহে সহস্র সহস্র অতিথি সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি ছোট সংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ করেন, একখানি ঘরের পরিবর্ত্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েকজন বন্ধুর পরিবর্ত্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন। সন্ন্যাসীর মন অনাসক্ত ও শৃঙ্খলমুক্ত। সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র গৃহের প্রতি আসক্তি কাটিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার গৃহ করিয়া লন। বাস্তবিক ভক্ত বৈরাগীদিগের হৃদয়ের ভিতরে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম অবতরণ করে। যখন নীচ স্বার্থপর মায়াবদ্ধ প্রেমের তিরোভাবের পর ভক্তের অন্তরে স্বর্গের প্রশস্ত প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন সেই ভক্তের হৃদয় অতি সুন্দর ও অপরূপ রূপ ধারণ করে।

জগজ্জনের প্রতি প্রশস্ত প্রেম ভিন্ন ভক্ত বৈরাগীর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। হিন্দুস্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ নরনারীদিগের মধ্যে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের নাম শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা এই দুইটি নামের প্রতি কি ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই? তাঁহাদিগের নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেমানুরাগ, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের প্রতি কেন শ্রদ্ধাবিহীন? যে সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি সাধন করেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই দুইটি নাম বিশেষ আদরণীয় কেন না হইবে? ব্রাহ্মেরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে ব্রহ্মের কত রূপ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কি কোন দেবভাব দৃষ্ট হয় না? কেবল কৃষ্ণ, কেবল রাধা নহে; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ, সংযুক্ত নাম, প্রায় সর্ব্বদাই একত্র উচ্চারিত হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ; নরপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতির মিলন। এক দিকে শ্রীরাধা আর এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার জন্য প্রথমে নারীর নাম রাখা হইয়াছে। আগে রাধিকা পরে কৃষ্ণ। রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবে হিন্দুস্থান এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্ত্তন ও ঘোষণা করে।

হিন্দুস্থানের বৈষ্ণবেরা অনেক শতাব্দী রাধাকৃষ্ণকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছে। কিন্তু হে হিন্দুস্থান, তুমি কি জান না যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তোমার মধ্যে প্রেমের ধর্ম্মসম্বন্ধে

এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ গ্রামে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থান, তোমার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তোমার ইতিহাস পুস্তকের দশ বার পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তোমার এই একটি দোষ হইয়াছে যে, তুমি ইতিহাসকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রহণ করিলে; কিন্তু হে হিন্দুস্থান, এত বড় ঘটনা শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর লীলা, কেন তুমি অস্বীকার করিলে? যদি তুমি পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও তবে ধর্ম্মজগতের প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীকার করিতে হইবে। অবতারের পর অবতার তুমি মানিয়াছ, সমুদয় প্রেরিত মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছ; কিন্তু ভাগবত পর্য্যন্ত মানিয়া কেন ক্ষান্ত হইলে? চৈতন্যচরিতামৃত কেন গ্রহণ করিলে না? নবীন হিন্দুস্থান, তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন মথুরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ নহেন। তোমার রাধাকৃষ্ণ এখন যুগল মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। এখন একাধারে দেব দেবী উভয় প্রকৃতি, নরনারী উভয় প্রকৃতি। এখন রাধাকৃষ্ণ স্বতন্ত্র নহেন; কিন্তু দুই এক হইয়া শ্রীচৈতন্যের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছেন।

চৈতন্যলীলায় দেখিবে চৈতন্যের সঙ্গে স্ত্রী নাই, চৈতন্য পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছেন। এক যুগে দেখিলে রাধার সহিত কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন, রাধাকৃষ্ণ ঐ

দুইটি লোক সমস্ত দেশকে মত্ত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রেমের ধর্ম্ম যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী বালক সকলের মন আকর্ষণ করিতেছে। প্রেমের ধর্ম্মে অনুরাগই সর্ব্বস্ব, জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য নাই। কৃষ্ণধর্ম্মে রাসের ছবি, দোলের ছবি দেখিবে, নর-নারীর একত্র মিলন দেখিবে; কিন্তু চৈতন্যের সন্ন্যাস ধর্ম্মে এক নবীন সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য দেখিতে পাইবে। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অতি সুন্দর গৌরাঙ্গ একাকী উদাসীন বেশে কীর্ত্তনাদি করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। গৌরাঙ্গ এমন সুন্দর ছিলেন যে, সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার জন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সংসারের ভিতরে তিনি সংসারী ছিলেন, বিদ্বানদিগের মধ্যে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণে সুন্দর পুরুষ। এমন সুপণ্ডিত অনায়াসে শ্রী সৌন্দর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি সমুদয় জলাঞ্জলি দিয়া সুন্দর কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। ইনি জগৎকে হরিনাম সুধা পান করাইবার জন্য উন্মত্ত উদাসীন হইয়া বাহির হইলেন। কিন্তু ইহাঁর সঙ্গে স্ত্রী নাই, একটিও নারী নাই, ইহাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাঁর সঙ্গে কেন আসিলেন না? পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা রহিলেন না কেন? ইহাঁর সময়ে ঈশ্বরের ভিন্ন অভিপ্রায়। তোমার আমার অভিপ্রায় হইলে কি হইবে? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, চৈতন্য প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক নহেন, তিনি প্রেমধর্ম্মের একজন প্রধান সংস্কারক।

তিনি প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম পূর্ণ করিলেন। যখন ভারতবর্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য্য ভাব এবং ব্যবহার সকল বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইল সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব প্রেম-ধর্ম্মের ভিতরে বৈরাগ্য স্থাপন করিলেন। নরের প্রতি নারীর প্রেম এবং নারীর প্রতি নরের প্রেমকে তিনি বিশুদ্ধ করি-লেন। শ্রীচৈতন্য দেখাইলেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে ও তাঁহার সময়ে বিধাতার কিরূপ লীলা খেলা হইবে। তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যকে সম্মিলিত করিলেন। তাঁহার চরিত্রে প্রেম ও পুণ্যের বিবাহ হইল। তাঁহার জীবন প্রেম ও বৈরাগ্যের শুভ সম্মিলন। জগতের প্রতি প্রেমোন্মত্ত হইয়া তিনি আপনার, মাতা স্ত্রী পরিবার পরিত্যাগ করিলেন। জগতের লোক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এ ব্যক্তি সংসার ছাড়ে কেন? ইহার অন্তরে এরূপ অপ্রেম নিষ্ঠুরতা কে প্রেরণ করিল? এমন স্নেহের প্রতিমা মা এবং প্রেমের প্রতিমা জায়ার প্রতি এ ব্যক্তি বিমুখ কেন?" এইরূপে নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপ করিল! তাহাদিগের মতে শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারত্যাগী হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিলেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যমতে জন্মভূমি দর্শন নিষেধ, নারীর নিকটে ভিক্ষা লওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ। অজ্ঞ লোকে বলে চৈতন্যের ধর্ম্ম অপূর্ণ, কেন না তিনি নারীপ্রকৃতিকে

একেবারে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু জ্ঞানী বৈষ্ণব বলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাহিরের মাতা স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়িয়া নিজের হৃদয়ের মধ্যে নরনারীকে এক করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগল্‌ভা ভক্তিই তাঁহার শ্রীরাধিকা, তাঁহার নারীপ্রকৃতি। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কৃষ্ণভাব রাধাভাব উভয়ই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে একাধারে দেবদেবী দুই অবতার। তাঁহার পূর্ব্বে যুগে যুগে একাধারে এক এক ব্রহ্মগুণের অবতরণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাঁহার জীবনে নরনারীর মিলন হইল। তিনি একাধারে রাধাকৃষ্ণের মিলন, যোগ ভক্তির মিলন, প্রেম পুণ্যের বিবাহ, নরনারীর যোগ, অনুরাগ বৈরাগ্যের সম্মিলন দেখাইলেন।

যে নববিধান হিন্দু মুসলমান এক করিয়াছেন, ক্ষমা ক্রোধ, শান্তি যুদ্ধের সামঞ্জস্য দেখাইলেন, সেই নববিধান শ্রীচৈতন্যের এই ধর্ম্মকে আদর করেন, ভক্তি করেন। নববিধান সন্ধিপ্রিয়, মিলনপ্রিয়। নববিধান পূর্ণ ধর্ম্ম, ইহা নরপ্রকৃতি কিংবা নারী-প্রকৃতি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা অখণ্ড ঈশ্বরের অখণ্ড ধর্ম্ম। মনুষ্যপ্রকৃতি পরিপক্কাবস্থায় ঈশ্বরের খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া সুখী থাকিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়েরই অর্চ্চনা করে। সাধক সিদ্ধ অবস্থায় আপনার আত্মার মধ্যে দেবভাব এবং দেবীভাব উভয়ই সম্মিলিত দেখিতে পান। সিদ্ধ অবস্থায় মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করে। পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে

বিবাহ করে, নারী পুরুষকে বিবাহ করে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষ আপনাকে বিবাহ করে, নারী আপনাকে বিবাহ করে, এই যে নরনারী আপনাকে আপনি বিবাহ করে ইহাই স্বর্গীয় বিবাহ। এই স্বর্গীয় বিবাহপ্রথা অনুসারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন। প্রায় সকলেই স্বীকার করে স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাংশ। ইংরাজ জাতিও স্ত্রীকে পুরুষের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাংশ বলিয়া স্বীকার করে। চৈতন্য দেবদেবীর উভয়ের অবতার। চৈতন্য বাহিরের বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িলেন; কিন্তু প্রকৃত বিষ্ণুপ্রিয়া যে ভক্তি তাঁহাকে তিনি অন্তরে করিয়া লইয়া গেলেন। একা শ্রীচৈতন্য যখন নাচেন তাঁহার ভিতরে কৃষ্ণ ও রাধা দুই প্রকৃতি নাচে। চৈতন্য এক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার এক চরণ পুরুষের, আর এক চরণ নারীর। সুতরাং যখন তিনি নৃত্য করেন তখন রাধাকৃষ্ণ পুরুষপ্রকৃতি উভয়ই নৃত্য করে। বাস্তবিক প্রত্যেক ভক্ত-হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে নরনারীর মিলন হয়, স্বভাবতঃ নারী নরের প্রতি, নর নারীর প্রতি, দেবী দেবের প্রতি, দেব দেবীর প্রতি অনুরক্ত। পুরুষ স্ত্রীর সহবাসে সুখী, স্ত্রী পুরুষের সহ-বাসে সুখী। দুইজন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ধর্ম্মরাজ্যে ভক্তহৃদয়ও এই নিয়মের অধীন। এই জন্যই যুগে যুগে যুগল-মূর্ত্তি দেখা যায়, যথা—রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, হরগৌরী। আরও উপরে যাও দেখিবে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মের ভিতরে পুরুষ ও প্রকৃতি একীভূত। ব্রহ্মেতে নরস্বভাব ও নারীপ্রকৃতি এক হইয়া

রহিয়াছে। ব্রহ্মের ভিতরে যোগ পুরুষ ও প্রেম স্ত্রী, দুই একত্র হইয়া নৃত্য করিতেছে। হে ব্রাহ্ম ভাবুক, তুমি যোগ-নেত্রে ব্রহ্মের বক্ষে এই যুগল মূর্ত্তি দর্শন কর।

ব্রহ্ম পিতৃমূর্ত্তি ও মাতৃমূর্ত্তি উভয়ের আধার। ব্রহ্মের ভিতরে নরপ্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতি, পিতৃভাব ও মাতৃভাব দুই সম্মিলিত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্ম সমুদয় ভাবের পূর্ণাধার; কিন্তু জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার এক এক ভাব স্বতন্ত্র হইয়া এক এক অবতারে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। যখন কেবল প্রেম প্রেম করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়সেবাতে পরিণত হইল, তখন প্রেম ও বৈরাগ্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য মহাপুরুষ চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিলেন। যখন অনেক প্রকার কুসংস্কার ও পাপাচার বঙ্গদেশকে কলুষিত করিল, তখন বঙ্গদেশ ব্যাকুল অন্তরে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিল—"হে বিঘ্ন-বিনাশন ভগবন্, আমাকে এই পুরাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকার হইতে রক্ষা কর।" তখন ভগবান বঙ্গদেশের দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রেম ও বৈরাগ্য একাধারে রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিলেন। গৌরাঙ্গের তনু হরিপ্রেমে গঠিত। তিনি এত বড় প্রেমিক হইয়াও সংসার ছাড়িলেন। কিন্তু যথার্থ ভাবুক বুঝিতে পারেন, যদিও চৈতন্য বাহিরের সংসার ছাড়িলেন, তাঁহার প্রকৃত সংসার অখণ্ড রহিল। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সন্তান চৈতন্য সাকার স্ত্রীকে নিরাকার

বিষ্ণুপ্রিয়া করিয়া লইলেন। ঘরের বিষ্ণুপ্রিয়া এখন সন্ন্যাসীর বিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন তিনি স্ত্রী-প্রকৃতি ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় ভক্তচূড়ামণি আপনার ঐ প্রকৃতিকে আপনি বিবাহ করিলেন।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত পুরুষ জন্মিয়াছে, সমুদয় ঈশ্বরের পুরুষভাব হইতে এবং যত নারী জন্মিয়াছে সমুদয় তাঁহার নারীভাব হইতে জন্মিয়াছে। ঈশ্বর নরপ্রকৃতি এবং নারী-প্রকৃতি উভয়ের আধার ও উভয়ের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই দুই প্রকৃতি একত্র হইল। লোকে জানে না তাই তাহারা বলে চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া-ছিলেন। হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণু লক্ষ্মী, সকলের মিল আছে, কেবল চৈতন্যের ভাগ্যে কি অমিল? সন্ন্যাসী চৈতন্য, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তোমার স্ত্রীকে তোমার পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিলাম, এখন কেন তোমাকে একাকী দেখিতেছি? তুমি কি কোমল নারীপ্রকৃতির প্রতি বিরক্ত হইয়াছ? হে ভক্তির অবতার, তুমি কি নারীপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠভূষণ ভক্তি ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পার? তোমাকে লোকে চিনে না, তাই তাহারা বলে তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছ। তোমার প্রিষ্ণুপ্রিয়া যে তোমার অন্তরে রহিয়াছেন।

সাধকের জীবনে যদি নরপ্রকৃতি ও নারীপ্রকৃতির মিলন না হয়, যদি প্রেম বৈরাগ্যের বিবাহ না হয় তাহা হইলে

পুণ্যশান্তি বহু দূরে। যদি মানুষ আপনাকে আপনি বিবাহ করিতে না পারে তবে পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া পাপাচার করে। যদি নিজের প্রাণের ভিতরে মনের মত নর নারী, নারী নর না পায়, তবে পুরুষ বাহিরে নারী খুঁজিবে, এবং নারী বাহিরে পুরুষ খুঁজিবে এবং পরিণামে দুর্নীতি ব্যভিচার উৎপন্ন হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে করিও না ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি বিবাহ করেন নাই, তাঁহারা হরিভক্তিরূপিণী পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। ইহাঁদিগের স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জাশীলা গোপনপ্রিয়া, ইহাঁরা স্বামীর প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া থাকেন, বাহিরের লোক ইহাঁদিগকে দেখিতে পায় না। ভক্তের প্রাণের ভিতরে সেই স্বর্গের স্ত্রী আসিয়া পতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন— "আমার নাম ভক্তি, তোমার নাম বৈরাগ্য, এস দুজনে বিবাহ করি।" ভক্ত আপনার স্ত্রী আপনি, আপনার স্বামী আপনি। প্রকৃত ভক্তজীবনে একাধারে নরনারী উভয় প্রকৃতির মিলন, এই রহস্য বুঝিয়া এবং জীবনে ইহা সাধন করিয়া জন্ম সার্থক কর।

মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী।

রবিবার, ২৫এ আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ১০ই অক্টোবর ১৮৮০।

একটি মৃত্তিকার পাত্রে সুবর্ণ ; পাত্রটি বন্ধ। এই অবস্থাতে সেই পাত্র প্রতিবৎসর আমাদের দেশে আসে। আধারের বাহ্য শোভা দর্শনে নরনারী মুগ্ধ হয়। আধারের মুখ বন্ধ, কেহই আধার খুলিয়া তাহার মধ্যে কি অমূল্য ধন আছে তাহা দেখে না। সিন্ধুকের ভিতরে কোটি কোটি মুদ্রা থাকিলেও চাবী বিনা তাহার সম্ভোগ অসম্ভব। সেইরূপ এই যে রত্নভরা মৃণ্ময় আধার বৎসর বৎসর আমাদের দেশে আসে, যাহাকে এই দেশের লোকেরা পূজা করে, ভক্তি করে, সেই আধারের ভিতরে যে চিন্ময়ী দেবী আছেন যোগ চাবী ভিন্ন তাঁহাকে খুলিয়া বাহির করিবার উপায়ান্তর নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দেবীস্থাপন, মাটীর ভিতরে মহেশ্বরী। কি আশ্চর্য্য ! ব্রহ্মাণ্ডপতি মৃত্তিকা মধ্যে! ভগবতী বাহির হইবেন মাটী-ভেদ করিয়া! মৃণ্ময় পাত্র অতি সুন্দর হইতে পারে, নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতে পারে ; সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু তাহার মধ্যে যে মহেশ্বরী বাস করেন কাহার সাধ্য তাঁহাকে দেখিতে পায়। যোগনেত্রবিহীন হইয়া কেহই মৃণ্ময় পাত্রে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। এই খেদ মনে রহিল বঙ্গদেশে যথার্থ ভগবতীকে সাধারণ লোকে পূজা করে না। আশ্বিন মাস আসিল, কত ঘরে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত

হইল, কিন্তু বঙ্গদেশে যথার্থ জগজ্জননীকে মা দুর্গা বলিয়া কেহ তো ডাকিতেছে না। বঙ্গদেশে পুতুল পূজা হইল, কিন্তু মার পূজা হইল না। যথার্থ মা মাটীতে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন।

কোথায় সেই সতী? সতীপূজা করিবার জন্য সকলেই আকুল। সতী পূজার জন্য মনুষ্যস্বভাব লালায়িত। মাটীর ভিতরে সতী কল্পনা করিব কিরূপে? হিন্দুস্থান কি প্রকৃত সতীপূজা ভুলিল? আমাদিগের পরমারাধ্যা দেবী সতী যাঁহার নাম, যাঁহার মধ্যে অনন্ত পতিব্রতা ও প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে, কৈ তাঁহাকে কে ডাকিতেছে? সেই আদ্যাশক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেমবিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময়ী জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই আখ্যায়িকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল তখনই সতী আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গা-চরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমলহৃদয়া সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম যাহা চিরকাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্ম-সমাজ জিজ্ঞাসা করিতেছে সেই সতী কোথায় যাঁহার পূজা করিলে যুগপৎ পুণ্য ও প্রেম লাভ করা যায়। সমুদয়

মানবপ্রকৃতি সেই সতীচরিত্র দেখিবার জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্ম-সমাজও অসতী কলঙ্কিনীদিগের পাপরাজ্য ছাড়িয়া সতীর দিকে যাইতে চায়।

যাঁহার নাম শ্রবণে জীবের পরিত্রাণ হয় যাঁহার পূজা করিলে অশুদ্ধ এবং অসুখী মনও শুদ্ধ এবং সুখী হয়, সেই সতীপূজা ভিন্ন ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এখন প্রশ্ন এই সেই সতী কোথায়? কেহ কেহ বলে এই আশ্বিন মাসে সেই সতী বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে মাটীর আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্ব-জননী সতী দেবী মাটী হইতে পারেন, কিন্তু মা মাটীর ভিতরে থাকিতে পারেন। যাহার ভক্তিচক্ষু আছে সে মাটীর ভিতরেও মাকে দেখিতে পায়, মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে চিন্ময়ী জননীকে দেখিতে পায়। মৃত মাটীর ভিতরে জীবনময়ী সতীকে উপলব্ধি করাই যোগতত্ত্ব। যদি মাটীর ভিতরে সতীকে দেখিতে তাহা হইলে যথার্থ দেবীপূজা কি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতে। সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্য-ময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি, মা নামে নারী স্বভাব ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন—"প্রকৃতি দেবি, তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।" মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের

প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ। যাহারা দুর্গা প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই।

প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এত কাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীর পূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকাপূজা হয় তাহাতে ভগবতী পূজা হয় না। যোগ সহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে, তাহার ভিতরে জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইহাঁরা যে তিন ব্যক্তি তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীই লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ইহাঁরা ভগবতীর এক একটি স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধন ধান্য ও সুখ শান্তি বিতরণ করিতে-ছেন, এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞান দান করিতেছেন।

ভারতবর্ষে আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর্ণ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ চিত্রকরেরা এই উপমা লইয়া দেব দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করে তখন উপমা

প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল উপমা ও প্রতিমা ভেদ করিয়া আসল জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান ততক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারেন না। কবি উপমা সৃজন করিল, চিত্রকর প্রতিমা গঠন করিল, ভক্ত এই উপমা প্রতিমার ভিতর হইতে আবার মাকে উদ্ভাবন করিলেন। আদিতে মা অন্তে আবার মা। যথার্থ মা দুই শ্রেণীর লোকের হাতে পড়িয়া দুইটি রূপ ধরিলেন, একটি কবির অলঙ্কার শাস্ত্রের উপমা, আর একটি চিত্রকরের নিকট প্রতিমা। মার সম্পর্কে উপমা পরিত্যাগ করা শাস্ত্রকারের সাধ্যাতীত। মার যে প্রকার রূপ গুণ তাহা দেখিলে কবিত্ব অনিবার্য্য। মার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলেই উপমা আবশ্যক হয়। যাই বলা হইল আদ্যাশক্তি ভগবতী অসুরকুলনাশিনীর অনেক শক্তি, তখনই কবি মাকে দশভূজারূপে বর্ণনা করিলেন; দশ হস্তে অলৌকিক বল প্রকাশ করিয়া মা অসুরকুল বধ করিতেছেন। যখন কবি অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে এই উপমা করিলেন, পার্শ্বে ছিল মূর্ত্তিনির্ম্মাতা, সে তৎক্ষণাৎ মার বাহু গড়িল, অমনি অসুরসংহারের মূর্ত্তি গঠিত হইল। কবির গ্রন্থে বর্ণিত উপমা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইল না, এই জন্য মনুষ্যস্বভাবের স্পৃহা পূর্ণ করণার্থ চিত্রকর উপমাকে চিত্রে পরিণত করিল। অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনি উপমিত হইলেন, চিত্রে

তিনি চিত্রিত হইলেন। জগজ্জননীর এক পার্শ্বে সরস্বতী অর্থাৎ শুভ্র জ্ঞান এবং অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্য-দায়িনী গৃহদেবী বিরাজ করিতেছেন। লোকে বলে লক্ষ্মী সরস্বতী জগজ্জননীর কন্যা, লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার কন্যা নহেন, ইহাঁরা তাঁহার সখী। কেননা জগন্মাতার জ্ঞান ও সন্তানপালনী শক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হিন্দুদিগের দুর্গা প্রতিমার মধ্যে এ সকল নিগূঢ় স্বর্গীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেবল যোগচক্ষেই এ সকল প্রকাশিত হয়, পৌত্তলিকেরা তাহা জানে না। উৎস জানে না তাহার ভিতর হইতে কেমন নির্ম্মল বারি প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুক জানে না তন্মধ্যে কত রত্ন আছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে জগজ্জননীর এই অপরূপ রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া এইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার ভিতরে কত অমূল্য রত্ন আছে বঙ্গদেশ দেখিল না। ভ্রান্ত বঙ্গদেশ, কেন তুমি মাকে উপমা ও উপমাকে প্রতিমা করিয়া জীবন্ত মাকে হারাইলে? যিনি ত্রিজগতের জননী তিনি কি মাটী হইতে পারেন? চিন্ময়ী মাকে, সতীকে, দেবীকে, জগজ্জননীকে কদাচ মৃণ্ময়ী ভাবিও না, তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে নিরাকারা আকাশ-রূপিণী জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা কর। লক্ষ্মী সরস্বতী মা হইতে ভিন্ন নহেন, এই দুই প্রকৃতি মাঁর স্বভাবের

মধ্যে সখীভাব ধারণ করিয়া আছে। যখনই মাকে দেখিবে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও দেখিতে পাইবে। মা তাঁহার জ্ঞান ও বাৎসল্য প্রকৃতি ছাড়িয়া ভক্ত সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। মাকে দেখিলে, মার পূজা অর্চনা করিলে, অথচ তোমার জীবনে অজ্ঞান অন্ধকার, দুর্ভাগ্য দুর্গতি রহিল ইহা হইতে পারে না। প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার সরস্বতী এবং লক্ষ্মী প্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্যজ্ঞান, প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন।

জ্ঞান ব্রহ্মপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য, যোগভক্তি, বিবিধ রহস্য, প্রত্যাদেশ, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন তখন তাঁহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। যাঁহারা প্রেমের সহিত ব্রহ্মপূজা করেন তাঁহারা জানেন যিনি দুর্গা তিনিই সরস্বতী; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম তিনিই জ্ঞানদাতা। মা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বলিতেছেন, আর গণেশ সে সমস্ত জগতে বিস্তার করিতেছেন। ভাবিবার জন্য জ্ঞানকে স্বতন্ত্র মনে করিতে পার, সরস্বতীকে ভগবতীর পার্শ্ববর্ত্তিনী মনে করিতে পার; কিন্তু বাস্তবিক ব্রহ্ম এবং তাঁহার জ্ঞান,

ভগবতী এবং সরস্বতী একই। যখনই সত্যভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যেমন দুর্গা দর্শন অমনই সরস্বতীরূপ দর্শন; যেমন ব্রহ্মদর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। জগজ্জননী যেমন অসুরসংহারিণী দুর্গা, তেমনি তিনি জ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী। যখন তিনি সত্য প্রকাশ করেন তখন তাঁহার সরস্বতী মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া উপমাকে প্রতিমা মনে করে, অলঙ্কারকে সত্য মনে করে তবে তাহারই দোষ।

জগজ্জননীর যে কেবল সরস্বতী এক সখী তাহা নহে, তাঁহার আর এক সখী লক্ষ্মী। যে ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা, শ্রীস্বরূপা। বিশ্রী দেবী, লক্ষ্মী বিহীন দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবনমোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয়মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয়, সেই নর নারীর লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু দশ হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের গৃহের সম্পদ বিপদ সকলই ঈশ্বর প্রেরিত। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়।

ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্মগ্রহণ করে নাই যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনী অবতীর্ণ হয়েন, তাহার সংসারে আপনা আপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়। যিনি ভক্তের আত্মার পাপ বিনাশ করেন, তিনি পার্থিব অকল্যাণও দূর করেন। কার্ত্তিক মূর্ত্তিরও অর্থ আছে। যে বাড়ীতে কার্ত্তিকের অধিষ্ঠান সে বাড়ীতে অলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্য আসিতে পারে না। কার্ত্তিক যুদ্ধের তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সরস্বতীর বিরোধী ও লক্ষ্মীর বিরোধী অকল্যাণ সমুদয় বিনাশ করেন। পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিনা মার জয় হয় না। কার্ত্তিক সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন, এবং মার ভক্ত-দিগকে রক্ষা করেন ও সত্যরাজ্য বিস্তার করেন। হে মূঢ় ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্ম পূজা করিলে অথচ তোমার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হইল না, তুমি অবিদ্যা পাপের উপর জয় লাভ করিলে না, তোমার শত্রুদল প্রবল রহিল, তবে তুমি কার্ত্তিকের পরাক্রম দেখিতে পাইলে না। তবে তোমার প্রকৃত মহাদেবী পূজা হয় নাই। সাধক, যদি তুমি ভগবতীর মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ এ সকল দেখিতে না পাও তবে তুমি হিন্দু নহ, ব্রাহ্ম নহ। যদি তুমি যথার্থ হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম হও, তবে যোগ দ্বারা পুতুলের বক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিন্ময়ী মা, তাঁহার সখী, এবং সন্তানদিগকে বাহির কর।

যে দিন তোমার স্তব স্তুতিতে ব্রহ্মপ্রসাদে তোমার চরিত্রে মাটীর দুর্গার পরিবর্ত্তে চিন্ময়ী দুর্গা প্রকাশিত হইবেন, সেই দিন তোমার দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইবে। মৃন্ময় সিন্ধুকের ভিতরে চিন্ময় পদার্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই সিন্ধুক খুলিয়া সতী দেবীকে বাহির কর, এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সেই জীবিতেশ্বরী সতী দেবীকে, অসুরনাশিনী, জ্ঞানস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী এবং শান্তি ও জয় প্রসবিনী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা কর। ব্রাহ্ম, তোমার হাতে ঈশ্বর প্রকাণ্ড ভার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি যোগ-সন্ধানে দুর্গা প্রতিমার ভিতর হইতে স্বর্গীয় রত্ন সকল বাহির করিয়া আপনি দেখিবে ও সম্ভোগ করিবে এবং তোমার হিন্দু ভাই ভগিনীদিগকে দেখাইবে। হিন্দুর ঘরের সিন্ধুক খুলিয়া তাঁহাকে তাঁহার সিন্ধুক ভরা রত্ন সকল দেখাইয়া মোহিত করিবে। মাটীর দুর্গা কেবল একটি সিন্ধুক, ইহার ভিতরে মা তাঁহার সখী এবং সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরাজ করিতেছেন। অতএব হিন্দুস্থান, মৃত মাটীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জীবিতেশ্বরী চিন্ময়ী মহাদেবীর পূজা কর।

জাতীয় বিধান।

রবিবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৮০২ শক; ১৭ই অক্টোবর ১৮৮০।

দেশীয় আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণে আমরা বার বার নমস্কার করি। আমরা তাঁহাদিগের উচ্চ প্রকৃতি ও তাঁহাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব অন্তরে উপলব্ধি করি। তাঁহাদের চরিত্র ও বিশ্বাসে, সাধন ও ভজনে যে সকল মহৎ ভাব আছে তৎসমুদয় তাঁহারা আমাদিগকে অর্পণ করুন। হে পিতা, পিতামহ আর্য্যগণ, তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধুতা প্রভৃতি যাহা কিছু সদ্‌গুণ আছে, সে সকল মহামূল্য ধন আমাদিগকে অর্পণ কর। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, যেমন তোমরা আমাদিগকে তোমাদের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী করিলে, তেমনি তোমরা আমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম ও সাধুভাবের উত্তরাধিকারী কর। হে মাতৃভূমি, হে হিন্দুস্থান, তুমি পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদত্ত প্রচুর ধনে ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সে সকল সঞ্চিত পুণ্যধন, প্রেমধন, আমাদিগকে দান করিয়া গৌরবান্বিত কর।

আমরা আর্য্য ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আর্য্যরক্ত যত দিন আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে থাকিবে তত দিন আমরা প্রাণপণে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিব এবং বিজাতীয় হইব না। আমি এ কথা বলিতেছি না যে স্বজাতীর পক্ষপাতী হইয়া আমরা স্বজাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, অধর্ম্ম, দুর্নীতি পোষণ করিব। আমি

কেবল এই বলিতেছি যে, যখন আমাদিগের নববিধানবৃক্ষ ভারতভূমিতে রোপিত তখন এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় থাকিবে এবং হিন্দু বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইবে; জাতির বিকার কদাপি হইবে না। পশ্চিম দেশ এবং ইংলণ্ড আমাদিগকে প্রকৃত সভ্যতাভূষণে ভূষিত করিবে, কিন্তু আমাদিগের হিন্দুস্বভাব ও চরিত্রের উপরে অন্য কোন জাতির অধিকার নাই।

বন্ধুগণ, যেখানে তোমাদিগের নববিধানের জন্ম হইল সর্ব্বাগ্রে তোমরা সেই পবিত্র ভূমিকে চুম্বন কর। এই বঙ্গদেশে নববিধানের জন্ম হইল, অতএব আমাদিগের উচিত সর্ব্বাগ্রে আমরা এই বঙ্গদেশের মাটীকে প্রণাম করি। বঙ্গদেশজাত এই নববিধানবৃক্ষ একদিন সমুদয় পৃথিবীকে ছায়া দিবে; কিন্তু সকলকেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই বৃক্ষ আদিতে বঙ্গদেশে রোপিত হইয়াছিল এবং ইহা মূলে হিন্দুজাতীয়। বঙ্গদেশে যে নববিধান রোপিত হইয়াছে এ ঘটনাকে আকস্মিক ঘটনা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে অবশ্যই ঈশ্বরের কোন গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে। পৃথিবীতে নানাবিষয়ে উৎকৃষ্টতর ও সভ্যতর এত দেশ থাকিতে ঈশ্বর দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে কেন এই স্বর্গীয় বীজ রোপণ করিলেন? এই বঙ্গদেশের মাটীতে উহা রোপণ করিলে বিধানবৃক্ষ যে এই দেশের মাটী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া এই দেশীয় লক্ষণাক্রান্ত হইবে ইহা কি

ঈশ্বর জানিতেন না? ঈশ্বর জানিয়াই নববিধানবীজ এই বঙ্গদেশে রোপণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান, আর্য্যস্থান যোগপ্রধান দেশ। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর জগতে প্রেমযোগ ভক্তি-যোগ বৃদ্ধি ও বিস্তার করিবার জন্যই এ দেশে এই নূতন ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছেন।

হিন্দুস্থান অনেক জাতির বাসস্থান; এ সকল জাতির ভিতরে ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। ঈশ্বর নববিধানকে বলিলেন —"নববিধান তুমি যাও, ঐ বাঙ্গালীদিগের সমাজে গিয়া তুমি জন্মগ্রহণ কর এবং তাহাদিগের জাতীয় ব্যবহারের মধ্যে তুমি বর্দ্ধিত হও।" ঈশ্বরাজ্ঞাতে এই তরুণ নববিধান বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই দেশের রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও তাঁহার নিজের হস্ত দ্বারা এই বঙ্গদেশে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই বঙ্গদেশের মাটী আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। ইহার ভিতরে সে সমস্ত গুণ আছে য হাতে এই বিধানতরু সম্পূর্ণ-রূপে বদ্ধমূল ও পরিপুষ্ট হইতে পারে। এই দেশ কিসের জন্য বিখ্যাত? কোমল প্রেম ও ভক্তির জন্য। দুঃখীদের জন্য একটি অতি সুমিষ্ট ধর্ম্ম চাই, এমন একটি সহজ ধর্ম্ম চাই যাহাতে সকলের অধিকার আছে। সাধারণের পক্ষে কঠোর তপস্যা কিংবা বেদ বেদান্ত পাঠ দ্বারা ধর্ম্ম অর্জ্জন করা সহজ নহে। এই জন্য দয়াময় হরি, স্নেহময়ী জগজ্জননী

এই বঙ্গদেশে কলিকালে এমন একটি সুলভ ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন যাহা সকলেই গ্রহণ ও সম্ভোগ করিতে পারিবে।

আর্য্যজাতিসম্ভূত এই বিধানবৃক্ষে জাতীয় মিষ্টতার সঞ্চার হইতেছে। আমরা যদি সেই মিষ্টতা গ্রহণ না করি তাহা হইলে আমরা হিন্দুজাতি ও বিধান উভয়েরই বিরোধী হইব। যদি আমরা এই নববিধানের জাতীয় বিশেষ লক্ষণগুলি স্বীকার না করি তাহা হইলে যে ভূমিতে বিধানবৃক্ষ জন্মিয়াছে সেই ভূমির নিকট আমরা অপরাধী হইব। সমুদয় জাতি হইতে আমরা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করিব, প্রত্যেক জাতির সাধু ভক্তদিগকে আমরা ভক্তি করিব; কিন্তু আমরা কদাচ বিজাতীয় হইব না। কোথায় মুসা, কোথায় সক্রেটিস্, কোথায় ঈসা, কোথায় মহম্মদ, ইহাঁরা বিদেশী হইয়াও আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের নববিধান, য়িহুদী, গ্রীক্ কিংবা মহম্মদীয় বিধান হইতে পারে না, ইহা মূলেতে হিন্দুবিধান থাকিবে। বিদেশীয় মহাত্মারা আমাদিগকে নানা সত্য শিখাইতেছেন। বিদেশীয় মুসা আমাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ শুনিতে উপদেশ দিতেছেন, বিদেশীয় সক্রেটিস্ আমাদিগকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন, বিদেশীয় ঈসা সৎপুত্র হইয়া স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, দূর দেশীয় মহম্মদ একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিতেছেন। অপরাপর বিদেশীয় মহা-পুরুষেরা স্বর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। ইহাঁদের

কাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না, অশ্রদ্ধা করিতে পারি না। কিন্তু এই নববিধান কোন একজনের পক্ষপাতী নহে, ঈশ্বরপ্রেরিত এবং ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপের প্রতিনিধি বলিয়া ইহা যাবতীয় সাধু মহাপুরুষদিগকে গ্রহণ করিতেছে। তাহা না হইলে আমরা যাত্রী হইয়া ইহাঁদিগের স্বর্গীয় ভবনে যাইতাম না। পরম পিতা ঈশ্বর কেমন নিগূঢ় স্বর্গীয় কৌশলে আমাদিগকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত সাধুদিগের নিকট লইয়া গিয়া নানা সদ্‌গুণে আমাদিগকে ভূষিত করিতেছেন। তিনি আপনি আমাদিগের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ঐ উজ্জ্বল চিন্ময় সন্তানদিগের নিকট লইয়া না গেলে আমরা আপনারা কদাপি তাঁহাদের কাহারও নিকটে যাইতে পারিতাম না। আমরা আপন ইচ্ছানুসারে অথবা নিজ বলে কোন সাধুর নিকটে যাই নাই; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

আমরা কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ নহি, আমরা কোন একজন সাধুর শিষ্যদলভুক্ত নহি। ঈশ্বর আমাদিগকে যেখানে লইয়া যান আমরা সেখানেই যাই। ঈশ্বরাদেশে যে কোন সাধু আমাদিগকে ডাকিবেন তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব। যখন একবার এ সকল সাধুদিগের আহ্বানে আহূত হইয়া ইহাঁদিগের ভবনে গিয়া ইহাঁদিগের সঙ্গে একত্র অমৃত পান করিয়াছি তখন বারংবার আমরা ইহাঁদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু

আমরা পৃথিবীর জেরুজেলেম, পৃথিবীর মক্কা মেদিনা, পৃথিবীর ম .রা বৃন্দাবন মানি না। আমরা স্বর্গনিকেতনে গিয়া ব্রহ্ম-ক্রোড়ে আশ্রিত সাধুদিগকে দর্শন করিব। সেখানে জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা নাই।

আমাদিগের নববিধান এক দিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক, আর এক দিকে তেমনি জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত। ইহা এক দিকে সমুদয় সাধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একগোত্র, একজাতি, একবর্ণ হইয়া গিয়াছে; আবার ইহা আপনার বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার করিবার জন্য আপনার জাতীয় স্বভাব, জাতীয় লক্ষণ রক্ষা করিতেছে। ইহা দেশীয় বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে স্কন্ধে রাখিয়া তাঁহাদের যশ কীর্ত্তন করে, কিন্তু ইহার বক্ষে হিন্দুশোণিত প্রবাহিত। অপর ধর্ম্মের বিজাতীয় বেশ পরিধান করাইয়া ঈশ্বর এই নববিধানকে প্রেরণ করেন নাই, ইহাকে তিনি জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া-ছেন। ঈশ্বরদত্ত এই বেশ আমরা চিরদিন রক্ষা করিব এই হিন্দুজাতীয় বৃক্ষ হিন্দুস্থানে খুব বদ্ধমূল হইলে, হিন্দুরক্তে খুব পরিপুষ্ট হইলে, তবে চারিদিকে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। আমরা ঈসা, মুসা, মহম্মদ সকলেরই প্রণত ভক্ত, কিন্তু জাতিতে আমরা চিরদিন হিন্দু থাকিব।

যেমন এক বৃক্ষের নানা শাখা, কিন্তু বৃক্ষের রস এক প্রকার এক জাতীয়, সেইরূপ এই নববিধানবৃক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শাখা, বিভিন্ন ধর্ম্মভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এই বৃক্ষের রস

হিন্দু। এই বিধানের দক্ষিণ হস্তে ইংরাজী বিদ্যা ও সভ্যতা, বাম হস্তে মুসলমান তেজ; কিন্তু ইহার রক্তে হিন্দুর যোগ ভক্তি, হিন্দুর কোমল প্রীতি। যিনি নববিধানের ব্রাহ্ম তিনিই প্রকৃত হিন্দু। কেন না যিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহার চরিত্রে স্বজাতীয় ভাব বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হয়। যিনি বেদ বেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে এবং মহাদেব দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর মুর্ত্তি হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিয়া লন এবং যিনি আপনার দৈনিক আচার ব্যবহারে ধর্ম্মের সাত্ত্বিক নিয়মাদি পালন করেন, তাঁহার ন্যায় যথার্থ হিন্দু আর কোথায় আছে? প্রকৃত ব্রাহ্ম হিন্দুসাগর মন্থন করিয়া তাহার মধ্য হইতে সমুদয় সার রত্ন গ্রহণ করিতেছেন, আর যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের খণ্ড খণ্ড ভাব গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত।

নববিধানের ভক্ত প্রকৃত হিন্দু। ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুবিরোধী জাতিচ্যুত বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা সঙ্গত নহে, সত্য নহে। বাস্তবিক ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত হিন্দু। এই দেশের মাটী হইতে এই নববিধান বৃক্ষকে কে উৎপাটন করিতে পারে? ঈশ্বর হিন্দুমাটী ও হিন্দুরক্ত লইয়া এই নববিধান গঠন করিয়াছেন, কাহার সাধ্য ইহাকে হিন্দুভাববিহীন করে? ঈশ্বর এই নববিধানকে আরও হিন্দুভাবে সুশোভিত করিবেন, এবং ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন সমুদয় রত্ন পুনরুদ্ধার করিবেন। হে নববিধানভক্ত, তুমি কি যোগী? তবে তুমি হিন্দু। তুমি বৈরাগী, তবে তুমি হিন্দু; তুমি ক্ষমাশীল, তবে তুমি হিন্দু;

তুমি মাতৃভক্ত, তবে তুমি হিন্দু ; তুমি দয়ালু, তবে তুমি হিন্দু। তোমার প্রাণের মধ্যে যদি ধ্যানপরায়ণতা, যোগ, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, কোমলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে তোমার রক্ত হিন্দু। তোমার প্রাণের চাবী খুলিয়া দেখিলাম, হে নববিধান-ভক্ত, তুমিই প্রকৃত হিন্দু। আরও যত তুমি উন্নত ব্রাহ্ম হইবে, তত তুমি প্রকৃত হিন্দু হইবে। যতই নববিধান প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম লক্ষণাক্রান্ত হইবে ততই ইহা বদ্ধমূল হইয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। হে ব্রাহ্ম, যতই তুমি হিন্দুর প্রকৃত ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, কোমলতা, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ রসে অভিষিক্ত হইবে ততই তোমার ধর্ম্ম জগতে আদৃত হইবে, যতই তুমি তোমার স্বজাতীয় আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় ধ্যান-পরায়ণ যোগী হইবে, শাক্যের ন্যায় নির্ব্বিকার নির্ব্বাণপ্রিয় হইবে, চৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইবে ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত আমেরিকা ইউরোপ চীন তাতার প্রভৃতি সমুদয় দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। যতই তুমি স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবে ততই নববিধান জাতীয় গৌরব ও বিক্রম লইয়া দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইবে।

রাজর্ষি ও দেবর্ষি।

রবিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০২ ; ৩১এ অক্টোবর ১৮৮০।

হিন্দুস্থানে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিতে ঋষিতে বিবাদ কেন ? ধর্ম্মরাজ্য তো শান্তির রাজ্য,

বিরোধবারণ ও শান্তিবিস্তার ধর্ম্মের লক্ষ্য। তাহাতে আবার হিন্দুজাতির জাতীয় একতা আছে, এবং ঋষিদিগের মধ্যে বিশেষ ঐক্য আছে। তবে ঋষিতে ঋষিতে বিবাদ কেন? ঠিক যেন বিপরীত ও বিরুদ্ধ ব্যবহার ঋষিরাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক ঋষি সিংহাসনে, অপর ঋষি পর্ণকুটীরে। এক ঋষি রাজা, তাঁহার নিকটে ধন রত্নের ছড়াছড়ি। আর এক ঋষি কি খাইবেন, কি পরিবেন, ঋষিপত্নী ঋষিকুমার, ঋষি-কন্যাদের কিরূপে ভরণ পোষণ হইবে, কিছুই জানেন না। আকাশ তাঁহার ধন, আকাশ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, আকাশ তাঁহার ঘর, আকাশ তাঁহার অশ্ব রথ। এক ঋষির চারিদিকে ভৃত্যের সংখ্যা নাই; নিয়ত জ্ঞাতি কুটুম্বস্বজনের কোলাহল; অসীম তাঁহার ধন সম্পত্তি, অসংখ্য তাঁহার অশ্ব রথ। আর একটি ঋষির পয়সা বা এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই। গিরি-গহ্বরে একাকী বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন, কিরূপে প্রাণ ধারণ হইবে কিছুই জানেন না, কিছুই ভাবেন না, সমাধি অবস্থায় তিনি বাহ্যিক জীবনের চিন্তা শেষ করিয়াছেন। এক ঋষি ব্যস্ত ও কর্ম্মশীল, আর এক ঋষি নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ। এক ঋষি সর্ব্বদা সংসারের কোলাহলের মধ্যে বাস করেন; আর একজন যেখানে লোকালয় নাই, গোল নাই, সেখানে গোপনে অবস্থিতি করেন। ধন সম্পদের প্রলোভন তাঁহাকে ব্যস্ত করিতে না পারে এজন্য তিনি সংসারকে দূরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বল, হে মহর্ষি, তুমি সংসারে রহিলে না কেন? বল, হে মহর্ষি, হে দেবর্ষি, আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ কেন? হে জনক, তুমি যে পথ ধরিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছ, মহর্ষিগণ সে পথে কেন চলেন না? তুমি রাজা হইয়া ঋষি, ঋষি হইয়া রাজা হইলে কেন? অন্যান্য ঋষিগণ দুঃখ দারিদ্র্য আশ্রয় করিলেন, তুমি সুখ সম্পদ লইলে কেন? এ বিরুদ্ধ ভাব কেন? কেহ কুটীরে দুঃখীর দুঃখ ভোগ করিতেছেন, কেহ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজার মান সম্ভ্রম, সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেছেন। হে ঈশ্বর, এরূপ প্রভেদ কেন বুঝাইয়া দাও। হে নববিধান, সমুদায় ধর্ম্মবিধানের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করা তোমার উদ্দেশ্য; পরস্পর বিরুদ্ধ ঋষিব্যবহারের আপাততঃ বিবাদ মীমাংসা করিয়া দাও। পর্ণকুটীর সৃজন করিয়াছেন যিনি, রাজসিংহাসনের স্রষ্টাও তিনি। টাকা কড়ি ধন সম্পত্তি যিনি পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তিনিই আবার পরীক্ষা বিপদে ভক্তকে ফেলেন। যত কিছু সামগ্রী সকলই ঈশ্বরের।

জগদীশ্বর জানেন কখন কাহার সম্বন্ধে কি প্রয়োজনীয়। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ আমাদিগের চিন্তার বিষয় নহে, তাহা ঈশ্বরের বিচিত্র বিধির অন্তর্গত। কখন কিসে কল্যাণ হয় তিনি জানেন। রাজসিংহাসনে বসা উচিত, অথবা গাছের তলায় বসা উচিত, তুমি তাহার কিছুই জান না। তুমি কার্য্যালয়ে গিয়া পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রম করিবে এবং স্বয়ং টাকা

উপার্জ্জন করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা ধর্ম্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিবে, তোমার কিসে মঙ্গল তুমি জান না। কোন্ সময়ে অর্থ উপার্জ্জন করা ধর্ম্ম, ঈশ্বর জানেন আমরা জানি না, সে বিষয়ের মীমাংসা তিনি করিবেন। কল্যাণের পথে থাকা, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কল্যাণের পথে রাখা, এই ঈশ্বরের আদেশ আমাদিগকে পালন করিতে হইবে। কিন্তু কিসে আমার এবং পরিবারের কল্যাণ হয় তাহা ঈশ্বরই জানেন। তিনি সিংহাসনে বসাইলেও কল্যাণ, পর্ণকুটীরে বসাইলেও কল্যাণ। কল্যাণের শাস্ত্র কেহ জানে না। ঋগ্বেদ জানে না, কঠোপনিষদ কি বলিবে? মহর্ষি ঈশা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই; শুকদেবও এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারেন নাই। হিন্দুস্থান ইহার কোন পরিষ্কার পথ দেখাইতে পারে না, ইংলণ্ডও এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে না। কল্যাণের শাস্ত্র কেবল ভগবান জানেন। তিনি মনুষ্যকে এ সম্বন্ধে কোন লিখিত শাস্ত্র বা সাধারণ বিধি দেন নাই। অবস্থাভেদে, লোকভেদে তিনি কল্যাণের বিশেষ বিধি প্রস্তুত করিয়া দেন। সময় বিশেষে আহার কল্যাণ, আবার কখন উপবাস কল্যাণ। চারি টাকা গ্রহণ কখন কল্যাণ, কখন চারি টাকা ব্যয় করা কল্যাণ। সুখ দুঃখ দুইই কল্যাণ। বিপদের দুই প্রহর রাত্রি, সম্পদের দ্বিপ্রহর দিবা, দুই কল্যাণ। সন্তান সন্ততি, বন্ধু বান্ধব লইয়া বাস করাও কল্যাণ, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া একাকী

গিরিশিখরে বাসও কল্যাণ। কল্যাণের বিধি পৃথিবীর কোন শাস্ত্রে নাই। এ স্থলে আচার্য্য গুরু পিতা মাতা সকলেই অনভিজ্ঞ। ঈশ্বর কেবল বলিতে পারেন তোমার আমার কিসে মঙ্গল হইবে।

এক দিকে দেবর্ষি যোগধর্ম্ম সাধন করিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করিলেন, আর এক দিকে রাজর্ষি রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন করতঃ ঈশ্বরের ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। কে তাঁহাদিগের দুইজনকে দুই স্থানে বসাইলেন? ঈশ্বর। ইহাঁরা দুই ভাই। একজন ঈশ্বরের আদেশে সিংহাসনে, আর একজন বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দুইজনই ঈশ্বরের অনুগত। একজন সপরিবারে সংসারে জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিলেন, ধন সম্পত্তি তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিল না, পৃথিবীর সমুদায় লোভের সামগ্রী মধ্যে তিনি নির্লোভ অবস্থায় থাকিলেন। দেখ, জনক হিন্দুস্থানে রাজা হইয়া প্রজা পালন করিলেন, তাঁহার মনের ভিতরে ধনের জন্য কিছুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। দেবর্ষি যেমন নির্লিপ্ত, তিনিও ধন জন সম্পদ ঐশ্বর্য্য মধ্যে তেমনি নির্লিপ্ত ছিলেন। টাকা পদার্থ আছে কি নাই, তাহা দেবর্ষি ও রাজর্ষি কেহই জানিতেন না। দুইজনেরই চিত্ত ব্রহ্মপাদপদ্মে নিবিষ্ট। সেখানে টাকা থাকা না থাকা দুইই সমান। পরমার্থে নশ্বর অর্থ বিলীন। ব্রহ্মপদে সংসার পদমর্য্যাদা স্থান পায় না। কল্যাণপ্রদ ব্রহ্মচরণে আশ্রয় লইলে সন্ন্যাসী সংসারী

উভয়েরই এক গতি হয়। রাজর্ষি দেবর্ষি ভাই হইয়া ধর্ম্মের দুই দিক পালন করিলেন। একজনের গায়ে রাজপরিচ্ছদ, আর একজনের গাত্রে বৃক্ষের বল্কল। একজন ঘোর সংসারী, আর একজন ফকীর। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মের ভিতরে যোগের অবস্থায় স্থিতি করা। বাহিরে দেখি খুব প্রভেদ। যেন ইনি এক ধর্ম্ম পালন করিতেছেন, উনি আর এক ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কিন্তু বাহির ছাড়িয়া ভিতরে যাই, দেখি যে মূলে একই ভাব। দেখিতে একজন রাজা, আর একজন দরিদ্র, কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখি, দুইয়েরই জীবনের মূলে বৈরাগ্য।

পৃথিবীর বৈরাগ্য ধনের মধ্যে বাস করিতে চায় না। সকলকে এক পথ—দুঃখ দারিদ্র্যের পথ—ধরিতে অনুরোধ করে, সংসার ছাড়িয়া পথে পথে উদাসীন হইয়া বেড়াইতে বলে। উহা রাজসিংহাসনকে বিষবৎ ঘৃণা করে, ধনকে নরক সমান মনে করে। হে জনক, তবে কি তুমি ঋষিকুলে কলঙ্ক দিলে, তোমার দৃষ্টান্ত কি অধোগতির কারণ? তুমি কি প্রবল আসক্তিবশতঃ সংসারকূপে ডুবিয়াছিলে? না। তাহা হইলে হিন্দুজাতিমধ্যে এত কাল তুমি ঋষি বলিয়া সমাদৃত হইতে না। হে রাজর্ষি, তোমার চরিত্রে বিলক্ষণ ঋষিলক্ষণ দেখিতেছি। তুমি ব্রহ্মের অনুজ্ঞায় কঠোর ধর্ম্ম পালন করিলে, ভয় প্রলোভনের মধ্যে প্রশান্তচিত্তে প্রকাণ্ড রাজ্যের কর্ত্তব্যভার বহন করিলে, ভয়ানক কোলাহল ও

ব্যস্ততার মধ্যে নিরন্তর যোগ সাধন করিলে। বর্ত্তমান সময়ে তোমার এই পথ দৃষ্টান্তের পথ। সত্য উপার্জ্জন করিতে হইবে, বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুসারে চলিতে হইবে, সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, এ সকল সম্বন্ধে তোমার নির্ম্মল দৃষ্টান্ত অতিশয় উজ্জ্বল। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া সংসারের মধ্যে ঋষি হইয়া কি প্রকারে থাকিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত তুমিই পৃথিবীকে দেখাইয়াছ। তুমি যদি ধনকে জয় না করিতে, ঋষি হইতে না। ধন ঐশ্বর্য্য, রাজ্যের আড়ম্বর, কার্য্যের ব্যস্ততা, এ সকলের মধ্যে যথার্থ ঋষিভাব না থাকিলে তুমি হিন্দুস্থানের ভক্তি কখন আকর্ষণ করিতে পারিতে না। হিন্দু ঋষিগণের মধ্যে সংসারী ও ধনলোলুপ হইয়া যদি যোগ-ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে, তবে, হে জনক, তোমার নাম ভারত-ভূমিতে চিরস্মরণীয় হইত না।

যাহারা সংসারমদে মত্ত হয়, ধনের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মস্তক উত্তোলন করে, সে সকল লোকের নাম ধর্ম্মপুস্তকে কি কখন স্থান পায়? এমন কোন্ লোকের নাম ভারতের ধর্ম্মইতিহাসে আছে? জনকের ছবি আজও ভারতবর্ষে উজ্জ্বল আছে। এমন পবিত্রাত্মা রাজা আর কোথায় আছে? ঋষি রাজা হইলেন কেন আমি জানি না, তোমরা জান না, হরি জানেন। রাজার ঘরে তিনিই মহাপুরুষ প্রেরণ করেন, সিংহাসনে তিনিই যোগীকে বসান। হরির কি

ইচ্ছা কে জানে? জনকের ধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম ছিল না। বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করা কত কঠিন? কিন্তু জনক কি কিছুই ভাবিতেন, সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বর সমাধা করিতেন। ভাবিয়া কি এত বড় ধর্ম্ম কেহ সাধন করিতে পারে? রাজভবনে ভিখারী, বিপুল ধন সম্পত্তির মধ্যে সরল বালকের ন্যায় ব্যবহার! এ কি সহজ ব্যাপার! কিন্তু দেবকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তিনিই দেবর্ষি, মহর্ষি প্রস্তুত করেন।

কিরূপে সন্তান পালন করিব, কিরূপে কর্ত্তব্যভার বহন করিব, এ সকল বিষয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। কল্য কি খাইব, কল্য কি পরিব, এ বিষয়ে যে চিন্তা করে সে কখন বিশ্বাসী নহে। হরি যাহা করিবেন, সে বিষয়ে আমরা কেন চিন্তিত হইব? সে চিন্তায় হরির নামে কলঙ্ক পড়ে। যে ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করে সে ঈশ্বরের পদ আপনি গ্রহণ করে। যে সংসারে খাইবার পরিবার ভার মানুষ আপনার হস্তে লয়, সে সংসার ছারখার হইয়া যায়। বিষয়চিন্তা করিয়া টাকার ভাবনা ভাবিয়া কে কি করিতে পারে? কেহ কি আপনি ভাবনা, চেষ্টা দ্বারা সোপান লাগাইয়া রাজসিংহাসনে উঠিতে পারে? ঈশ্বর পারিলেন না, তিনি পরিবারের সকলকে কষ্টে ফেলিলেন, অতএব নিজ বুদ্ধিতে বিষয় কর্ম্ম চালাইব, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ব্যক্তি করিল, সে আপনি ঈশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল, ঈশ্বরকে

পদচ্যুত করিয়া আপনি সেই পদ গ্রহণ করিল। ঈশ্বরকে আর তবে কার্য্যভার দেওয়া উচিত নয়। যে নরাধম এরূপ ভাবে, সে ঘোর অবিশ্বাসী।

ঈশ্বরের হাতে ভার রাখিয়া সম্পন্ন ও ধনশালীর অবস্থাতে জনক রাজার ন্যায় হও, এবং পর্ণকুটীরবাসী দুঃখীর অবস্থাতে দেবর্ষি মহর্ষিগণের ন্যায় সাত্বিক জীবন যাপন কর। যখন পর্ণকুটীরে, তখন যদি ঈশ্বরের দূত রাজহস্তী লইয়া আইসে, তখনই তাহাতে আরোহণ কর। ঈশ্বর রাজসিংহাসনে বসাইতে আহ্বান করিলেন যাও, সেখানে গিয়া যোগবলে দশ সহস্র প্রজা পালন কর। দেবর্ষি পর্ণকুটীর ছাড়িয়া সিংহাসনে বসিলেন; তাঁহার শরীর সিংহাসনে আরূঢ় হইল বটে, কিন্তু তাঁহার মন সেই পর্ণকুটীরেই স্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার পক্ষে প্রজাপালন এবং নিমীলিত নয়নে ধ্যান একই। তাঁহার মনে কিছুই বিকার হইল না। যিনি যোগবলে ব্রহ্মপাদপদ্ম লাভ করিয়াছেন তিনি পবিত্র ভাবে দশ হাজার প্রজা পালন করিতে পারেন। রাজর্ষি জনক সিংহাসনে বসিয়া কৃতার্থ হইলেন, সর্ব্বত্যাগী শুক লজ্জিত হইলেন কি আশ্চর্য্য! শরীর যাঁহার সিংহাসনে, মন যাঁহার ধন মান ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, তাঁহার আত্মা বৈরাগ্য ও যোগবলে সংযত। ফলতঃ দেবর্ষি রাজর্ষির বাহিরে প্রভেদ। একজন সংসারী হইয়াও সংসারী নহেন। দুইই চিন্তা-বিহীন, পাখীর ন্যায় দুইজনই নিশ্চিন্ত। সংসারের ভার

দুইজনের মধ্যে একজনের মস্তকেও নাই। স্বয়ং ঈশ্বর দুইজনকেই রক্ষা করেন। দুইজনেরই দাসভাব। ঈশ্বর বলিলেন বলিয়াই তাঁহারা দুইজনে দুই প্রকার জীবন অবলম্বন করিলেন। ইনি দেবর্ষি হইয়া একাকী নির্জ্জন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, উনি রাজর্ষি হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন ও পালন করিলেন।

হরি কাহাকে কখন কি করান কে জানে? রাজ-সিংহাসনে বসিয়া প্রজাপালন, দীন ভাবে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কঠোর ব্রত পালন, এ সকল কেবল আমাদের হরির খেলা। ভক্তেরা ইহার মধ্যে নিয়ত হরির প্রেমলীলা দেখেন। হরি আরও লীলা দেখাইবেন। হে ব্রহ্মভক্ত, ধনী হওয়াও ধর্ম্ম নহে, দরিদ্র হওয়াতেও ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিবেন, সে তাহাই করিবে; তাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। তিনি আজ্ঞা করিলে রাজকার্য্য করিব, প্রজা পালন করিব; তিনি আজ্ঞা করিলে বনচারী যোগী, হইয়া থাকিব। তাঁহার আদেশে সকলেরই ঋষি হইতে হইবে। ধনীও ঋষি, নির্ধনও ঋষি। উদাসীন ফকীরও ঋষি হইতে পারে, সংসারী ধনী বহু সম্পত্তির অধিকারীও ঋষি হইতে পারে। কেহ গৃহস্থ ঋষি হও, কেহ উদাসীন ঋষি হও। যাঁহার প্রতি বিধাতার যেরূপ আজ্ঞা তিনি সেই ব্রত গ্রহণ করুন। ব্রাহ্ম, প্রতারিত হইও না। যদি তাঁহার আদেশ না পাও, জঙ্গলে গিয়া কঠোর তপস্যা করিলেও অভিমান অহঙ্কারে

তোমার সর্ব্বনাশ হইবে; আবার যদি সংসারে বসিয়া ভিতরে লোভ চরিতার্থ করিয়া বাহিরে লোকের নিকটে জনকের ন্যায় দেখাইতে যাও, তাহা হইলেও তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ঈশ্বর তোমাকে যেখানে রাখেন সেইখানে থাক, মনকে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর শাসনে রাখ। ঋষি হওয়া তোমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য, হয় রাজর্ষি কিংবা দেবর্ষি। আমাদিগের যাহার প্রতি যে আদেশ, যে বিধি তাহা পালন করিয়া যেন আমরা ঋষিজীবন ধারণ করি। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগের জীবনে তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করুন।

নিত্য ও অবতীর্ণ ব্রহ্ম।

রবিবার, ২৩এ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক; ৭ই নবেম্বর ১৮৮০।

নিত্য ব্রহ্ম এবং অবতীর্ণ ব্রহ্ম এ দুয়ের সামঞ্জস্য কে করিতে পারে? নববিধান। ব্রহ্মের এক বিশেষণ নিত্য, আর এক বিশেষণ অবতীর্ণ। দুই বিশেষণের সংযোগে নিত্য অবতীর্ণ ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়। এ দুয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব কেবল নববিধান বুঝাইয়া দিতে পারে। আমাদিগের দুর্ভাগ্যই হউক আর সৌভাগ্যই হউক, আমরা দুই পাঁচটি অবতার মানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অবতার মানিতে হইলে আমরা কোটি কোটি অবতার মানিব, নতুবা একটিও মানিব না। বাস্তবিক দশটি অবতারে চলে না। দশটি অবতারে

ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা হয় না। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম দশটি অবতারে পৃথিবীর সকল অভাব মোচন হয় না। কথিত আছে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অসুর বধ করিবার জন্য। প্রতি দিন সংসারে এত অসুরের উপদ্রব হইতেছে, প্রতি দিন জগতে এত প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে যে, ঈশ্বরের প্রত্যহ অসুরসংহার ও ব্যাধিপ্রতীকারের জন্য অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। বহু শতাব্দীর পর এক একবার আসিলে চলে না। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রত্যহ তাঁহার অবতরণ আবশ্যক। তোমার আমার মনের ভিতরে অসুরেরা নিয়ত আক্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য বারংবার তাঁহার আসা উচিত। তোমার আমার রোগ, অমঙ্গল দূর করিবার জন্য একবার নয়, দুইবার নয়, দশবার নয়, দিনে চব্বিশ ঘণ্টা, প্রতি মিনিটে আসিতে হইবে।

বাস্তবিক সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরকে যে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন তাতার এ দেশে ও দেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক কাঁদিতেছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে কত বার স্বর্গ হইতে সংসারে আসিতে হয়, পাপবিমোচন কার্য্যে তাঁহার দিবা রাত্রি ব্যস্ত থাকিতে হয়। এরূপ ঈশ্বরকে কথন নিষ্ক্রিয় বলিতে পার না। দেখ তাঁহার হাতে কত

কাজ। তোমার আমার প্রার্থনা শুনিয়া প্রার্থিত বস্তু দিতে হইবে, দশটি লোকের দশ প্রকার অবস্থা অনুসারে রোগের প্রতিবিধান করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তে দশ কোটি পাপীর কথা শুনিতে হইবে ও উহার উত্তর দিতে হইবে, অসংখ্য অগণ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। এরূপ একদিন নয়, দুই দিন নয়, নিত্যকাল বিশ্বস্থিত সমুদয় জীবকে তাঁহার সাহায্য দান করিতে হইবে। এ সকল ভাবিলে মনে হয়, তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই, তিনি একদিনের জন্যও শান্ত নহেন, কেবল সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় দিন রাত্রি খাটেন।

কোথায় প্রহ্লাদ ভয়ানক অত্যাচারে উৎপীড়িত, কোথায় ধ্রুব জঙ্গলে পড়িয়া ভীষণ জন্তুর ভয়ে কাঁদিতেছে, কোথায় কোন্ নিরাশ্রয় ভক্ত আহার বিনা ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছে, কোথায় কোন্ জ্ঞানী সাধক তর্কতরঙ্গে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে, কোথায় কোন্ প্রেমিক ব্রহ্মের অদর্শনযন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়াছেন, কোথায় কোন্ নারী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া "কোথা হে অবলাবান্ধব" বলিয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছে, কোথায় এক এক নগর, এক এক দেশ, রোগ শোকে মৃতপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতেছে, কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় রাজ্য-বিপ্লব উপস্থিত, এ সকল সংবাদ নিয়ত তাঁহাকে লইতে হইবে। কত তাঁহার কাজ, কি ভয়ানক তাঁহার ব্যস্ততা! অথচ তিনি শান্ত ও নির্ব্বিকার। প্রতি মিনিটে তিনি সংসারে

অবতীর্ণ, প্রতি মিনিটে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়, গৃহের লক্ষ্মী হইয়া, রাজ্যেশ্বরী হইয়া, পরলোকের অধিপতি হইয়া, তাঁহাকে কত কার্য্য, কত বিধান করিতে হয়, অথচ তাঁহাতে কিছুমাত্র চিন্তা নাই, চিত্তচাঞ্চল্য নাই, বিকার নাই। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার শান্তস্বরূপ। তিনি ভাবেন না, তিনি কাজ করেন না। তবে তিনি কি করেন? আপনার মহিমাতে বসিয়া থাকেন। তবে কি তিনি আহার দেন না? রোগের প্রতীকার করেন না? পাপী চীৎকার করিলে তাহা শ্রবণ করেন না? তৃষ্ণায় কাতর হইলে তিনি কি জল দেন না? তিনি এ সমুদায় করেন না তো কে করে? আমাদিগের উদ্যানে যে তৃণ জন্মে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার মূলে কে প্রতি দিন জল সেচন করে? বাগানে গিয়া স্বচক্ষে দেখ সেই জগৎকর্ত্তা স্বয়ং সূক্ষ্ম প্রণালী দিয়া তৃণেতে জল সিঞ্চন করিতেছেন। এমন যে সামান্য তৃণ ইহার প্রতি ব্রহ্মাণ্ড-পতির এত দৃষ্টি! প্রত্যেক সূর্য্য কিরণকে তিনিই বহন করিয়া পৃথিবীতে আনেন, এবং তোমার আমার দ্বারে উপস্থিত করেন। কে এই আলোক সকলকে গৃহে আনয়ন করেন? স্বয়ং ভগবান্। এই ব্রহ্মমন্দিরে দুই শত লোক যদি প্রার্থনা করেন, কে তাঁহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন? ভগবান।

তবে তো তাঁহাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়! প্রহ্লাদকে পর্ব্বত হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাকে বিষপান

করাইবার চেষ্টা হইতেছে, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতেছে, ঈশ্বর কি এ অবস্থাতে উদাসীন থাকিবেন? তিনি কি ভক্তবৎসল নহেন? তিনি অবশ্য ভক্তকে ক্রোড়ে করিয়া বক্ষে ধারণ করিবেন। যেথানে যে ভক্ত উৎপীড়িত হন তিনি তাহাকে নিজ অভয় ক্রোড়ে ধারণ করেন। সংসারের বিপদ, আপদ, অকল্যাণ তিনি স্বয়ং নিবারণ করেন। তিনি সকলের বাড়ীতে যান। কত লোককে তাঁহার আহার দিতে হয়, এবং নিজ হস্তে রন্ধনের কার্য্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিতে হয়। কত হাসপাতালে তাঁহাকে রোগী দেখিতে যাইতে হয় এবং কত প্রকারের ঔষধ দিয়া বিভিন্ন রোগের প্রতীকার করিতে হয়। কত দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে হয়। ঈশ্বরের স্কন্ধে এত ভার, তাঁহার এত কার্য্য। এক দিকে পুরাণ এই কথা বলিলেন, আর এক দিকে বেদ বলিলেন, "পুরাণ, তুমি চুপ কর, ঈশ্বর ব্যস্ত বলিয়া চীৎকার করিও না, কুতর্ক করিও না। ঈশ্বর শান্ত।" উপনিষৎ নিয়ত বলেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

ঈশ্বর যদি শান্ত, তবে তিনি কি কখন কখন মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও অসুরবিনাশজন্য অবতীর্ণ হন? বেদ বলিলেন না, তলবকারোপনিষৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, বড় বড় বেদান্ত শাস্ত্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তিনি কিছুই করেন না। পুরাণে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির সাময়িক লীলা বর্ণিত আছে। আধুনিক পুরাণে ঈশ্বর প্রতি দিন প্রতি জনের গৃহে

অবতীর্ণ। তিনি কৃষকের ক্ষেত্রে ধান্য, নদীতে জল, গৃহস্থের ঘরে ধন সম্পদ স্বয়ং উৎপাদন করেন। সমুদ্র হইতে বাষ্প তুলিয়া তিনি মেঘ সৃষ্টি করেন। সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া পুনরায় জল সমুদ্রাভিমুখে লইয়া যান। জ্ঞান, বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে প্রত্যেক শক্তিতে ঈশ্বরের শক্তি নিহিত। ইহার মতে দশ অবতার নহে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি অবতার। প্রত্যেক ভৌতিক ও মানসিক শক্তিতে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সমুদয় শক্তিকে এক শক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সকল বস্তুর মূলশক্তি ভগবান, সকলের মূলে এক শক্তি। ঐ শক্তি সদা ব্যস্ত হইয়া সকল বস্তুর ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে। এখন বল, ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় না ক্রিয়াশীল? বেদ পুরাণ সংগ্রাম করিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে নববিধান উপস্থিত। বেদ পুরাণের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। বেদ বলিতেছে ঈশ্বর কিছুই করেন না। বেদের এক মত, পুরাণের আর এক মত। বেদের ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কর্ম্মশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মশীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? নববিধানের ভক্ত ইহার মীমাংসা করিবেন, তিনি ইহার সঙ্কেত বুঝিয়াছেন। সৃষ্টি করিবার সময়ে ঈশ্বর সুকৌশলে সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিলেন। তিনি সৃষ্টির ভিতরে কল্যাণের মন্ত্র পড়িয়া দিলেন। সৃষ্টি নিয়ত জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছে। যিনি যে সময়ে

অধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কাঁদিবেন, নিশ্চয় ভগবান তাঁহার কাছে বর্ত্তমান। তবে কি তিনি অবতীর্ণ? না, তিনি সমুদয় ঘটনার মধ্যে জাজ্বল্যমান। অবতরণ কিছুই নহে, অপ্রকাশ ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর অবতার হইয়া পৃথিবীতে আসেন, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় নিজ হাতে খাওয়ান ইহা সকলি অলীক।

ঈশ্বরের সমুদয় সৃষ্টি মধ্যে যত বস্তু আছে সমুদয় কল্যাণ নিয়মে সৃষ্ট। এমনি সুনিয়মে সমুদয় ঘটনা সংযুক্ত আছে, ঠিক যখন ভক্তের যাহা দরকার তখনই তাহা আসিবে। কুতার্কিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে কেন বল অমুক বস্তু ঈশ্বর আনিয়া দিলেন? ভক্তের উত্তর এই, ঈশ্বরের বাহু নাই, মনুষ্যের ন্যায় তিনি ভুজবলে কার্য্য করেন না, অথচ তিনি কাজ করেন। লক্ষ লক্ষ তাঁহার বাহু সৃষ্টির মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশ, বাতাস, জল স্থল, বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু, সমুদয় তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাঁহার কর্ম্মসাধনের যন্ত্র। ইহারা সকলে বিশ্বাসী ভক্তদিগের সেবা করে ও আশ্চর্য্যরূপে জগতের কল্যাণ সাধন করে। আমি পাপে পড়িয়া অস্থির হইয়াছি, একজন সাধু বন্ধুর প্রয়োজন। অমনি ঘটনাযোগে একজন বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে তিনি কেন আসিলেন কেহ জানে না। অনেকে বলিল আকস্মিক ঘটনা, আমি মানিলাম না। আমি মদের বোতল ধরিয়াছিলাম, এক

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চিরজীবনের জন্য সর্ব্বনাশ হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী, এই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। শুভক্ষণে একজন বন্ধু আসিয়া সুরাপান হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিলেন। কে তাঁহাকে পাঠাইলেন, কি নিয়মে ঘটনাটী ঘটিল কিছুই বুঝিলাম না। প্রলোভন কাটিয়া গেল। আমি ভাল হওয়াতে শত শত লোকের কল্যাণ হইল। এক মিনিটের মধ্যে আমার সর্ব্বনাশ হইত, তাহা না হইয়া সহস্র লোকের মঙ্গল হইল, মদ খাওয়া সমাজ হইতে উঠিয়া যায় এজন্য আমি যত্নবান হইলাম। আমি একজন সমাজসংস্কারক হইলাম, ধর্ম্মপরায়ণ হইলাম, ধনের প্রলোভন ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলাম, একজন প্রকৃত ভক্ত হইলাম, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পরিণামে সাধকব্রত গ্রহণ করিলাম এবং প্রচারক হইয়া কত লোকের উপকার সাধন করিলাম। তোমাদের মধ্যে কত লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কে বলিতে পারে?

সমস্ত দেশের জ্ঞান ধর্ম্মের বিপ্লব হইল, সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিলেন। কেহ বলিল এইটি আকস্মিক, কেহ বলিল ঈশ্বর ঐ সাধুকে প্রেরণ করিলেন। বাস্তবিক ঘটনা ঘটনার পিতা, ঘটনা ঘটনার মাতা। বিশেষ কতকগুলি ঘটনা হইলেই অমনি মহাপুরুষের জন্ম হয়, এবং তাঁহার চেষ্টায় দেশ উদ্ধার হয়। শতাধিক ঘটনা একত্র হইয়া একটি আন্দোলন হইল, সেই মহা আন্দোলন দশটি

রাজ্যকে স্কন্ধে লইয়া ব্রহ্মদ্বারে উপস্থিত করিল। তোমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহা কত ঘটনার ফল স্মরণ করিয়া দেখ। একটীর পর একটী কেমন আশ্চর্য্য সূত্রে ঘটনাগুলি ঘটিল, তাই তোমরা ব্রাহ্ম হইলে। তোমরা পাপমদে নয় অবিশ্বাসমদে অন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছিলে, মরিতে, আজ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া পূজা করিতে না। সম্মুখস্থ নরক হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইলে? এ স্থলে সকলেই বলিবে, ইহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচিল। কে আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিত, কে ভাল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, কে ভ্রাতা ভগিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মনাম গানে সুখী হইত, যদি সেই শুভক্ষণে মন ফিরিয়া না যাইত। তোমার আমার সকলেরই এইরূপ ঘটিয়াছে।

ঈশ্বর আকাশকে, বাতাসকে, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে বলিয়া দিয়াছেন, দেখ ব্রহ্মাণ্ড, যখনই ভক্ত কাতরভাবে ডাকিবে, তুমি সেবক হইয়া উপস্থিত হইবে, এবং কাম্য বস্তু সমুদয় বিধান করিবে। দেখিও আমার কল্পতরু নামে যেন কলঙ্ক না হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, সমুদয় বস্তু আমার মঙ্গলময় নাম রক্ষা করিও। ধর্ম্মের জন্য একজন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল, দুইটি পয়সা নাই যে সে তদ্দ্বারা অন্ন আহার করে, এমন স্থান নাই যে তথায় মস্তক আচ্ছাদন করে, কোথা হইতে অন্ন বস্ত্র ঘর সকলই আসিল, কেহ জানে না। সন্তান সন্ততির ধর্ম্ম উপার্জ্জন, বিদ্যা উপার্জ্জন, শুভ বিবাহ কোথা হইতে

কিরূপে হইল কে জানে? এখান হইতে পাত্র আসিল, ওখান হইতে কন্যা আসিল, বিবাহ হইল। সমুদয় মানুষ ঘটাইল কিংবা অকস্মাৎ হইল, লোকে এরূপ বলে। আজ অর্থ নাই, অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তি অনুগ্রহ করিল, এবং আমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলাম তাই অর্থ আসিল। সকলেই আপন আপন গুণের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সকলেই মনে করিল আমরা কর্ত্তা হইয়া সমুদয় করিলাম। ভিতরে ভিতরে কিরূপে কি ঘটিল কে ঘটাইল কেহ জানিতে পারিল না।

ধর্ম্মের জন্য ধ্রুব রাজ্য পাইল; শত অত্যাচারেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না। ভক্তকে বধ করিবার জন্য সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলী সজ্জিত হইল, কত লোক অপমান করিবার জন্য উদ্যত হইল, ঈশ্বরের সন্তানের অমঙ্গল সাধন করিবার জন্য কত আয়োজন হইল; কিন্তু পরিণামে বিপরীত ফল ফলিল। সূর্য্য যদি সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদয় সমুদ্র যদি শুকাইয়া যায়, সাধ্য কি ভক্ত সন্তানের কেহ অকল্যাণ সাধন করিতে পারে? যুগে যুগে এ কথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ভক্তের অমঙ্গল হইবে না, হইতে পারে না, অমঙ্গল নিশ্চয় অসম্ভব। সৃষ্টির সঙ্গে ভক্তের কল্যাণ মিলিত হইয়া রহিয়াছে। নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব, জন্তু, সকলে ভক্তের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য একতাবদ্ধ। প্রহ্লাদের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর অস্ত্র লাগিবে না, প্রকাণ্ড হস্তীর পদতলে

ফেলিয়া দাও, হস্তী তাহাকে পদদ্বারা দলন করিবে না। ধ্রুব বনে গিয়া ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত, কিন্তু ব্যাঘ্র কখন তাহাকে বিনাশ করিবে না। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা গল্প বটে, কিন্তু উহার ভিতরে নিগূঢ় সত্য আছে। পৃথিবী ভক্তের অকল্যাণ কিছুতে করিতে পারিবে না। অন্যের নিকটে যাহা ভয় ও মৃত্যু তাহা সাধকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। অত্যন্ত ভীষণ ব্যাপারও ভক্তকে ভয় করে। ঈশ্বর এ নিয়ম ঠিক করিয়া দিয়াছেন, ইহার অন্যথা কদাপি হয় না। এই নিয়মে সৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া ভগবান সংসার চালাইতেছেন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন। তাঁহার হাতে কিছু করিতে হয় না। ব্রহ্ম ভিতরে কোথায় আছেন কেহ জানে না। তিনি শান্ত, সত্য শিব সুন্দর, পূর্ণ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। তাঁহার কোন কার্য্য নাই, চিন্তা নাই। কি করিতে হইবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। জগতের যাহা হয় হউক, মরে মরুক, এ ভাবে তিনি নিশ্চিন্ত নহেন। সংসার নষ্ট হয় হউক, পরিবার রোগে আক্রান্ত হয় হউক, ইহা বলিয়া কত লোকে বিরক্ত ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে চলিয়া গেল। ঈশ্বর এরূপ বিরক্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন নহেন। তিনি মঙ্গল নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভক্তের মঙ্গল হইবে, নিয়ম ক্রমে মঙ্গল হইবে, অকস্মাৎ নহে, কিন্তু অনিবার্য্য নিশ্চিত বিধি অনুসারে।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা বিশ্বরাজ্য

চালাইতেছেন। মানুষের ন্যায় তাঁহার সাময়িক চেষ্টা বা ব্যস্ততা নাই। তিনি নির্ব্বিকার থাকিয়া নিত্যকাল সমভাবে সৃষ্টির যাবতীয় শক্তিদ্বারা কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন। অন্ধ নিয়ম কিছু করে না, বিশ্বের স্বতন্ত্র শক্তিও কিছু করিতে পারে না। হঠাৎ কল্যাণ হয় না। নিত্য নিয়মে ব্রহ্ম প্রেমরাজ্য পালন করেন। সমুদায় ঘটনাচক্র কল্যাণ বহন করিতেছে। এক অন্ধকার গ্রামে বসিয়া একজন প্রার্থনা করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার অভাব পূর্ণ হইল। ঈশ্বর এক স্থান হইতে অপর স্থানে আসিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া দিলেন এবং মানুষকে খাওয়াইলেন, এরূপ মনে করিও না। তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে বেড়ান না। এ কার্য্য একবার ও কার্য্য একবার করেন না। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর তোমার মুখে, আমার মুখে প্রকাশ্যরূপে অন্ন তুলিয়া না দিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়া অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি গূঢ় নিয়মে আমাদের সমুদায় অভাব মোচন করিতেছেন। নগর সহর দেশ গ্রাম সর্ব্বত্র কল্যাণের রাজ্য। শান্ত নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের পূজা করিব অথচ তাঁহাকেই আমরা ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্বমধ্যে নিগূঢ় কল্যাণের কৌশলে কার্য্যের স্রোত নিয়ত চলিতেছে। সেই কল্যাণের কৌশল নিপীড়িত ভক্তকে সুখী করে ও সত্যকে জয়ী করে।

রুচি।

রবিবার, ৩০এ কার্ত্তিক, ১৮০২ শক; ১৪ই নবেম্বর ১৮৮০।

শরীরে যেমন মনেও তেমনি অরুচি ব্যাধির লক্ষণ। শরীরকে রোগ হইতে রক্ষা করা যেমন উচিত, অরুচি হইতেও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা তেমনই উচিত। কেন না চিকিৎসা-শাস্ত্রে অরুচি একটি রোগ, এবং অনেক রোগও অনিষ্টের মূল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যদি ভাল বস্তুর প্রতি তোমার রুচি না থাকে তবে নিশ্চয় জানিবে বিকার উপস্থিত। হে, আত্মন্! তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ, ধর্ম্মের প্রতি, পরলোকের প্রতি, ব্রহ্মপাদপদ্মের প্রতি তোমার অরুচি হইয়াছে কি না? যদি অণুমাত্র অরুচি হইয়া থাকে তোমার লক্ষণ ভাল নয়। প্রচারক হও আর বহুমানাস্পদ আচার্য্য হও, তোমার উচ্চ পদ মান সম্ভ্রম এ অনিষ্ট হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অনেকে রুচির সহিত ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শেষে অরুচিজন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। প্রথমাবস্থায় পূজা অর্চ্চনায় অনুরাগ থাকে, আকর্ষণ থাকে, কিন্তু দেখা যায় শেষে আর উহা তত প্রবল থাকে না। প্রতি দিন রুচি সহকারে উপাসনা ও নাম কীর্ত্তন করা সকলের ভাগ্যে হয় না। এ সকল চিরদিন ভাল লাগা অনেকের সম্বন্ধে দুর্ঘট। ধ্যান করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা, পুণ্যবান হইবার জন্য স্পৃহা, সত্যবাদী হইবার জন্য প্রগাঢ় রুচি, ইহা

সকল ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও উপাসনাদির প্রতি রুচি চলিয়া যায় কেন? বাসনা, কামনা, স্পৃহা ও তৃষ্ণা বলবতী না থাকিলে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণ না থাকিলে তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পাপ পরিহার করা হইল, ব্রহ্মসাধন করা হইল, নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন উপাসনা করা হইল, অনুষ্ঠান করা হইল, সময়ে সময়ে একান্ত মনে পবিত্র হইবার জন্যও চেষ্টা করা হইল, সকলই হইল, কিন্তু উচিত মনে করিয়া হইল, আকর্ষণ বা অনুরাগে নহে। এ সকল ভাল লাগে বলিয়া যে করি তাহা নহে। যখন অরুচি হয় তখন অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেও রসনা তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। প্রচুর ধন সম্পত্তি সম্মুখে রাখ, রোগী তাহা স্পর্শ করে না। সংসারে ইহা অনেক বার প্রমাণিত হইয়াছে, বাহিরে শুধু লোভের বস্তু থাকিলে আকর্ষণ হয় না। ভিতরে লোভ বাহিরে লোভের সামগ্রী, দুয়ের সংযোগে স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়। কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই যে অভাব মোচন হইল তাহা নহে, ভাব চাই, অনুরাগ চাই, উপাসনার প্রতি আসক্তি, স্পৃহা ও লোভ চাই।

ইচ্ছা বিনা মোক্ষফল লাভ হয় না। লোভ বিনা ভোগ নাই। ধর্ম্মের আনন্দ বিনা তৎপ্রতি আকর্ষণ হইতে পারে না। আমরা যদি বর্ত্তমান অবস্থায় সশরীরে স্বর্গে গমন

করি, স্বর্গ দেখিবামাত্র আমরা ঘৃণা করিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিব। স্বর্গেও সুখের সম্ভাবনা নাই যদি অন্তরে স্বর্গ-সুখের স্পৃহা না থাকে। হাতে স্বর্গ পাইলেও আমরা উহা ফেলিয়া দিব যদি উহাতে সুখ বোধ না হয়। ধর্ম্মের প্রতি যদি আসক্তি না থাকে উহা আমরা বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। যাহার রুচি নাই তাহার সম্মুখে মিষ্টান্ন রাখিলেও সে উহা পদ দ্বারা দলন করিবে। সেইরূপ বিকৃত আত্মা লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে বৈকুণ্ঠকেও অধার্ম্মিক ব্যক্তি পদ দ্বারা দলন করিবে। বৈকুণ্ঠের প্রতি স্পৃহা না থাকিলে, তৎপ্রতি সমাদর কেন হইবে? অন্তরে যাহাতে ভাল বস্তুর প্রতি লোভ হয়, স্পৃহা হয়, এজন্য সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। পুণ্য স্পৃহণীয় বস্তু, ইহা সকলেরই পাওয়া আবশ্যক। রসনা চক্ষু হস্ত পদ হৃদয় মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হয়, প্রলোভন পাপ পরাস্ত হয়, কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি কুবাসনা না থাকে, এ জন্য আমরা যে সকল সাধন করি তৎসমুদয় কঠোর সাধন, উহা আজও আমাদের সুখের ব্যাপার হয় নাই। যেমন আহারে সুখ, নিদ্রায় সুখ, তেমনি প্রার্থনায় সুখ, ধর্ম্মসাধনে সুখ হওয়া উচিত।

কেন হরিসঙ্কীর্ত্তনে তেমন আনন্দ হয় না? মনে কর কেহ রক্ত দিয়া ভ্রাতৃসেবা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে তো সুখ মনে হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম আজও অনেকের পক্ষে সুখদ হয় নাই। জিহ্বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অসত্যকথন হইতে

নিবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাতে আনন্দ হয় না। অন্যের সুখ সম্পাদন করিলে, স্বীয় ঐশ্বর্য্য জগতের মঙ্গলের জন্য বিসর্জ্জন দিলে, সর্ব্বত্যাগী হইলে, পুণ্য হইল, গৌরব হইল, কিন্তু এ সকল হৃদয়কে সুখে প্লাবিত করিতে পারিল না। প্রতি দিন ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, চরিত্র শুদ্ধ করিলে, উপকার হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা উপাসনায় রুচি হইল অথবা প্রত্যহ ব্রহ্মেতে আনন্দ বাড়িল, এ কথা সকলে বলিতে পারে না। বাধ্য হইয়া অরুচিতে তুমি সাধন ভজন করিলে, যোগের অনুষ্ঠান করিলে, পূজা করিলে সত্য কথা বলিলে, বহু কষ্টে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে, কিছুতেই আনন্দ হইল না, এ অবস্থা স্পৃহণীয় নহে। অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট উপাসনা হইয়াছে, অথচ সুখ হইল না। একবার আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখ কেন এই সুখ পাইলে না।

হে ব্রাহ্ম ভাই, এ বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত, যে ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহার প্রথম হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সুধাময়, ইহার বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণ হইতে সুধা-ক্ষরণ হয়। এ ধর্ম্ম যত দূর ব্যাপ্ত, কোথাও কষ্টদায়ক নহে। ঈশ্বর যেমন স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে নিত্য সুখ বিধান করেন, এ ধর্ম্মেও তিনি তেমনই নিত্য সুখ সঞ্চার করেন। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পুণ্য উপার্জ্জন, উপাসনা, সাধন ভজন সকলই ইহাতে আহ্লাদের হেতু। যদি আনন্দ না পাও, শীঘ্র পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোথায় ব্যাধির মূল লুকাইয়া আছে। সুখ না হইলে

নিশ্চয়ই রোগ প্রচ্ছন্ন আছে। সত্যে সুখ পাইলে না, দয়াতে সুখ পাইলে না, বিপন্নের বিপদ নিবারণ করিয়া সুখী হইলে না, উপাসনা করিয়া ম্লান মুখে মন্দির হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, অতি সুমিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণেও জীবন-ভূমিতে সুখের স্রোত প্রবাহিত হইল না, বহু আয়াসে নাসিকা মুখ টানিয়া ব্রহ্মধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, ধ্যানে চিত্ত আকর্ষণ করিল না, মন্দিরে আসিয়া পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলে কিছুমাত্র আনন্দ লাভ হইল না, এরূপ অবস্থায় কাহার থাকিতে ইচ্ছা হয়? অন্তরে তৃষ্ণা থাকিলে কি ঈশ্বর ও পুণ্যে চিত্ত সুখী হয় না? তৃষ্ণার সময়ে যখন জল পান কর তখন কি তৃপ্তি হয় না? এই জীবনে যতবার তৃষ্ণার সময় জলপান করিয়াছ ততবার সুখী হইয়াছ। যদি বল বার বার জল খাইয়াছি বলিয়া এবার তৃষ্ণার জল মিষ্ট লাগে নাই তবে মিথ্যা কথা বলিলে। স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থায় লক্ষবার তৃষ্ণার সময় জল পান করিলেও পুনরায় জল পানের সময় তেমনি মধুপান অনুভব হইবে। তৃষ্ণা থাকিলে জলে অরুচি কখন হইতে পারে না। সহস্রবার মাকে ডাক, জননীকে স্মরণ কর, ডাকিলেই, স্মরণ করিলেই, প্রাণ শীতল হইবে। মা'র নামে কোন্ সন্তানের কবে অরুচি হইয়াছে? শরীর যখন রোগে আক্রান্ত, জিহ্বা যখন জ্বরবিকারে বিকৃত, তৃষ্ণা নাই, তখন জল পান করিলে কিছুতেই সুখ হইবে না। যদি তৃষ্ণা না থাকে স্বয়ং

ব্রহ্মও সমক্ষে বসিয়া থাকিলে তিনি সুখী করিতে পারেন না। রসনা কি প্রকারে হরিনামের সুধাস্বাদ অনুভব করিবে যদি রুচি না থাকে, বাসনা না থাকে? স্পৃহা না থাকিলে জলে ডুব দিয়া থাকিলেও সুখী হওয়া যায় না। জলের আস্বাদ লাভের জন্য তৃষ্ণা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সুন্দরতম বস্তুও সুখ দিতে পারে না যদি তজ্জন্য স্পৃহা না থাকে পুণ্যের জন্য বাসনা চাই, চিদানন্দের জন্য লালসা চাই।

সত্যের জন্য যে ব্যক্তি লালায়িত, তাহার কত আনন্দ সত্যকথনে! সে এই ভাবে, আজ আমি দশটি ঘণ্টা সত্য কথা বলিয়াছি, আহা, আমি সত্যবাদী হইয়াছি, সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার সঙ্গে যোগ কাটিয়াছি, আজ মুহূর্ত্তের জন্যও সত্যের পথ হইতে পদস্খলন হয় নাই। আহা! আজ আমি কেমন সুখী! ধনবান্ সম্রাট অপেক্ষাও আমার অধিক সুখ, কেন না আমি সত্যধনে ধনী। মানুষ যত এইরূপ ভাবিবে ততই সত্যের প্রতি স্পৃহা হইবে। জল পানের জন্য তৃষিত ব্যক্তির ন্যায় দিন দিন সে সত্যের প্রতি সতৃষ্ণ হইবে। তুমি যদি যথার্থ দয়াদ্র হও, যদি দুটী গরীবকে ছেঁড়া কাপড় দিতে পার, দুটী পয়সা দিতে পার, বাড়ীতে সংসারের ব্যয় করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা দান করিতে পার, রোগী ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া রোগ মুক্ত করিতে পার, তুমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। তুমি এই ভাবিবে, আহা! এই সামান্য শরীর দিয়া ভ্রাতার উপকার করিতে পারিলাম, ভগিনীর সেবা

করিতে পারিলাম! এই ভাবিতে ভাবিতে দয়ার স্পৃহা আরও বৃদ্ধি হইবে। কিসে পরের মঙ্গল করিতে পার তজ্জন্য প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিবে।

সত্যের জন্য, দয়ার জন্য তৃষ্ণা ক্রমে খুব বলবতী হইয়া মানুষের মনকে অস্থির করে। অসহ্য অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার পর সেই পরিমাণে তৃপ্তি ও আনন্দ হয়। একা সত্যসাধনে দয়াসাধনে আনন্দ, আবার দশ জন বন্ধুতে মিলিয়া সাধন করিলে আরও কত আনন্দ। পরস্পরের মুখপানে তাকাইয়া দেখ, তোমাদের কয় জন সত্য বলিয়া সুখ পায়, সত্যেতে আমোদ করে? পরসেবা করিয়া কয়জনের মন আনন্দরসে প্লাবিত হয়? ভাই ভগিনীর সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে এত স্পৃহা চাই, বাসনা চাই যে এক দিন সেবা করিতে না পারিলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে। হায়! অদ্যকার দিন বৃথা গেল, আর কাহারও অমঙ্গল দূর করিতে পারিলাম না, কাহারও সেবা করিতে পারিলাম না, রোগীকে ঔষধ দিয়া তাহার রোগ নিবারণ করিতে পারিলাম না, অনাথিনী বিধবার বা অনাথ শিশুর অন্নোপায় করিতে পারিলাম না, ভ্রান্তকে সৎপথে আনিবার জন্য কিছু সাহায্য দিতে পারিলাম না,—দয়াতে আকুলিত হৃদয় এইরূপে খেদ করে। সে হৃদয় সদা অবকাশ ও সুযোগ অন্বেষণ করে কখন কি উপায়ে পরের পদসেবা করিবে। এত ব্যাকুলতার পর দয়া চরিতার্থ হইলেই চিত্তক্ষেত্র বিমলানন্দে উথলিত হয়।

কি সত্যসাধন কি মঙ্গলসাধন দুয়েতেই তৃষ্ণা চাই। তৃষ্ণা থাকিলে সাধনে উল্লাস হইবে, নতুবা অরুচির সঙ্গে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। আমি সত্য কথা বলিলাম মনে হইবা মাত্র আনন্দাশ্রু নিপতিত হইবে। আমার এই অসার শরীরের রক্ত দিয়া পরের পদ ধৌত করিতে সক্ষম হইলাম, এই হাত বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিল, রোগীকে ঔষধ দান করিল, ইহা ভাবিবা মাত্র চক্ষু হইতে আনন্দধারা পড়িবে। যে পরিমাণে প্রাণের তৃষ্ণা, যে পরিমাণে বাসনা ও ইচ্ছা সেই পরিমাণে আনন্দ। যেমন নীতি সম্বন্ধে, চরিত্র সম্বন্ধে, তেমনই ধর্ম্ম সম্বন্ধে তৃষ্ণার ফল আনন্দ। বিষয়ী যেমন ধনের জন্য, সংসারের কষ্ট বিমোচনের জন্য, ব্যাকুল অন্তরে চেষ্টা করে, সাধকও ষড়রিপু দমনের জন্য তেমনি যত্নবান। সমুদয় দিনের পর সন্ধ্যার সময় যখন ব্রহ্মসাধক দেখেন, হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল, কোন অবিশুদ্ধ ভাব তাহাতে স্থান পায় নাই, তখন সমস্ত চিত্ত আনন্দে প্লাবিত হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে সুখ হয়, আবার সুখ হইলে নির্ম্মলতা বৃদ্ধি হয়। যেখানে শুদ্ধচরিত্রতায় সুখ নাই, সেখানে ইন্দ্রিয়-সুখে লোক হাসে বটে, কিন্তু সেই হাসির ভিতরে যম বসিয়া আছে। পাপের হাসি মৃত্যুর লক্ষণ। যথার্থ আনন্দ পুণ্যেতে। পুণ্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। যদি না হয় কোন অস্বাভাবিক গ্লানি বা ব্যাধি নিশ্চয়ই ভিতরে আছে।

পুণ্য ও দয়াসম্বন্ধে যেমন, পূজা উপাসনাসম্বন্ধেও তেমনই

তৃষ্ণা আনন্দের হেতু। বাসনা না থাকিলে উপাসনা সিদ্ধ হয় না। কেবল ব্রহ্মমন্দিরে আসিলে হইবে না। হরিনাম-ধ্বনিতে শরীর রোমাঞ্চিত হওয়া চাই, আনন্দোদয় হওয়া চাই। যদি ব্রহ্মপূজার জন্য তোমাদের প্রবল ঔৎসুক্য ও স্পৃহা থাকে তাহা হইলে এখানে আসিয়া তোমরা অত্যন্ত সুখী হইবে। রাজা রাজ্য পাইলে তাঁহার কত আনন্দ, বিষয়ী প্রচুর ধন লাভ করিলে তাহার কত অহ্লাদ, ধর্ম্মে কি তোমাদের তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইবে না? সামান্য ধনের জন্য তাহাদিগের যে লোভ, তোমরা পরম ধন লাভের জন্য কি তদপেক্ষা অধিক লোভ করিবে না? সপ্তাহের পর আজ বন্ধুগণের সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহা-দিগের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া একত্র ঈশ্বরকে ডাকিব, ইহা ভাবিয়া কত সুখী হওয়া যায়। কিন্তু অনেকে এখানে আসিয়া কেবল আলোকের শোভা দেখিলেন, অর্গান বাজিল তাহা শুনিলেন, কিন্তু উপাসনায় আনন্দ হইল না, চিত্তক্ষেত্রে সুখের ফুল ফুটিল না; ধ্যান করিলেন, প্রার্থনা করিলেন, সঙ্গীত করিলেন, কিন্তু মুখে আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, কেহ পূজা করিয়া সুখী হইল না। কিন্তু যিনি বাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কখন সময় হইবে সকল ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ভক্তবৎসলকে দেখিব, তিনি মন্দিরে আসিয়া আরাধনা ধ্যান করিবামাত্র ব্রহ্ম দর্শন করিলেন, এবং ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলেন। যেমন আরাধনায়

তেমনি ধ্যানে তৃষ্ণা থাকিলে, কাতরতা থাকিলে, মন প্রবল বেগে ধ্যানসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে। তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যেমন জল পাইলে হাপুস্ হুপুস্ করিয়া উহা পান করে তেমনি সতৃষ্ণ আত্মা যোগানন্দসাগরে ডুব দিয়া আগ্রহের সহিত অমৃত পান করে। তৃষ্ণাতুর হইয়া ধ্যান করিলে ধ্যানে অত্যন্ত সুখ হয়। বিনা তৃষ্ণায় বার বার মৃদঙ্গ বাজাও, হরিসঙ্কীর্ত্তন কর, আহ্লাদ হইবে না। একবার ব্যাকুলহৃদয় হও, মৃদঙ্গ স্পর্শমাত্র শরীর মন পুলকে পূর্ণ হইবে। কখন সঙ্কীর্ত্তন করিব, কখন মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি শুনিব, এই ভাবিতে ভাবিতে যতই স্পৃহা বাড়িবে, ততই দেখিবে মৃদঙ্গ হাতে স্পর্শ করিতে না করিতে একেবারে মন মাতিয়া যাইবে, এবং হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিবে। বস্তুতই এরূপ হয় ইহা মিথ্যা বা কল্পনা নহে।

বাসনা থাকিলে বাসনা পূর্ণ হইবার সময় মন সুখোন্মত্ত হয়। যেখানে বাসনা নাই সেখানে অরুচি এবং নিরানন্দ। হে জীব, যদি সুখী হইবে বাসনা উদ্দীপন কর। বাসনা সুখের হেতু। হে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ সুখের জন্য, দিন দিন পবিত্র সুখে পবিত্র হইবার জন্য। ধর্ম্মের পথে ব্রহ্মচারী হইয়া যে ব্যক্তি দিন দিন সৎপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজনা করে, কুবাসনা দগ্ধ করে, সাধু ইচ্ছা ও ব্রহ্মস্পৃহা এবং শুভ বাসনা পোষণ করে, তাহার সুখের পরিসীমা থাকে না। প্রবল স্পৃহাতে গভীর আনন্দ, আবার বিচিত্র ধর্ম্মস্পৃহাতে

বিচিত্র আনন্দ। যত এ বিষয়ে বাসনা ও রুচি, তত প্রকার সুখ। ধ্যান, প্রার্থনা, আরাধনা, সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসহবাস, সৎ-ঃসঙ্গ, গ্রন্থপাঠ, প্রকৃতি চিন্তা প্রভৃতি নানা প্রকার বিশুদ্ধ সুখ হৃদয়কে প্রফুল্ল করে। তোমরা স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরে এই সকল সুখ সম্ভোগ কর। পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলে, আরও অগ্রসর হও। রুচির পথে অগ্রসর হইলে, আরাধনা সুখের হইবে, পূজা অর্চ্চনা আনন্দকর হইবে, এবং ব্রহ্মের ন্যায় সুখের বস্তু আর দেখিতে পাইবে না। ধর্ম্মে দুঃখ নাই, ধর্ম্মে একান্ত সুখের অবস্থা। সংসার ছাড়িয়া, দুঃখের ধর্ম্ম ছাড়িয়া, রুচির পথ অবলম্বন কর; ইহাতে সমুদয় কাম্যবস্তু ও সুখের বস্তু লাভ হইবে এবং সকলে এই পৃথিবীতেই দেবসুখ সম্ভোগ করিবে।

জীবনগ্রন্থ।

রবিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শক; ২১এ নবেম্বর ১৮৮০।

যখন নববিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন, তখন তিনি স্বর্গীয় পিতার নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি পৃথিবীতে গিয়া কি শিক্ষা দিব, শিক্ষার মূল গ্রন্থ কি, এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। ভগবান বলিলেন, "নববিধান, তোমার বিশেষ কোন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইবে না। লোকের চরিত্র পুণ্য প্রেমে গঠন করিয়া, জীবনগ্রন্থ হইতে

ঘটনাশ্লোক উ্ত করিয়া ব্যাখা করিবে এবং তদ্দ্বারা জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবে। জীবন হইতে জীবন জন্মিবে। তুমি দৃষ্টান্তের প্রমাণে সত্য প্রচার করিবে। তুমি পৃথিবীতে গিয়া মৃত পুস্তকের পরিবর্ত্তে জীবন্ত গ্রন্থ প্রচার কর, এই তোমার প্রতি অনুজ্ঞা।" নববিধান এই উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবীতে আসিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন, কোন বিশেষ পুস্তকের আধিপত্য থাকিবে না, বাইবেল কোরাণ, বেদ পুরাণ সকলের উপরে ভক্তজীবনরূপ ধর্ম্মপুস্তক সমাদৃত হইবে, সর্ব্বত্র ঐ গ্রন্থ পুজিত হইবে। উহা পৃথিবীকে হরিপ্রেমলীলা জীবন্ত আকারে প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবে।

মনুষ্যের নিকটে জীবনের তত আদর নাই, যত গ্রন্থের পৃথিবীতে গ্রন্থপূজা অত্যন্ত প্রবল। গ্রন্থের পরাক্রম ও মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের গৌরব জীবন থাকিতে হয় না। জীবন অবসান হইলে গ্রন্থের আদর। যতদিন ভক্তজীবনে হরি জীবন্ত ধর্ম্ম দেখান, ততদিন উহাই ঈশ্বররচিত বাইবেল কোরাণ বলিয়া আদৃত হইবে। মনে করিয়া দেখ, পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা কেন? উহাতে ভক্তজীবন লেখা আছে বলিয়া। পুরাণের গৌরব এই জন্য যে এক সময়ে ভক্তেরা স্বীয় স্বীয় জীবনে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই উহার ভিতরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তজীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হইলেই তাহা পুরাণ হইল।

যখন ঘটনা ঘটে, যখন লোকে উহা চক্ষে দেখে, তখন উহা গ্রন্থবদ্ধ হয় না। তখন লোকে পড়ে না, দেখে। ঘটনা-স্রোত ক্রমে ক্রমে বদ্ধ হইল, ইতিহাস কালক্রমে নিস্তব্ধ হইল, অভিনয় শেষ হইল, রঙ্গভূমি হইতে অভিনেতৃগণ ফিরিয়া গেলেন। জীবনচরিত ইতিহাসে পরিণত হইল, তখন পুরাণের আরম্ভ হইল। গ্রন্থ জীবনের স্থান গ্রহণ করিল, মানুষের চরিত্র শাস্ত্রে পর্য্যবসিত হইল। প্রত্যক্ষ ঘটনা শ্রুতি স্মৃতি হইল। পূর্ব্বে যাহা চক্ষু দেখিল, এখন তাহা কলম লিখিল, বুদ্ধি বুঝিল।

যাহা হউক, মূলশাস্ত্র জীবন, নববিধান এই গূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন। এখন গ্রন্থের সময় নহে, জীবনের সময়, জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের সময়। বর্ত্তমান বিধানে এই শুভ সংবাদ প্রচার হইল যে বেদ পুরাণ অপেক্ষা ভক্তজীবন বড়, উপদেশ অপেক্ষা চরিত্র বহুমূল্য। এখন যে পুস্তক চাই না তাহা নহে। পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনি পুস্তকের প্রয়োজন। ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার হয় না। মূল গ্রন্থ না থাকিলে কোথা হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা হইবে, কি অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বেদী হইতে উপদেশ দিবেন? মূলগ্রন্থ থাকিলে তবে তাহার টীকা হয়, তাহার ব্যাখ্যা হয় এবং সত্য প্রমাণিত ও বিস্তৃত হয়। ভ্রান্তের ভ্রম, অবিশ্বাসীর সংশয় ও পাপীর পাপ মোচনের জন্য গ্রন্থ চাই। নববিধান এক নূতন অভ্রান্ত ঋগ্বেদ পৃথিবীতে

আবিষ্কার করিলেন। হে নববিধান, লোকে বলে, তোমার গুরু নাই, গ্রন্থ নাই, বেদ নাই, বেদান্ত নাই, ঈশ্বররচিত কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র নাই, তবে তুমি কিরূপে লোকসমাজে জ্ঞান বিতরণ করিবে? কি দেখাইয়া জীব উদ্ধার করিবে? হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা এ প্রশ্নের উত্তর দাও, লোকের আপত্তি ও উপহাস খণ্ডন কর। জীবন্ত দৃষ্টান্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে, জীবনরূপ বেদ বেদান্ত প্রস্তুত করিয়া মানুষের হাতে দিতে হইবে। তোমাদের এক এক জনের জীবন পুস্তকরূপে লোকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ঋগ্বেদ, আমাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ পুরাণ। কেন না আমাদের জীবনে দয়াময় হরি আপন প্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহার সাক্ষী করিয়াছেন। এ ধর্ম্মে অন্য সাক্ষী নাই, ঈশ্বর আমাদের জীবনকে সাক্ষী নিয়োগ করিয়াছেন। সময় হইয়াছে, হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা আপন আপন জীবনপুস্তক প্রস্তুত কর এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর কর। পৃথিবী এই সকল কথায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতেছে, কি নববিধান অভ্রান্ত বেদ আনয়ন করিবে? হিন্দুধর্ম্ম কি ম্লান হইয়াছে? ঋক যজু সাম অথর্ব্ববেদ পুরাণ এই সমুদয়কে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্রশূন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়ী হইবে? ঋগ্বেদ অপেক্ষা কি নববিধান বড় হইবে? দেখ, নববিধানকে সকলে উপহাস করিতেছে।

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা ইহার মর্য্যাদা রক্ষা কর, তোমরা ইহার মুখ উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরবাণীর যথার্থতা সপ্রমাণ কর। কোন পুস্তকের উপরে নির্ভর করিও না। এই নববিধানের জীবনপুস্তকের প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রচার কর। ভক্তজীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মগ্রন্থ হইবে। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ কর, শত শত বৎসর পরে তোমাদিগের জীবন ব্রহ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবেদ বলিয়া গৃহীত ও আদৃত হইবে। যে বিধানের কোন প্রকার পুস্তক নাই, লোকে তাহাতেও পুস্তক অন্বেষণ করিবে। আমরা পুস্তক মানি না, তথাপি পৃথিবীর লোক আমাদিগের নিকট শাস্ত্র চাহিবে। অতএব হে ব্রহ্মোপাসকগণ, তোমরা ত্বরায় জীবন গঠন কর। এখন গদ্য পদ্যে গ্রন্থ রচনা কর, যেন তোমাদিগের জীবন পড়িয়া লোকে জীবন্ত ভগবানের মহিমা দেখিতে পায়। যদি আজ কাল কোথাও ভগবান্ পাপীর একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সহস্র লিখিত পুস্তক অপেক্ষা ঐ জীবন্ত ঘটনাটী মানুষের মনকে আকর্ষণ করিবে। প্রাচীন কালে কোথায় ভগবান্ কি লীলা দেখাইয়াছেন, সে পুরাণ লইয়া এখন কি হইবে? এখন নূতন কথা, নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন। আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে অমুক সাধু অমুক স্থানে অমুক পাহাড়ে ঈশ্বর কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও আদিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সত্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিশেষ কি লাভ হইবে? আজ নিজের ঘরে নিজের কর্ণে শুনিতেছি

ভগবান এই কথা বলিলেন, নিজ চক্ষে দেখিতেছি তিনি এই কর্ম্ম করিলেন। আজ অমুকের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমুদয় সংসারের কাজ ঈশ্বর আপনি নির্ব্বাহ করিলেন, আপনি অন্ন পরিবেশন করিলেন, আপনি অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আজ অমুক ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছিল, ভগবান তাহার সমুদয় ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করিলেন, তাহার সমুদয় বিপদ ভঞ্জন করিয়া শান্তি প্রদান করিলেন। এ সকল নূতন কথা প্রকাশ হওয়া চাই। চক্ষে যাহা দেখা হইল লোকসমক্ষে বলা চাই। এইরূপে ঈশ্বর প্রমাণিত হইবেন, এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

যদি পুস্তক চাই স্বীকার করিলে, তবে প্রত্যেকে পুস্তক হইতে চেষ্টা কর। আমি বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর একটি ধর্ম্মপুস্তক হইব, আমার চরিত্রে ক্ষমা সহিষ্ণুতা বিনয় নিরহঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেখাইব, আমার জীবনসামবেদ ভবিষ্যতে কত লোকে সুমধুর স্বরে গান করিবে। আমাদিগের জীবনে গদ্যে পদ্যে লিখিত প্রত্যাদেশ দেখাইতে হইবে। আমরা কত দূর নিরহঙ্কারী বিনয়ী হইতে পারি, ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মের উপর একান্ত নির্ভর করিতে পারি, ইহার দৃষ্টান্ত জীবনপুস্তকে বিবৃত করিতে হইবে। ব্রহ্মের আদেশ ঘোষণা করিবার জন্য অনেক গ্রন্থ অনেক পুস্তকের প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে নানাপুস্তক নানা পত্রিকা প্রচারের জন্য উদ্যোগ হইতেছে, তৎসংক্রান্ত আমার একটি প্রস্তাব আছে।

পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তজীবন প্রচার করিলে একটি বিশেষ অভাব মোচন হইবে। নববিধানের মূল গ্রন্থ নাই, লোকের এই কুসংস্কার আছে, তাহা আর থাকিবে না। লোকে যখন বলিবে, তোমাদিগের বেদ নাই, সর্ব্বাগ্রে জীবনরূপ মূল গ্রন্থ যেন তাহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হয়! তোমরা সকলে জীবনের বৃত্তান্ত সকল লিখিয়া সাধারণের এই অভাব মোচন কর। ছোট ছোট পুস্তক প্রচার করিতে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-বৃত্তান্ত প্রচারিত হউক। ব্রহ্মধামে যে মুদ্রাযন্ত্র আছে তাহাতে আপন আপন জীবনগ্রন্থ মুদ্রিত কর। যে কয়খানি হয় বিশুদ্ধ ভাষায় জীবনগ্রন্থ রচনা করিয়া ঈশ্বরের যন্ত্রে ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, সকলে জানুক যে জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের অভাব নাই। ক্ষমার তত্ত্ব, নীতির তত্ত্ব, উপাসনার তত্ত্ব, যোগের তত্ত্ব, ভক্তির তত্ত্ব, বিশ্বাসের তত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বের এক একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের বেদ পুরাণ নামে প্রচারিত হউক। এই সকল পাঠ করিয়া সকলের বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক, সকলের পাপ তাপ নিবারণ হউক।

মনুষ্যের জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মপুস্তক, এই মত বুঝাইয়া দিয়া সকলের ভ্রান্তি দূর করা হউক। ঈশ্বরাদিষ্ট জীবন জীবন্ত সত্য প্রকাশ করে, ইহা প্রচার করিয়া সকলে নববিধানকে সাহায্য করুন। জীবনপুস্তকে মানুষের বুদ্ধিরচিত প্রবন্ধ লেখা নাই, কিন্তু কেবল হরির আশ্চর্য্য প্রেমলীলা। উহাতে

মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান যে সকল অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেন, তৎসমুদয় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত ও উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়, নাস্তিক আস্তিক হয়, অভক্ত প্রেমিক হয়, এবং অসাধু সাধু হয়। এমন গ্রন্থ কি তোমাদের কাহারও নিকটে নাই? অবশ্য আছে। গুপ্ত জীবনরহস্য বাহির কর, লুক্কায়িত বেদ বেদান্ত প্রকাশ কর। ভক্তজীবনপুস্তকে প্রথমে যে উৎসর্গপত্র আছে, তাহাতে লিখিত আছে, ঐ গ্রন্থ ব্রহ্মপাদপদ্মে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইল। এমন উপহার, জীবনদান, তিনি কি গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন? যে ব্যক্তির জীবনপুস্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় উৎসাহ যোগ জীবন্তভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তির জীবন কেবল ঈশ্বরের প্রেমকীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহারই জীবন উপহার গ্রহণে পরমেশ্বর সদা উৎসুক। সেই ভক্তজীবন অমূল্য ধন, উহা দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ হয়।

ভক্তেরা যোগীরা আপন আপন জীবনে ঈশ্বরকে দেখিয়া যে সকল কথা বলেন তাহা সত্যের সাক্ষী এবং এজন্য ব্রহ্মের অত্যন্ত আদরণীয়। এই গ্রন্থ উৎকৃষ্ট লাল কালীতে মুদ্রিত। কাল অক্ষরে ইহা ছাপা হয় না, কিন্তু ভক্তের শোণিতে ঈশ্বরের কথা মুদ্রিত হইয়া থাকে। জীবনের ঘটনা অন্য কালীতে লেখা হইতে পারে না। সামান্য কালীতে সামান্য কাগজে প্রত্যাদেশের কথা অঙ্কিত হইতে পারে না। হৃদয়ের

জীবন্ত তেজস্বী রক্ত ভিন্ন তেজস্বী হরিতত্ত্ব লেখা যায় না। ঈশ্বরের নাম ও তাঁহার শাস্ত্র লিখিবার একমাত্র কালী জীবের রক্ত। তোমাদের জীবনের চারি বেদ রক্ত দিয়া লেখ, তবে তো উহা জীবন্ত ও জীবনপ্রদ শাস্ত্র হইবে। নির্ম্মল রক্ত দিয়া যত সুখ সম্পদ, জ্ঞান ধর্ম্ম, আমরা ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, রক্ত দিয়া সত্য প্রমাণ করিতে হইবে, রক্ত দিয়া ভগবানের মহিমা মহীয়ান্ করিতে হইবে। আপনার রক্ত দিয়া যাহা লিখিবে, লোকের নিকটে তাহাই চিরাদৃত হইবে।

ভক্তরক্তে ঈশ্বর পৃথিবীর পাপ ধৌত করেন। কেবল মুখের কথায় জগতে সত্য সপ্রমাণ হয় না। রসনা সত্যের সাক্ষী হইতে পারে না। যে রক্ত দেয় না, সে কেবল বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারে না। যদি পৃথিবীর উদ্ধারের পথ প্রমুক্ত করিতে চাও, সতেজ রক্তে জীবন্ত ধর্ম্ম কথা লিখিয়া প্রচার কর। জীবনের সমুদয় ঘটনাগ্রন্থ রক্তবর্ণ অক্ষরে লিখিবে। বুদ্ধির কাল কালীতে আপনার মত একটিও লিখিবে না, কেবল ব্রহ্মের শ্রীমুখের বাণী শোণিতাক্ষরে লিখিবে। একটি একটি ঘটনা একটি একটি শ্লোক। সেই শ্লোক পাঠ মাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে, লেখক এবং পাঠক উভয়েই কৃতার্থ হইবে। সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিলেও ঐ একটি শ্লোকের তুলনা হয় না। ঈশ্বর ভক্তের হস্ত ধারণ করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীতে কবে

কি করিয়াছেন এই সকল পুস্তকে দেখিবামাত্র সকলে বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বর কেমন জীবন্ত জ্বলন্ত ভাবে অবিশ্বাস নিবারণ করিতেছেন। ব্রহ্ম কাহার জীবনে কবে কি করিলেন, সমস্ত তাহাতে লেখা আছে। ঈশ্বর বিনা কিছুই হয় না, ইহা সকলে বিলক্ষণ জানিবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মমন্দিরে এই সকল পুস্তক হইতে ঘটনাশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন, তচ্ছ্রবণে উপাসকমণ্ডলীর রোমহর্ষণ হইবে।

শুষ্ক নির্জীব বেদ বেদান্ত অপেক্ষা জীবনশাস্ত্র অধিক ফলপ্রদ হইবে। এ সকল গ্রন্থ আবার হৃদয়রঞ্জন। ইহা সচিত্র। সকলে সচিত্র পুস্তক দেখিতে উৎসুক। ভক্তের জীবনে যে কেবল ঘটনা ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চিত্র সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ভূমা আকাশমূর্ত্তি কিরূপ যদি আঁকিয়া দিতে পার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টীকা ব্যাখ্যান সংযুক্ত কর, তাহা হইলে জগতের নিকটে উহার অত্যন্ত আকর্ষণ হইবে। গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি, যোগেশ্বরের মূর্ত্তি, স্বর্গীয় ভক্তগণের মূর্ত্তি, পৃথিবীতে বৃক্ষতলে ভক্ত যোগী নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, নদীতটে সায়ংকালে একতারা বাজাইয়া নামগান করিতেছেন, এ সকল মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে হইবে। দশ জন ভক্ত একত্র মিলিত হইয়া ব্রহ্ম পূজা করিলেন, এক সময়ে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সকলের নিকট প্রদীপ্ত হইল, ইহার ছবি অঙ্কিত করিতে হইবে। সকলে

আপন আপন জীবন পুস্তক দেখ, উহাতে বিচিত্র চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে।

নববিধানের গ্রন্থ দৃষ্টান্তের গ্রন্থ। উহাতে তত্ত্ব কথা আছে, আবার ছবির দ্বারা উহা প্রমাণিত। উহাতে জীবন্ত বিধান বর্ণিত ও চিত্রিত, সুতরাং ঈশ্বরের লীলার খুব উজ্জ্বল সচিত্র বর্ণনা দেখিয়া, লোকে সহজে বুঝিবে এবং মুগ্ধ হইবে। ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাইয়াছ, সকলের নিকট উহা প্রকাশ কর। তোমরা গোপনে যাহা দেখিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, নির্ভয়ে রাজপথে দাঁড়াইয়া লোকের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। উপাসনার ঘরে যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, ছাদের উপরে উঠিয়া তাহা ঘোষণা কর। কুড়ি বৎসর অন্তরে অন্তরে যাহা চাপিয়া রাখিয়াছ, তাহা আর চাপিয়া রাখিবার সময় নাই। নববিধান উদিত হইয়াছেন, এখন আর তোমারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। ব্রহ্ম যাহার সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন সকল প্রকাশ করিয়া বল। কে কে পুস্তক লিখিবেন একেবারে স্থির করিয়া ফেলুন। হরি-কথামৃত লিখিয়া হরির দয়া প্রকাশ করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করিতে হইবে এবং তাহাতে ছবি আঁকিয়া দিয়া আরও মনোহর করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। সমুদয় বই প্রকাশ হইলে, সমুদয় ছবি তাহাতে আঁকিয়া দিলে, সকলে আদরের সহিত উহা গ্রহণ করিবে।

ইচ্ছাযোগ।

১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০২ শক ; ২৮এ নবেম্বর ১৮৮০

যেখানে যোগধর্ম্ম সেইখানে বিলীন হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যোগ এবং লয় বাস্তবিক একই। সাধনের আরম্ভে যোগ, পরিণামে লয়। যে স্থানে যে লোকের মধ্যে এই যোগের আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে সেই লোকের মধ্যে কালক্রমে লয়ের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। যাহারা যোগ ধরিয়াছে তাহারা ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বরে লীন হয়। যোগের অর্থ এই যে, দুই বস্তু একত্র হইয়া এক অপরের মধ্যে বিলীন হয়। হিন্দু কিংবা অন্যান্য যে ধর্ম্মে যোগের তত্ত্ব আছে তাহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কথা আছে। হিন্দুধর্ম্ম কি বলে তাহা তোমরা সকলেই জান। ইহার অদ্বৈতবাদ, "আমি ব্রহ্ম" সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। খৃষ্টধর্ম্মের মূলেও দেখিতে পাই "আমি ও আমার পিতা একই।" হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম আপাততঃ লোকের নিকট বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য। একটি ধ্যানের ধর্ম্ম, আর একটী কর্ম্মের ধর্ম্ম। এ দেশের ঋষি ধ্যানশীল। ঈশা ও তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুয়ের ভিতরেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইবার কথা। দুয়েতেই যোগের লক্ষণ দেখা যায়। দুয়েতেই জীব ও পরমাত্মার ঐক্য, দুয়েতেই পরমাত্মাতে জীবের লয়। হিন্দু ঋষি ও নীতিপরায়ণ সাধুশ্রেষ্ঠ

ঈশা এ দুয়ের সাধনের আরম্ভে ভিন্নতা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঐক্য ও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আর্য্য ঋষি যোগের প্রারম্ভে জনকোলাহল হইতে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইয়া গিরিশিখরে অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করেন এবং ক্রমে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হন। চক্ষু নিমীলন ও ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। জল বিন্দু অনন্ত ব্রহ্ম-সাগরে লীন হইল। যতক্ষণ সাধনের অবস্থা, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অবস্থা, ততক্ষণ ঋষি জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে থাকিতে যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন পরমাত্মাও নাই জীবাত্মাও নাই, বোধ হয় সকলই একাকার, নিরাকার, অকূল জ্ঞানসমুদ্রে জীবাত্মা বিলীন। এ অবস্থাতে বিন্দুমাত্র ব্যবধান বা ভিন্নতা অনুভূত হয় না। জ্ঞানেতে শক্তিতে প্রেমেতে আনন্দেতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ হইয়া গেল। এ অবস্থা অতি গভীর ও নিগূঢ়। যেখানে জীব আপনার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা অনুভব করিতে না পারিয়া ব্রহ্মেতে ঐক্যভাবে স্থিতি করিল, সেখানে ধ্যান ও যোগসম্বন্ধে দুয়ের মধ্যে একতা শব্দ ব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু যে ঋষি হিন্দু ঋষির ধ্যানের পন্থা অবলম্বন করিলেন না, অন্য প্রকার সাধনের অনুসরণ করিলেন, তিনি কেন বলিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক ?" এই কথা বলিয়া কি তিনি হিন্দু ঋষিগণের সঙ্গে এক হইলেন ? আর্য্য ঋষি পিতা পুত্র মানেন না, কেবল সাগরের

সঙ্গে জলবিন্দুর সম্পর্ক মানেন। জীব পরমাত্মাতে বিলীন হওয়াতে দুয়ের একতা বুঝিলাম, কিন্তু পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতে দুয়ের ঐক্য কিরূপে সম্ভব হইবে ?

আর্য্য ঋষি ব্রহ্মসাগরে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব ধ্যান করিতে করিতে আপনাকে ব্রহ্মেতে হারাইলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঈশার বক্ষ ভেদ করিলে কি এইরূপ ধ্যানযোগ দেখিতে পাওয়া যায় ? সেখানে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন। তবে পিতা ও পুত্র এক হইল, কি প্রকারে ? এখানে কি যোগ হইতে পারে ? হাঁ, এখানেও যোগ আছে। ঈশার ধর্ম্মও মূলে যোগের ধর্ম্ম। কিন্তু হিন্দু ঋষিদিগের যোগ হইতে এ যোগ স্বতন্ত্র। এ যোগ ইচ্ছাযোগ, কর্ত্তৃত্বযোগ। অন্তরে এক ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছা বিলীন। এখানে স্বেচ্ছার বিনাশ। ইচ্ছাযোগ কিনা স্বেচ্ছার সংহার, স্বইচ্ছাকে বিদায় দিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাতে জীবের ইচ্ছা বিলীন করা। যেমন আত্মা ধ্যানের সময় পরমাত্মাতে নিমগ্ন হয়; তেমনি কার্য্যেতে ক্ষুদ্র ইচ্ছা পরমাত্মার ইচ্ছাতে বিলীন হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে জীব যখন ভ্রষ্ট হয়, তখন সে পাপ করে; লোভ মোহে তখন সে কলঙ্কিত হয়। ভ্রষ্ট ইচ্ছা ব্রহ্মের কাছে আসিতে পারে না, ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া সে স্বীকার করিতে চায় না। এ ইচ্ছাকে শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সংযোগ করাকে ধর্ম্ম বলে। চিত্তশুদ্ধির মূলে কেবল স্বার্থ-নাশ। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি জয়ী হইল, স্বেচ্ছা আর থাকিল

না। পূর্ব্বে ইচ্ছার পূর্ব্বে একটি অতিরিক্ত বর্ণ ছিল "স্ব" সেটি আর রহিল না। আমার ইচ্ছায় আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, এই যে আমার আমার তাহা একেবারে চলিয়া গেল। স্ববিরহিত একমাত্র শূন্য ইচ্ছা রহিল, অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা জীবের সমস্ত ইচ্ছাকে গ্রাস করিল। যতক্ষণ আমার ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ সে ইচ্ছা আমাকে সংসারের দিকে টানিবে, ঈশ্বরের দিকে টানিতে পারিবে না। "আমি" রজ্জুতে আমাদের জীবনতরী সংসারঘাটে বদ্ধ রহিয়াছে; ঐ রজ্জু কাটিলেই নৌকা ব্রহ্মজলধিতে মগ্ন হইবে। সম্পদের ইচ্ছা, সুখ সমৃদ্ধির ইচ্ছা, এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক ইচ্ছা পাপ কলঙ্কে পূর্ণ নৌকা ঘাটে বদ্ধ ছিল। স্বেচ্ছা-রজ্জু কাটিবামাত্র নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মসাগরের তুফানে পড়িয়া ডুবিয়া গেল, চিহ্নও রহিল না। আর আমার তোমার রহিল না। পুত্রের ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা এক হইল, পুত্র পিতার ইচ্ছাসাগরের তরঙ্গে পরিচালিত হইতে লাগিলেন।

ততক্ষণ মনুষ্য পাপী, যতক্ষণ সে নিজে কর্ত্তা। পাপ না থাকিলে কেহ আপনাকে কর্ত্তা মনে করে না। কর্ত্তা হওয়াতে পাপের সৃষ্টি হয়। জীব নিজে পাপ ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে না। ধর্ম্মের কর্ত্তা এক স্বয়ং ঈশ্বর। সেই কর্ত্তাকে ভজিলে, কর্ত্তার নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রণত ও অধীন হইলে, পাপ হইতে পারে না। কর্ত্তার ইচ্ছা যিনি পালন করেন, তিনিই শুদ্ধ তিনিই সুখী। আপনি কর্ত্তা এই ভ্রান্ত মতই

সর্ব্বনাশের মূল। আমরা নিয়ত জীবনে দুটি কর্ত্তা স্থাপন করিতে চাই। ঈশ্বর ও আমি। উপাসনা পূজা কার্য্য সকল বিষয়েরই দুটী কর্ত্তা। যে ঘরে দুই কর্ত্তা দুই প্রভু সেখানে নিশ্চয়ই বিবাদ ও অশান্তি। আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ে দুটী কর্ত্তা স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। কতকগুলি টাকা আমার, কতক-গুলি ব্রহ্মের; কতকগুলি গুণ আমার, আর কতকগুলি গুণ তাঁহার। এই এই বস্তু আমার, এই এই বস্তু ব্রহ্মের। দুই জন কর্ত্তা স্থির করিয়া তালুক মুলুক, ধন সম্পদ, মহিমা ও গৌরব বিভাগ করিয়া লই। এরূপ বিভাগ যেখানে, সেখানে কখন সুখের রাজ্য হয় না, কেবলই অশান্তি। বিবেকের সুখ এ অবস্থায় দুষ্প্রাপ্য। দেবাসুরের সংগ্রামে শান্তি ভাঙ্গিয়া যায়। গৌরব লইয়া ঈশ্বর ও জীবাত্মার বিবাদ উপস্থিত হয়। যেখানে দুই জনের কর্তৃত্ব সেখানে সুখ সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি যোগধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, ইচ্ছার শাস্ত্র জানেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইচ্ছা কামনা, বিষয় বাসনা বিলীন হইয়া এক ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবতী হয়। তাঁহার সমুদয় জীবন সেই এক প্রবল ইচ্ছার অধীন হয়, সমুদয় বাসনা অভিলাষ ফুরাইয়া যায়। তিনি আপনার সমুদায় স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করেন। যোগদ্বারা তিনি আপ-নার সমুদয় ঈশ্বরের ইচ্ছাসাৎ করেন।

ঋষির আত্মা ধ্যানযোগে যেমন পরমাত্মাতে বিলীন হয়, তেমনি সকল কার্য্য ঈশ্বরানুগত হইয়া করিলে বিবেকী

কর্ম্মীর মনে ইচ্ছাগত যোগ হয়। তখন স্বেচ্ছা আর তিষ্ঠিতে পারে না। তখন আমার ইচ্ছায় আমি বেড়াইতে যাই না, আমার ইচ্ছায় আমি ধন উপার্জ্জন করি না, আমার ইচ্ছায় আমি সংসার করি না, আমার ইচ্ছায় কার্য্যালয়ে যাই না, আমার ইচ্ছায় মন্দিরে আসি না, ধর্ম্মসাধনও করি না, সকলই প্রভুর ইচ্ছা। যখন সাধকের জীবন এই যোগের অবস্থায় পরিণত হয়, তখন কি সংসার কি পূজা অর্চ্চনা সাধুসহবাস সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। সাধু ঋষি বলিলেন 'আমি এবং আমার পিতা এক।' তিনি যোগে ইচ্ছার ভিন্নতা দেখিতে পাইলেন না, যোগবলে স্বাধীনতা, দ্বিধা উড়াইয়া দিলেন। নিজের কর্তৃত্ব নাই। কর্তৃত্বে আমি তুমি বুঝায়। আমি গান করি, বক্তৃতা করি, আমি প্রচার করি, যতক্ষণ এই প্রকার ভাব থাকে, ততক্ষণ মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে, কিন্তু সুখী হয় না, যোগী হইতে পারে না। যোগী হইলে আর আমি তুমি থাকে না। আমার কর্তৃত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

অহঙ্কার আর আত্ম ইচ্ছা সমান। খাও দাও যাহা কর, উৎকৃষ্ট কি সামান্য কাজ আমার ইচ্ছায় কিছুই হয় না, এইরূপ বলিতে শিক্ষা কর, দেখিবে পরিশেষে আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। যুক্তি—সাঁতারে সিদ্ধি। যে সাঁতার জানে না, সে হাত পা ছুড়িতে থাকে। ক্রমে যখন সাঁতারে সিদ্ধ হয়, তখন আর হাত পা ছুড়িতে হয় না, স্রোতে গা

ভাসাইয়া চলিয়া যায়। এখানে যে সাঁতার দিতেছে সে কর্ত্তা নহে স্রোতই কর্ত্তা, স্রোতে ছাড়িয়া দিলেই খুব সহজে সন্তরণ করা যায়। সন্তরণে দেহ সিদ্ধ হইলে যেমন স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, স্রোতের গুণে আর কোন ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না, তেমনি ব্রহ্মশক্তির স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে অনায়াসে যোগের ভিতর ডুবিয়া যাইবে। কখন কি হইবে তুমি বলিতে পার না, আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এই জানি এখানে থাকিবে না, ভাসিয়া চলিয়া যাইবে, কে লইয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ব্রহ্মের ইচ্ছাস্রোতে এই ভাবে যিনি আপনাকে ছাড়িয়া দেন, তিনি এই বলেন, বিভু এক, আমি কিছুই নই, আমার সঙ্গে তাঁহার কোন বিরোধ নাই। এই ভাব যখন আর্য্য ঋষি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। আর এক ঋষি ইচ্ছাকে পবিত্র করিলেন, পুণ্যব্রতে ব্রতী হইয়া সিদ্ধ হইলেন, পরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, সর্ব্বদা জগতের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন।

একজন ঋষি যোগানন্দ ভূমানন্দ লাভ করিলেন, আর এক ঋষি বিবেকসুখে মগ্ন হইলেন। একজনের ধ্যানানন্দ, একজনের ইচ্ছানন্দ। একজন ধ্যানে সিদ্ধ, আর একজন ইচ্ছাতে সিদ্ধ। যিনি ইচ্ছাতে সিদ্ধ তিনি সমুদয় দিন পরিশ্রম করিলেন, অথচ তিনি পরিশ্রমের বিকার, কার্য্যের

অশান্তি, অনুভব করিলেন না। তিনি আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার জীবন চলিতেছে, সুতরাং তাঁহার মন নির্ব্বিকার যোগে নিয়ত ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। আমি টাকা আনিলাম, আমি ধর্ম্ম প্রচার করিলাম, এ কুবুদ্ধি, কুসংস্কার তাঁহার নাই। ইচ্ছাযোগে যোগী যিনি তাঁহার কোন দুর্ভাবনা নাই, নিজের জন্য কোন কষ্টকর চিন্তা নাই, তিনি সুখে সদা প্রভুর ইচ্ছা পালন করেন। তিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মপাদপদ্মে আপনার সকলি বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আর আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছুই নাই। সকল প্রকার হিতকর কার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা, কিন্তু সংসারী লোকের ন্যায় তিনি যোগভ্রষ্ট হন না। সমাজসংস্কার, গৃহধর্ম্ম, অন্ধ খঞ্জকে দান, রাজ্যশাসন, বিজ্ঞানশিক্ষা, সাধুতাসঞ্চয়, আহার, নির্জ্জনসাধন, কার্য্যালয়ে দৈনিক কর্ম্মনির্ব্বাহ, পরিশ্রম, জ্ঞানাভ্যাস, জীবের দুঃখমোচন, এবম্প্রকার সমুদয় বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য মনোযোগ, কিন্তু তিনি এ সকল আপনি কর্ত্তা হইয়া করিতেছেন এরূপ মনে করেন না।

যিনি অহংজ্ঞানে কিছু করেন না তিনি বিশ্বাস করেন যে, বল ক্ষমতা তাঁহার হাতে নাই, চক্ষু কর্ণ হস্ত তাঁহার অধিকারে নাই, তিনি কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহেন। তিনি বলেন, আমার সেই প্রাণ তো এখন আমার নহে, সেই কর্ত্তার যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়। সুতরাং এ অবস্থাতে কোন বিবাদ নাই, কলহ নাই। জীবন যেন ঋষির শান্তিনিকেতন। সহস্র

বাধা বিপত্তির মধ্যে, ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থাকেন, অথচ তাঁহার অন্তরের যোগ কিছুতেই ভঙ্গ হয় না। তোমাদিগের সকলকে এই ইচ্ছাযোগে যোগী হইতে হইবে। আর্য্য ঋষির ন্যায় ধ্যানযোগে পরমাত্মাতে বিলীন হইবে, আবার সুপুত্র হইয়া ইচ্ছাযোগে পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবে। পিতা-পুত্রের ঐক্য নিতান্ত আবশ্যক। আমি আছি মাত্র, নামে আমি, কিন্তু যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের সম্পত্তি; সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ কি? যাহা ঈশ্বরের তাহাই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও ঐশ্বর্য্য নাই। মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য বলা ব্যাকরণবিরুদ্ধ এবং সত্যবিরুদ্ধ। সমুদয় ক্রিয়ার কর্ত্তা যদি আমি হইতাম, তবে আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিত। কর্ত্তারই কর্ত্তৃত্ব। আমাতে কর্ত্তৃত্ব আরোপ ব্যাকরণবিরুদ্ধ। আমি কর্ত্তা নই, তবে কেন লোকে আমাকে স্বাধীন বলে? ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বই আমার কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং আমি তাঁহার অধীন। আমি বার ঘণ্টা চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণমাত্রায় পরিশ্রম করিলাম, সাধুসঙ্গ করিলাম, মাথার ঘাম পায়ে পড়িল, খুব ভ্রাতৃসেবা করিলাম, রসনাযোগে ব্রহ্মের মহিমা ঘোষণা করিলাম, সমুদয় শক্তিতে মার পদ সেবা করিলাম, পূজা ধ্যান আরাধনা করিলাম, কিন্তু আমার কোন কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাইলাম না। আপনি ঘোর কার্য্যের সাগরে পড়িয়াও আমি কর্ত্তা নহি। আর্য্য ঋষি ধ্যানে ঈশ্বরে যেমন বিলীন, তেমনি সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততা, পরিবারপালন,

দুঃখীর দুঃখহরণ, বিদ্যা উপার্জ্জন, ধর্ম্মবিস্তার, সমুদয় কার্য্য সেই এক ইচ্ছাময়ের সঙ্গে ইচ্ছাযোগে। যখন এরূপ হয়, তখন সাংসারিক সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণতা হইতেছে দেখা যায় এবং সহস্র বিপত্তি বিঘ্নের ভিতরে অন্তরে পূজার আনন্দ, যোগের আনন্দ, অনুভূত হয়। সময়ে যোগানন্দের ভিতরে ছোট ইচ্ছা বড় ইচ্ছাতে বিলীন হয়, পৃথিবীর ইচ্ছা স্বর্গের ইচ্ছাতে ডুবিয়া যায়। ইচ্ছা হয় আমরা সকলে আপন আপন ইচ্ছাকে প্রভুর ইচ্ছাতে বিলীন করি। একেবারে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়িয়া ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হই। ইচ্ছা হয় জগজ্জননী মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পদতলে সমুদয় বাসনা সমুদয় অভিলাষ বিসর্জ্জন করি। ঈশ্বরেতে আমাদের ইচ্ছা বিলীন করাই ব্রহ্মের বৈকুণ্ঠধাম, মোক্ষধাম। ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইলেই জীবের পবিত্রতা এবং শান্তি হইবে।

সয়তানবাদ।

২১এ অগ্রহায়ণ, রবিবার ১৮০২ ; ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮০।

হে ব্রাহ্মসমাজ, সয়তান অস্বীকার করাতে তোমার ক্ষতি না লাভ হইয়াছে? তুমি আমাকে বল, তুমি যে সয়তানবাদ পরিবর্জ্জন করিলে, ইহাতে কি তোমার বিশেষ ইষ্ট সাধন হইল, না ইহাতে অনিষ্ট হইল? প্রত্যেক

ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করি, হে ব্রাহ্ম, তুমি সয়তানরূপ দৈত্য দানব ভূত, পিশাচ, রাক্ষসকে মান না, না মানিয়া তোমার ধর্ম্মোন্নতিসম্বন্ধে কি বিশেষ সুযোগ হইয়াছে? সয়তান কে যে তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিব? সে কে? এক কৃষ্ণবর্ণ পাপকলঙ্কিত ভয়ঙ্কর দুরাচার দানব নরকে বসিয়া আছে। নিয়ত সে তাহার দুরভিসন্ধি ও ধূর্ত্ত ব্যবহারের পরিচয় দিতেছে। ছলে বলে কৌশলে সে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, নর নারীকে সর্ব্বদা নরকের দিকে টানিতেছে। নরক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ, বড় লোক, ছোট লোক, যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুত্র, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকলের মধ্যে সেই অসুর লুকাইয়া বাস করিতেছে। গোপনে বসিয়া জীবের মনের মধ্যে এমন দুষ্ট বুদ্ধি ক্রমে উৎপাদন করে, অসৎ পরামর্শ কুমন্ত্রণা দেয় যে জীব-বুদ্ধিকে একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। বিবেককে আস্তে আস্তে কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পশুভাবকে উহার পদে প্রতিষ্ঠিত করে। কুবাসনা ও কুরুচিকে আহার দিয়া পরিপুষ্ট ও বলী করে। মানুষের মনে যে পশু নিদ্রিত আছে, তাহাকে উত্তেজিত করিয়া জাগ্রৎ রাখে। মানুষ ক্ষীণ হইয়া যায়, পশু সবল হয়, পশুর নিকটে মানুষ হারিয়া যায়। মনুষ্যেতে যে দেবতা আছে অসুরগণ আসিয়া তাহাদিগের অধিকার হরণ করে, এবং আপনাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ জয় লাভ করিয়া সমুদয়

প্রজার সর্ব্বনাশ করে এবং জনসমাজে সকল প্রকার পাপ ও দুঃখ বিস্তার করে। স্ত্রী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লয়। শরীর মনকে পাপে কলঙ্কিত করে, সমুদয় পরিবার, সমুদয় নগর, সমুদয় দেশে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সয়তানের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূখণ্ড সয়তানের পদাশ্রয় গ্রহণ করে।

সেই সয়তান কোথায়? খ্রীষ্ট পুরাণে কথিত আছে তাহার বাসভূমি নরকে, কিন্তু সে তোমার বক্ষের ভিতরে, রক্তের ভিতরে, সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। ইহা অতি পুরাতন মত। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া সকলের মনকে সত্যের আলোকে আলোকিত করিলেন, তখন সকলে বলিলেন, আমরা দুইজন সর্ব্বব্যাপী, দুইজন অনন্ত, মানিতে পারি না। ঈশ্বর এবং সয়তান উভয়ের অধিষ্ঠান এক সৃষ্টির মধ্যে নিতান্ত অসম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে সয়তান সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবী বিভক্ত হইয়া দুইজনেরই অধিকারে অধিকৃত হইতেছে, ইহা আমরা মানিতে পারি না। ঈশ্বর সয়তানকে সৃজন করিলেন, পবিত্র ঈশ্বর হইতে একটা পাপময় পুরুষ উৎপন্ন হইল, শুদ্ধ হইতে অশুদ্ধ প্রসূত হইল; বুদ্ধি এ কথাতে সায় দিতে পারে না। হৃদয় চীৎকার করিয়া সয়তানবাদ মতের প্রতিবাদ করিল। এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারে যেন

তোমরা কল্পিত পুরুষাকার সয়তানকে অস্বীকার করিলে, পাপের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ অসত্য বলিয়া যেন সিদ্ধান্ত করিলে, তার পর জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত ভ্রান্তমত অস্বীকার করিয়া তোমরা মনের অবস্থাকে বিশুদ্ধ করিতে পারিয়াছ কি না? যদি তাহা না হয়, সয়তানবাদীর নিকটে তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে। পাপরূপ একটা বিকটাকার ভূত আসিয়া মানুষের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেয়, এ কথা লইয়া তুমি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু সুবুদ্ধিতে যাহা তুমি নির্ণয় করিলে দেখাইতে হইবে তদ্দারা তোমার পাপ দমন হইয়াছে। কেবল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিলে হইবে না, পাপ অধর্ম্ম পরিহার করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ মতে জীবন বিশুদ্ধ হয়। তোমাকে দেখাইতে হইবে সয়তানবাদ ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিলে চরিত্র ভাল হয়। অনেকে সয়তান মানে না বটে, কিন্তু তাহারা পাপকে অগ্রাহ্য করে। এটি সামান্য মনের কার্য্য। যে ব্যক্তি এরূপ করিল সে এক ভ্রম ছাড়িতে গিয়া আর এক ভ্রমে পড়িল। সয়তান অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে তুচ্ছ করা সাধকের পক্ষে ঠিক নহে। সয়তানের আকার মানিলাম না বটে, কিন্তু পাপকে তদপেক্ষা ভীষণতর বস্তু মনে করি কি না? সয়তানের হাত পা আছে এটি গল্প, সত্য নয়। আমাদের দেহে কেবল এক ঈশ্বর আছেন, সয়তান বলিয়া কেহ নাই। সয়তান আসিয়া আমাদের স্কন্ধে

চাপিয়া বসিয়া আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সয়তানের হাত পা না থাকুক, সয়তানকে বিকটাকার ভয়ানক বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সয়তান মনে হইলে সয়তানবাদীরা ভয়ে বিকম্পিত হয়। চারিদিকে তাকাইয়া মনে করে ঐ বুঝি সয়তান দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া আছে। সয়তানের ভয়ে সকলে ভীত। কখন সয়তান আসিয়া উপদ্রব করিবে এবং সমুদয় হস্তগত করিয়া লইবে এই ভয়ে জনসমাজ সর্ব্বদা শঙ্কিত। আমরা সয়তানবাদ মানি না, সয়তান বলিয়া কেহ ঘরে বা দেহমধ্যে বসিয়া আছে ইহা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা পাপকে সামান্য মনে করিতে পারি না।

পাপের হাত পা নাই, অথচ উহা ভীষণ। সয়তানবাদ ছাড়িতে গিয়া নব ভ্রান্তি উপস্থিত। প্রাচীন ভ্রান্তি চলিয়া গিয়া নূতন ভ্রান্তি আসিয়াছে। প্রাচীন মতে সয়তানের রূপ বর্ণনের তাৎপর্য্য কি? মনুষ্যকে ভয় দেখান। পাপ কত ভয়ানক তাহা বুঝাইবার জন্য উহাকে ব্যক্তিত্ব দিয়া গঠন করা হইয়াছে। তুমি জীবনে যত পাপ করিয়াছ তাহার সমুদয়গুলি একত্রিত করিলে বল তাহা সয়তানকে পরাজয় করে কি না? আপনার পাপের বর্ণ কত জঘন্য, তাহার নিকটে সয়তানের বর্ণ কি? স্বকৃত অধর্ম্মের মুখ কি সয়তান অপেক্ষা বিকটাকার নহে? পাপ অবিশ্বাস ব্যভিচার চুরী ডাকাতী সুরাপান নরহত্যা প্রভৃতি এক একটা পাপের সঙ্গে

শত শত সয়তানের তুলনা হয় না। একটা একটা পাপের ছবি আঁকিলে উহা সয়তান অপেক্ষা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইবেই হইবে। একটি সামান্য মিথ্যা কথা অনেক পাপ অপেক্ষা ছোট, তাহারই যখন অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, তখন ব্যভিচার চুরী ডাকাতি নরহত্যা প্রভৃতি বড় বড় পাপের তো কথাই নাই। আজ ক্ষুধিতকে আহার দিই নাই, দুঃখীকে সান্ত্বনা করি নাই, রোগী ব্যক্তিকে ঔষধ দান করি নাই, এ সকল কথা স্মরণ হইলে গা কাঁটা দিয়া উঠে। আমার কুবাসনা, কুচিন্তা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, অধর্ম্ম, নাস্তিকতা, এ সকল কি সয়তান নহে? ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, ব্যভিচারই পবিত্রতা, অপরের সর্ব্বনাশ পুণ্য, একটি একটি এরূপ কথা সয়তান—ঘনীভূত সয়তান। এ সকল কথা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আপন আপন পাপসয়তানকে আঁকিলে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখা যায়। যদি ভয়ঙ্কর মনে না হয়, তবে তোমার এখনও পাপ বোধ হয় নাই।

বাস্তবিক পাপ অতি ভয়ানক সয়তান অপেক্ষাও ভীষণ। রাগ দ্বেষ হিংসা লোভ এক একটি সয়তান আমাদিগের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদিগের হস্ত পদ নাই, তাহারা দংশন করে না, কিন্তু তাহারা যখন তোমাকে ধরিতে আইসে, তখন কি তুমি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পার? সয়তান নামে কোন ব্যক্তি নাই, এ কথা বলিয়া ফাঁকি দিলে চলিবে না। অনেকে এইরূপ বলেন, সয়তান নাই সুতরাং

প্রবঞ্চনা করিলাম, লোকের মনে কষ্ট দিলাম, কাহাকেও বধ করিলাম, কাহারও ভূমি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলাম, তাহাতে কি হইল? হস্ত পদ থাকিলে, ব্যক্তিত্ব, থাকিলে অবশ্য ভয় হয়, কিন্তু ক্রোধ লোভকে ভয় করিব কেন? উহাদের তো আকার নাই, এইরূপ যুক্তি দ্বারা তোমরা পাপকে অতি সামান্য এবং বিপদকে অতি লঘু করিয়া ফেলিলে। বালকেরা যেমন সয়তানকে প্রেতকে ভয় করে তোমরা ঠিক সেইরূপ পাপ অধর্ম্মকে ভয় করিবে। জ্ঞানী হইয়াছ বলিয়া কি মৃত্যুভয়ে ভীত হইবে না? বিপদকে বিপদ জানা, পাপকে মৃত্যু মনে করা, জ্ঞানী সুবোধের কর্ম্ম। তুমি কি বলিবে, যখন সয়তানের মত ছাড়িয়াছি, তখন পাপ আসিল তাহাতে কি? কি! পাপ আসিল তাহাতে কি? পাপই তো সয়তান। শত শত সয়তান অপেক্ষাও আমাদের দৈনিক পাপ বিকটাকার, সয়তান অপেক্ষাও উহা ভয়ানক বস্তু। উহা জন্তু নয়, ব্যাঘ্র নয়, সাপ নয়, ব্যক্তি নয়, কিন্তু সাক্ষাৎ যম, সাক্ষাৎ মৃত্যু, সাক্ষাৎ ভয়ানক মারাত্মক ব্যাধি। যখন পাপ উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃত সাধকের শরীরে মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অণুমাত্র পাপচিন্তা অসহ্য হইয়া উঠে। এ দেহ সয়তানের বাসস্থান, এ পৃথিবী সয়তানের বিস্তীর্ণ রাজ্য, পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না। সয়তান, তুই প্রাণকে ছাড়িয়া চলিয়া যা, বলিলাম, কিন্তু যেখানে যাই দেখি সয়তান সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। পাপ, তুই সয়তান,

তুই অধর্ম্ম, তুই আমাকে ছাড়, এ কথা বারংবার বলিলেও উহা আমাদিগকে ছাড়িতে চায় না। ষড়রিপু নামে ছয় সয়তান আমাদের রক্তের ভিতরে বসিয়া আছে, কিছুতেই যাইতে চায় না। খুব উচ্চৈঃস্বরে পাপরূপ সয়তানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর,—রে পাপ, রে সয়তান, তোর জন্ম কোথায়, তোর উৎপত্তি কোথায়? চুরী, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি সমুদয় পাপের একই মূল। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে দাঁড়াইলেই পাপ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পুণ্য, তাঁহার অনিচ্ছা পাপ। তাঁহার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিলে পুণ্য হয়, ধর্ম্ম হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তোমরা পূজা কর, সাধু কার্য্য কর, দান ধ্যান কর। তাঁহার ইচ্ছা পূরণই সাধুতা। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে তোমরা রাগ কর, কাহারও অনিষ্ট কর, কাহারও প্রাণ বধ কর। তাঁহার এই অনিচ্ছাসাধনই পাপ।

ব্রহ্মের ইচ্ছা যাহা নয়, ব্রাহ্মের পক্ষে তাহাই সয়তান। যাহা কিছু ঈশ্বরের নয়, তাহাই সয়তানের। আমাদিগকে ঈশ্বর অনেকগুলি টাকা দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন এই সকল গরীব দুঃখীদিগকে বিতরণ কর, আমি তাহার একটী পয়সাও তাহাদিগকে দিলাম না, স্বার্থপর ও নির্দ্দয় হইয়া আপনি সমুদয় লইয়া ভোগ করিলাম। এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ হইল ইহাই সয়তান। বাস্তবিক আমাদের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতাই ঈশ্বরের শত্রু সয়তান।

কোমল বক্ষ কখন পরের দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারে না, দুঃখীকে কষ্ট দিতে পারে না। ভাই ভগ্নী সম্মুখে মরিতেছে দেখিয়া মদ্যপান করা, ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত হওয়া অথবা আপনার সুখের জন্য শত শত দরিদ্রের প্রাণবধ করা, ইহা সয়তান না হইলে কে করিতে পারে? যাহার জীবন এ প্রকারে পরিচালিত তাহাকে সয়তান ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? ব্রাহ্ম, তুমি আপনার নির্দ্দয় হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় সয়তান? বিবেক তোমার দুষ্ট ইচ্ছাকে দেখাইয়া দিবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী স্বার্থপরতাকে সয়তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

ধনে কি হইবে যদি সে গরীবের দুঃখ হরণ না করিল, রোগীকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, অজ্ঞকে জ্ঞান না দিল? প্রভুর ইচ্ছা যে আমরা দয়ালু ও প্রেমিক হই, তাঁহার নিকটে ধন পাইয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব না, ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত। আমার ইচ্ছা এই যে সমস্ত ধন রাখিয়া দি, পুত্র পৌত্র ক্রমে উহা সম্ভোগ করিবে। অন্য লোকে উহার কিছু অংশ পায় আমার ইচ্ছা নয়। আমার এ ইচ্ছা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইল। আমি আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজ করিলাম। এই যে ইচ্ছার বৈপরীত্য ইহাই সয়তানস্বরূপ। এই এক ভয়ানক ব্যাপার যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

আর এক ইচ্ছা নিয়োজিত হইল। এই বৈপরীত্য, ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ, ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা, ইহাই পাপ, ইহাই আমাদের সয়তান। এই স্বেচ্ছাচার, এই অসাধুতা ভিন্ন আর সয়তান নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলিব না, অথচ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব, উপাসনা করিব, সাধন ভজন করিব, ইহা যে মনে করে সে অতি মূর্খ। আমরা যে সকল কাজ করি আমরা যে খাই বেড়াই, তাহা কি ঈশ্বরের ইচ্ছামত না আমাদের ইচ্ছামত? আমরা যেমন খাই বেড়াই পশুরাও তেমন খায় বেড়ায়। ঈশ্বরের ইচ্ছার কর্ম্ম না করিলে কোন কর্ম্ম ধর্ম্ম হয় না, অতি উচ্চ ও পবিত্র কার্য্যও অসার। জগদীশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না। ব্রহ্মেচ্ছার বিরুদ্ধে এক বিন্দু জল পান করিলেও তাহা পাপ। সংসার হউক, ধর্ম্ম হউক, যে কোন বিষয়ে ব্রহ্মের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিবে, হে ব্রাহ্ম, তাহাতেই তোমার পাপ হইবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ তুমি কখন করিতে পার না। প্রাতে, দুপ্রহরে, রাত্রে পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহারই ইচ্ছায় সাধক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলেন, উপাসনা করিলেন, সংসারের কার্য্য করিলেন, রাত্রে শয্যায় সুখে শয়ন করিলেন। তিনি সুখী, কেন না তিনি সমুদয় দিন প্রভুর ইচ্ছা পালন করিলেন। তাঁহার হৃদয় মন সুস্থ নিশ্চিন্ত শান্ত প্রফুল্ল। তিনি তাঁহার

আদেশক্রমে শরীরের গ্লানি ও অসুখ দূর করিয়া সুস্থমনা হইয়াছেন। যাহা কিছু ভ্রান্তি তাহা খণ্ডন করিয়া মনকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আত্মাকে শান্ত ও শুদ্ধ করিয়াছেন, ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছা ঘোষণা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, এবং চারিদিকে শান্তি বিস্তার করিয়াছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা-ধীন অনুগত দাস কেমন সুখী!

আমরা আমাদিগের ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত ইচ্ছাকে ভয় করিব। সয়তানবাদিগণের সয়তান অপেক্ষা পাপ আমা-দিগের অধিকতর ভয় ও সন্তাপের কারণ হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত যে কোন বাসনা ও ইচ্ছা তাহাকে সয়তান জানিয়া সদা জাগ্রৎ থাকিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাকে ঐ শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। দুর্নীতি দুরাচার কুপ্রবৃত্তি কুরুচিরূপ সয়তান সর্ব্বদা তোমার আমার হৃদয়ের ভিতরে আছে। কি উচ্চ কি নীচ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু না কিছু আছে দেখা যায়। ঐ দেখ অন্তরে অহঙ্কার সয়তান বসিয়া আছে। অহঙ্কার লেখা পড়া সাধন ভজন ভাল কার্য্যসমূহের মধ্যেও লুকাইয়া থাকে। ঐ গুপ্ত শত্রুকে ত্বরায় বিনাশ কর। স্বার্থপরতা আর একটি ভয়ানক পাপ। পরের সুখ দুঃখে ঔদাসীন্য, আপনার সুখে মত্ততা, এই ভয়ানক স্বার্থপরতাকে যখন দেখিবে, তখনই ঐ রাক্ষস রক্ত খাইতে আসিল

বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। দয়াময় রক্ষা কর বলিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। যখনই এই সকল পাপ দেখিবে তখনই ঠিক মনে করিবে উহারা ঈশ্বরের শক্র, তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিতেছে, তোমার গলা কাটিবে। এই উপাসক-মণ্ডলীমধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের ভিতরে কোন না কোন আকারে সয়তান প্রবেশ করিয়া আছে। উহার গুপ্ত দুর্গ সকল চূর্ণ কর, যেখানে দল বল লইয়া পরব্রহ্মের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিতেছে সেই সকল দুর্গম দুর্গ বিনাশ করিয়া ফেল।

ভক্ত বলেন আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে কখন অন্তরে স্থান দিব না, আমি বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিব না, এই আমার ইচ্ছা। ইচ্ছাময় হরি যিনি ইচ্ছা তাঁহারই, আমার ইচ্ছা করিবার কোন অধিকার নাই। ধন সম্পদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরের, আমার কি আছে? আমার কাজ কেবল তাঁহার ইচ্ছাতে বিলীন হইয়া ইচ্ছাযোগে যোগী হওয়া। সমুদয় তাঁহাকে দিলাম, তবে ইচ্ছার বিষয় কি রহিল? আমি আর কি ইচ্ছা করিব? সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইবে। যাহা কিছু ভাল হইবে আমার জন্য নহে, তাঁহারই জন্য। আমার ভাল খাইবার ভাল পরিবার ইচ্ছা রহিল না। সমুদয় ইচ্ছা ঈশ্বরের পাদপদ্মে। এই পুণ্যে পুণ্যবান্ হইতে আমরা চেষ্টা করিব। মানুষ বধ করিলাম না বা মিথ্যা বলিলাম না, তাহাতেই কি আমরা সাধু হইলাম? এইরূপ হইলেই

কি আমরা শ্রেষ্ঠ লোক হইলাম? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, প্রাণের ভিতরে এমন কিছু আছে কি না যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত। যখনই দেখিবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কোন বাসনা আছে, তখনই জানিবে সয়তান যম তোমার মরণের ফাঁদ পাতিতেছে। দেহ ধন মান মন সকলের উপরে একমাত্র ঈশ্বরকে কর্ত্তা করিয়া রাখিবে। সকলে ইচ্ছাযোগ সাধন কর, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সমস্ত বিলীন কর। যখন ঈশ্বর আজ্ঞা করিবেন খুব কাজ কর, তখন খুব কাজ করিবে, যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করিবেন উপাসনা কর, তখন উপাসনা করিবে, যখন তিনি আদেশ করিবেন ধ্যান কর, তখন ধ্যান করিবে। তোমাদের সকলই সেই কল্যাণদায়িনী জননীর ইচ্ছাতে বিলীন হইল। যখন ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া গেল তখন কেমন শান্তি! তখন আর পাপের ভয় পাপের জ্বালা থাকে না। পিতা যাহা বলিতেছেন পুত্র তাহাই করিতেছেন। আমি সয়তানকে ছাড়িয়া মার হ.লাম, আর মৃত্যুভয় রহিল না। ইহাতে ভক্তের কেমন আনন্দ!

শমনবাদ।

২৮এ অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৮০২; ১২ই ডিসেম্বর ১৮৮০।

সয়তানের ভয় যেমন, লোকের শমনভয়ও তেমনি, কেবল অন্ধকারের মধ্যে এ ভয় স্থান পায়, আলোকের মধ্যে ইহা

থাকিতে পারে না। জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল সয়তানের ভয় শমনের ভয় চলিয়া যাইবে। যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণ মনুষ্যের মনের ভিতরে দুইই স্থান পাইবে। খৃষ্টধর্ম্মে সয়তানের ভয়, হিন্দুধর্ম্মে শমনের ভয়। হিন্দুসমাজে যমের বিভীষিকা, শমনের বিভীষিকা কেমন প্রবল তাহা তোমরা অবশ্যই জান। যমালয়, শমনভবন, কি ভয়ানক স্থান! যত পাপী পতিত ব্যক্তিদের আলয়। সেখানে ভয়ানক যন্ত্রণা। যমের আলয়ে অসহ্য যন্ত্রণার আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। ভীষণ যমালয়! স্মরণমাত্র হিন্দুর প্রাণ বিকম্পিত হয়। মৃত্যুশয্যায় শমনভয়ে লোকে চীৎকার করিয়া কাঁদে। এখানকার সংসার এখানে থাকিবে, যমালয়ে গিয়া পাপের দণ্ড সহ্য করিতে হইবে। কত হিংস্র জন্তু দংশন করিবে, সাপের মুখে পড়িতে হইবে, উত্তপ্ত তৈলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, অগ্নিদগ্ধ হইতে হইবে, আরও কত যন্ত্রণা সহিতে হইবে কে জানে? সকল হিন্দুই মরণের ভয়ে ভীত, সমুদয় হিন্দুসমাজ শমনভয়ে জব্দ। সয়তানের ভয়ে খৃষ্টসমাজ শাসিত, শমনের ভয়ে হিন্দুসমাজ শাসিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেখি সয়তান নাই, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি শমন নাই। যম কে? কল্পনার পুত্র। মনুষ্যমন আপনি শমন কল্পনা করিয়াছে, তাহাকে ভয়ঙ্কর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে। কল্পিত শমন একটি পুরুষ। তাহার নাম করিলেই সকলের ভয় হয়।

যাহার প্রতি এত ভয় সেই যম মানুষের মনের ভিতরে হৃদয়ের ভিতরে। যমালয় বলিয়া বিশ্বমধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে গিয়া পাপীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পাপের দণ্ডভোগ যে নরকে তাহা মানুষের অন্তরে। হরিনাম সাধন করিলে আর যমালয়ে যাইতে হয় না। কিন্তু একটু অধর্ম্ম হইলেই যমালয়ে যাইতে হইবে। পাপ এমনি, অমন যে সাধু যুধিষ্ঠির তিনি প্রকারান্তরে একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য যমের ভবনে গমন করিতে হইয়াছিল। সেখানে পাপের জন্য সকলকেই যাইতে হইবে। যমালয়ে সকলকেই প্রবেশ করিতে হইবে, সকলকেই যমের হস্তগত হইতে হইবে। তাহার অধিকার বিস্তৃত, তাহার রাজ্য সর্ব্বত্র। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সকলকেই তাহার বিস্তীর্ণ মুখে পড়িতে হইবে।

যমের ভয় সকলেরই আছে। যম আছে, যমালয় আছে ভাবিয়া লোকের উপকার হয়। যাই লোকে মনে করে যমালয়ে যাইতে হইবে অমনি মৃত্যুকে পরাজয় করিবার জন্য মনুষ্য হরিনাম সাধনে ব্যস্ত হয়। এই ভ্রম সাধকের পক্ষে হিতকর কেন না যম টানিবে এই ভয়ে ভীত হইয়া সাধক হরিনাম করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে যত্নবান্ হয়। ব্রহ্মসাধক জানেন যে তিনি মরিবেন না, তিনি অক্ষয়, তিনি দেবত্ব লাভ করিবেন, নিম্নে যাইবেন না, উর্দ্ধে তাঁহার গতি। যম

যেমন অন্ধকারে বাস করে, ব্রহ্মপরায়ণ সাধু তেমনি আলোকে বাস করেন। সাধকের উপর শমনের অধিকার নাই। যাহার হরিভক্তি আছে, তাহাকে কি যম স্পর্শ করিতে পারে? ঈশ্বর তাহাকে নিষ্কৃতি দেন। যে ব্যক্তি শমনভয়ে ভগবানকে স্মরণ করে, তাহার শমনভয় থাকে না, মৃত্যুযন্ত্রণা বারণ হয়। যমের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতে না হয়, এজন্য মনুষ্য ধর্ম্ম সাধন করে, এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়।

যে শমনের ভয় এত প্রবল সে শমন কিরূপ? তাহাকে কিরূপে জয় করা যায়? ব্রাহ্ম আমরা আমাদের বিশ্বাস এই যে শমন ব্যক্তি নহে, শমন পুরুষ নহে; যম নাই, যমালয়ও নাই। এ সকল মনুষ্যচিত্তের কল্পনা। ভয়ে লোকে যমরূপ সংগঠন করিল। ঈশ্বরের অনিচ্ছাই যম, উহার অপর নাম সয়তান। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, এই মৃত্যুই যম, শমন ও সয়তান নামে আখ্যাত, ইহারই ভয়ে সকলে কম্পিত। শমন আর কিছু নহে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ; তাঁহার ইচ্ছালঙ্ঘনে মৃত্যু। মনের ভিতরে যথার্থ যমালয়। যম অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে, শয্যা অগ্নিময় করিবে, ভীষণ জন্তু সকল দংশন করিবে, এ সকল আর কল্পনা করিতে হইবে না। মনের ভিতরে যাও, দেখিবে যমের বিকট মূর্ত্তি। যেখানে যাও এই যম তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এই যম বিকৃত হৃদয়ের নিকট অতি ভয়ানক।

যম বিকারের রোগীকে কম্পিত করে, রোগী রোগশয্যায় পড়িয়া কত বিভীষিকা দেখে, চারিদিকে ভীষণ যমদূতসকল দর্শন করে। অন্তরের ভয়ঙ্কর যমের নিকট এ সকল কল্পিত যমকিঙ্কর কিছুই নহে। আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, নর-হত্যা করিয়াছি পরদ্রব্য হরণে কলঙ্কিত হইয়াছি, সেই সমুদয় আমার মনকে যন্ত্রণারূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করি কোনরূপে নিদ্রা হয় না, সুশীতল বায়ু কোন প্রকারে পাপসন্তপ্ত শরীরকে শীতল করিতে পারে না। যাহাদিগকে বধ করিয়াছি, যাহাদিগের প্রতি অত্যা-চার করিয়াছি, দেখি তাহারা আসিয়া আমাকে বিভীষিকা দেখায়। হৃদয়ে আমার একটুমাত্র শান্তি নাই, পাপ ভয়ে অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শিয়রে আমার ভয়ঙ্কর যমদূত, ক্ষণকালও আমাকে আরাম দেয় না। হিন্দু খৃষ্টান উভয় ধর্ম্মেতে আমরা দেখিতে পাই পাপে মনুষ্যের মৃত্যু। বাস্তবিক মৃত্যুই শমন ও সয়তান।

আপন আপন জীবন দেখিলে পাপ যে মৃত্যু তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, এজন্য কোন পুস্তক পড়িতে হয় না। বাহিরে মৃত্যুর আলয় কেন খুঁজিতেছ? এখানে ওখানে যমালয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ কেন? ঈশ্বরের বিরোধী ষড়রিপু ভয়ঙ্কর যম অন্তরেই রহিয়াছে। এই যম কখন আমাদিগের মস্তকের কেশ ধরিয়া টানিতেছে কখন আমাদিগের রক্ত পান করিতেছে, কখন আমাদিগের স্কন্ধে

চাপিয়া বসিয়াছে। কল্পিত যমালয় দেখিয়া আমাদিগকে আর ভীত হইতে হইবে না। পাপরূপ মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে যথেষ্ট ভয় দেখাইতেছে। যদি যমদূতের ভয়ের সাহায্যে আমাদিগকে ধাৰ্ম্মিক হইতে হয়, তবে তাহারা আমাদিগের হইতে দূরে নাই। অন্তরে যমালয় দেখিলেই ভয় হইবে। যম নাই বলিলে ইহাই বুঝায় যে পাপ বস্তু নয়। সকলে পাপ বলিয়া এমনি চীৎকার করে, যেন পাপ নামে কোন বস্তু আছে। যথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে, সয়তান বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই, যম বলিয়া কোন লোক নাই, পাপ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ইহাদিগকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। পাপ আর কিছু নহে ঈশ্বরের অনিচ্ছা।

পাপ যম সয়তান সকলি অভাব পদার্থ, ভাব পদার্থ নহে। ঈশ্বরের অনিচ্ছা পাপ, যাহা নহে, যাহা নাই, যাহা অভাব-বাচক তাহাই পাপ। ইহাতে কোন বস্তু বুঝায় না। ঈশ্বর যেমন নানাবিধ বস্তু ও পদার্থ সৃজন করিয়াছেন তেমন পাপ বলিয়া একটি বস্তু সৃজন করেন নাই। যাহা ধৰ্ম্ম নহে, পুণ্য নহে, প্রেম নহে, তাহাই পাপ। ইহার আকার নাই, গঠন নাই, হৃদয়ের বাহিরে ইহার আবাসস্থান নাই। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মনুষ্যের ইচ্ছার সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন সেই বিরোধ অবজ্ঞা ও অবমাননার অবস্থাই পাপ। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিচ্ছা ইহা ছাড়া পুণ্য নাই, পাপ নাই।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বস্তু, যাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, যাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, তাহা অবস্তু। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল, তাহাই সত্য। এটী ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে, মনে হইলেই কম্পিত হইবে, তখনই মনে করিবে এই যমালয়ে প্রবেশ করিতেছি। তিনি বলিলেন, এইটি করিও না, যাই করিলে অমনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলে। এই পাপে এই অপরাধে সয়তানের কুমন্ত্রণায় স্বর্গ হারাইলে, তোমাকে নরকে পড়িতে হইল। ঈশ্বর অনিচ্ছার সমষ্টির নাম যম ও সয়তান। তুমিই তোমার যম, তুমিই তোমার সয়তান। অন্যে যাহা বলুক, তুমি দিব্য চক্ষে দেখিবে, যাই তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অমনি শমন তোমায় টানিল, তোমার মৃত্যু হইল। মৃত্যু কি? ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি। শারীরিক মৃত্যু, মৃত্যু নহে। রোগে লোকের মৃত্যু হয় না, পাপেই মৃত্যু।

পাপীদের জন্যই যমালয়। তুমি দরিদ্রের দুঃখ হরণ করিলে না, নিষ্ঠুর হইলে, যমদূত আসিয়া তোমাকে ধরিল, তখনই তোমাকে বলপূর্ব্বক হৃদিস্থিত গুপ্ত যমালয়ে লইয়া গেল। তুমি পরের অনিষ্ট করিলে, সর্ব্বনাশ করিলে, পরের রক্ত শোষণ করিলে, এই অপরাধের জন্য তোমার চিত্ত আকুল হইবে, অন্তরে ভয়ানক গ্লানি উপস্থিত হইবে, মন যমালয় হইতেও অত্যন্ত জঘন্য হইবে। পাপের অন্ধকার, পাপের দুর্গন্ধ পাপের যন্ত্রণাই মনুষ্যের মনকে শমনভবন

করিয়া তুলে। এমন বন্ধু কে আছে যে তোমাকে এই মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবে? কে তোমাকে যমের মুখ হইতে রক্ষা করিবে? যমদূত যখন তোমাকে ধরিল তখন হাজার বল, ওরে যমদূত, তোর হাতে ধরি, আমাকে মারিস্ না, এ কথা বলিলে সে শুনিবে না। রে যম, তুই এত কষ্ট দিলি, এত যন্ত্রণা দিলি, বলিতে বলিতে তোমার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এ অবস্থায় কেহ রক্ষক নাই, কেহ তোমাকে দয়া করিয়া বাঁচাইবে না। তাই ঈশ্বর আপনি মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরিয়া ধরাতলে প্রকাশিত হইলেন। ঈশ্বর আপনার পবিত্র ইচ্ছায় পুণ্য স্বজন করিলেন। মানুষ সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইল। জীবের অবাধ্যতা পৃথিবীতে মৃত্যু আনিল। মৃত্যু আসাতেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রকাশ হইল। যদি মানুষের পাপেতে মৃত্যু না আনিত, ঈশ্বর কখন মৃত্যুঞ্জয় রূপ ধরিতেন না। মৃত্যু না হইলে নিষিদ্ধফল ভক্ষণ না করিলে আমরা ঈশ্বরের মৃত্যুঞ্জয়রূপ দেখিতে পাইতাম না।

ঈশ্বর অনন্ত জীবনস্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ মৃত্যু, তাঁহার সঙ্গে পুনর্মিলন নবজীবন, জীবননাশে মৃত্যু আবার মৃত্যুনাশে জীবন। যম মনুষ্যকে মারিল, আবার যমকে মৃত্যুঞ্জয় মারিলেন। মৃত্যুরূপী শমনকে দমন করিয়া তিনি শমনদমন নাম লইলেন। মৃত্যুঞ্জয় কিরূপে সন্তানের মৃত্যু দেখিয়া উদাসীন থাকিবেন? সন্তানের চীৎকার বিলাপ-

ধ্বনি শুনিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয়রূপে অবতীর্ণ হইলেন, পৃথিবীর সৌভাগ্যোদয় হইল। মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুনিবারণ ঔষধ দিলেন, মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিলেন। পাপের বিষপানে যাহারা মরিয়াছিল তাহাদিগকে অমৃতরস নিত্যানন্দরস দিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। যমালয় হইতে হরিনামধ্বনি করিতে করিতে শত শত পাপী স্বর্গারোহণ করিল। হে ব্রাহ্ম! তুমি মৃত্যুকে ভয়ানক দানব মনে করিয়া ভয় করিও না। মরণ কি কোন পদার্থ হইতে পারে? মরণ নামে কোন বস্তু নাই, মরণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ইহা অপদার্থ। শমনের হস্ত হইতে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় মৃত্যুঞ্জয় নামসাধন। ব্রহ্মমন্দিরে জীবনস্বরূপকে ডাকিলে মৃত্যু পলায়ন করিবে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাবে রবিজ বিনষ্ট হইবে। ঈশ্বরের পুণ্যময়ী ইচ্ছা প্রবল হইলে মানুষের পাপময়ী ইচ্ছা মরিবে, যমের আধিপত্য ঘুচিবে এবং জীবনের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাপন্ন হইলে আমা-দিগের জীবন কি কেহ বিনাশ করিতে পারে? আমরা মৃত্যুকে কাঁপাইব, মৃত্যুকে মারিব। আমাদিগের মৃত্যুভয় এত প্রবল কেন? আমরা শমনদমনকে তত মানি না এই জন্য। তাঁহাকে মানিলে তাঁহার বলে আমরা মৃত্যুকে মারিয়া নব জীবন লাভ করিব। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে পৃথিবীতে মৃত্যু আসিল, এখন অভিনব বিধানে নিত্যানন্দরসামৃত পান করিয়া জীব পুনরায় জীবন লাভ করিবে।

মরণের আবার মরণ আছে তাহা কি তোমরা জান না? তোমরা যমকে ও সয়তানকে বিদায় করিয়া দাও। পাপ কি সৎ যে উহা চিরস্থায়ী হইবে? পাপ কি সর্ব্বশক্তিমান যে উহা আর সকল শক্তিকে পরাজয় করিয়া আপনি দিগ্বিজয়ী হইবে? না। অসার পাপ সারাৎসারের হাতে মরিবে। মৃত্যু সকলকে মারে, আবার মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে মারেন। যাহারা মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করে তাহাদিগের মৃত্যুকে ভয় কি? ঈশ্বর সয়তানকে, পাপকে মারিবেন, যমকে কাটিবেন, তোমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইও না। আমরা মরিব কেন? বিশ্বাসে অনন্ত জীবন লাভ করিব। জীবন অস্ত্রে শমনের মস্তক ছেদন কর। ঈশ্বরের অনিচ্ছা মন হইতে একেবারে বিদায় করিয়া দাও। ঈশ্বরের ইচ্ছার যত জয় হইবে ততই জীবন ও কল্যাণ, যত ইচ্ছা ভাঙ্গিবে ততই জীবন হইতে ভ্রষ্ট ও মৃত হইবে। মৃত্যুকে যমালয়ে প্রেরণ কর। নিয়ত এই প্রার্থনা কর যেন তোমরা যমকে মারিয়া এ দেশকে উদ্ধার করিতে পার, শমনদমন নামে চারিদিক কাঁপাও, শমন আর থাকিবে না। ঈশ্বরের অনিচ্ছাতে শমন জন্মিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে শমন মরিবে।

সয়তানকে, শমনকে মারিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নববিধান মৃত্যুঞ্জয়ের নিশান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলেই যমের মৃত্যু হইবে, মৃত্যুর মরণ হইবে। আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম করিয়া সমুদয় ব্যাধি রোগ ও বিনাশের

কারণ নির্ম্মূল করিব, আমাদিগের ভয় করিবার কিছুই থাকিবে না। যদি কাহাকেও ভয় করি অন্তরের পাপকে ভয় করিব, ঈশ্বরের অনিচ্ছাতে মৃত্যু জানিয়া উহাকে ভয় করিব। ঈশ্বরের পদারবিন্দ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ-ধ্বনিতে তাঁহার নাম গান করিতে থাকিব। আনন্দময়ীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুভয় শেষ করিব। অব্রাহ্ম অব-অবস্থায় এত দিন আমরা মৃত্যুকে ভয় করিয়াছি, এখন আমরা মৃত্যুকে ভয় দেখাইব। যমকে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিব,— "আমরা তোর আসামী নইরে শমন।" মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার সন্তানদিগকে মরিতে দিবেন না। সকলে তাঁহার পূজা কর, আর মৃত্যুমুখে পড়িতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হও নির্ভয় হও, মৃত্যুরাজ্যের রাজা শীঘ্র মরিবে। ঐ যম আসিতেছে, মনুষ্য-সন্তানকে গ্রাস করিতেছে, লোকের আর একপ বলিতে হইবে না। মৃত্যুঞ্জয়ের নিশান হস্তে ধারণ কর, তাঁহার নামে পবিত্র হও, দ্বিজ হও। কিসের ভয়, কিসের ভাবনা? দ্বিজের কি মরণ সম্ভব? আনন্দধ্বনিতে মৃদঙ্গ বাজাইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের নাম চারিদিকে প্রচার কর। পৃথিবীর অকল্যাণ চলিয়া যাইবে, যাহার নামে সকলে কাঁপে সেই ভীষণ শমন পলায়ন করিবে।

যোগানন্দ।

৫ই পৌষ রবিবার, ১৮০২ শক; ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৮০।

ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা যে পৃথিবীর যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে তত উহা ধ্যানবিহীন হইতেছে। বালক পৃথিবী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইত, গাঢ় যোগানন্দরস সম্ভোগ করিত। পৃথিবী যখন বালক ছিল তখন উহা ধ্যানের সোপানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যুবা পৃথিবী ধ্যানের পথে যোগের পথে চলিতে চায় না। যুবা পৃথিবী যোগধ্যানবিহীন। কার্য্যের ব্যস্ততা যুবা পৃথিবীর প্রধান লক্ষণ। দক্ষিণ হস্ত কলিযুগে ধর্ম্মের প্রধান সহায়। পৃথিবীর বাল্যকালে এই কথা ছিল, চক্ষু নিমীলন না করিলে ধ্যান ও প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় না। বর্ত্তমান যুগের কথা এই যে, চক্ষু না খুলিলে ধর্ম্ম হয় না। পৃথিবীর বর্ত্তমান বংশীয় লোকের নিকটে ধ্যানের নাম করিও না, যোগের কথা বর্ত্তমান যুগকে শুনাইও না। বর্ত্তমান কালের সভ্য জাতি কেবল কর্ম্ম করিবে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। তাহারা বলে ধ্যান কি? যোগ কি? আত্মা আবার কি? পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ সে আবার কি? এ সকল বিষয় তাহারা অনুসন্ধান করিবে না। বর্ত্তমান কালের যুবকেরা যোগ সমাধি কি, এ সকল আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা কালক্ষয় মনে করে।

হায়! বালক পৃথিবী ও যুবা পৃথিবীর কত প্রভেদ! চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে কেমন ধ্যান যোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই প্রতাপান্বিত তেজস্বী যোগী ঋষিদিগের যোগ সমাধির জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ। সেই ভারতবর্ষীয় আর্য্য মহর্ষিকুল চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ধ্যানের প্রভাবও চলিয়া গিয়াছে। এখন ভারতের ধ্যানের ভাব নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন ভারতে আত্মার পুষ্টি নাই, এখন ভারত শারীরিক সুখের জন্য, বাহ্যিক সভ্যতার জন্য ব্যস্ত। ভারতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক সাধনের প্রাদুর্ভাব নাই। কোথায় সেই যোগী ঋষিগণ, কোথায় সেই উচ্চ ও গভীর আধ্যাত্মিকতা? ব্রাহ্মসমাজ, তুমি ভারতের প্রাচীন গৌরব উদ্ধার কর। যে ধ্যান করে না, যে যোগাভ্যাস করে না, তাহাকে ভারতের পুত্র বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিবে? প্রত্যেক ভারত সন্তানের ধ্যান-প্রিয় হওয়া উচিত। ধ্যানপ্রিয়তা আর্য্যবংশের প্রধান লক্ষণ, যোগই তাঁহাদের জীবন। ভারত বাল্যকালে যোগভূমিতে কেমন খেলা করিত, যোগচক্ষে ব্রহ্মরাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখিত, যোগকর্ণে দৈববাণী শ্রবণ করিত, যোগহস্তে আকাশের যোগ-চন্দ্র ধরিত, যোগরসনায় যোগানন্দরস পান করিত। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ পৃথিবীতে থাকিয়াও যোগবলে দেবলোকে বিচরণ করিতেন, এখন আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া কীটের ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখকর্দ্দমে

লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই পৃথিবীতেই আমরা বদ্ধ রহিয়াছি।

আত্মন্, আর তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া জড় বস্তুতে বদ্ধ থাকিও না। তুমি কি জড় অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থ নও? হে মোহাচ্ছন্ন আত্মা, হে প্রচ্ছন্ন হৃদয়, তুমি শরীররাজ্য অতিক্রম করিয়া, জড় ভেদ করিয়া আপন গৌরব প্রকাশ কর। এই ইন্দ্রিয়রাজ্য ছাড়িয়া, এই শরীর ভাঙ্গিয়া, হে আত্মন্, আবার তুমি আপনার রাজ্য স্থাপন কর। তুমি আর পরের বাটীতে থাকিও না, আপনার ঘর নির্ম্মাণ কর। আমি বাস্তবিক বুঝিতে পারি না, বাল্যকালে যে দেশে এত ধ্যান যোগের প্রাদুর্ভাব, যৌবনে কেন সেই দেশ যোগভ্রষ্ট হইল। ধ্যানে অরুচি, যোগে ঔদাসীন্য, যোগভ্রষ্ট ব্যবহার, বাস্তবিক আর্য্যোচিত কার্য্য নহে। আমরা নববিধানাশ্রিত লোক। আমরা ধ্যানপ্রিয় হইব, আমরা যোগের পক্ষপাতী হইব। যদি বল সংসারাশ্রম, গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল যোগ ধ্যান করা কি উচিত? নিজের প্রতি পরিবারের প্রতি সমাজের প্রতি কত কর্ত্তব্য আছে। সে সকল কর্ত্তব্য পালন না করিয়া, সন্তানাদি পালন, পরসেবা, দেশের উপকার প্রভৃতি সৎকার্য্য না করিয়া, কেবল কি যোগ সাধন করা উচিত? ব্রহ্মমন্দির এই প্রশ্নের এই উত্তর দিতেছেন, যখন ভারতবর্ষে যোগ ধ্যানের প্রতি এত অরুচি দেখা যাইতেছে, যখন এক বিষয়ে এত ব্যভিচার দেখা যাইতেছে, তখন

অন্ততঃ কিছুকাল বিশেষ যত্ন সহকারে যোগতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে যোগ ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য হইবে। ব্রহ্মমন্দির কর্ম্ম ও যোগ ইহার একটিও ছাড়িতে বলেন না। ব্রহ্মমন্দির উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য এই কথা বলিতেছেন, যখন কেবল কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়সেবা, এই শব্দ হইতেছে, তখন কেবল ধ্যান ধ্যান ধ্যান, যোগ যোগ যোগ এই কথা অন্ততঃ কিছুদিন বলিলে কল্যাণ হইবে।

এখন ভারতে কেবলই কার্য্যব্যস্ততা, কেবলই অর্থোপার্জ্জনচেষ্টা, ঈশ্বরের জন্য, গভীর ধর্ম্মের জন্য, অতি অল্প লোকেই ব্যস্ত। যেখানে যাই কি রাস্তায়, কি বিদ্যালয়ে, কি পুস্তকালয়ে, কি কার্য্যালয়ে সর্ব্বত্র কেবল ইন্দ্রিয়রাজ্য; সকলেই ইন্দ্রিয়সুখের জন্য ব্যস্ত। চক্ষু বন্ধ করিয়া কেহ যে কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া পাঁচ মিনিট ধ্যান করিবে তাহা প্রায় দেখা যায় না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মেরাও ধ্যানকে ভয় করেন। অনেক ব্রাহ্মও বলেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া কি কেবল অন্ধকার দেখিব? এখন চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে বেশ নয়নতৃপ্তিকর নগর, বাগান, বৃক্ষ, লতা, নদ, নদী, ঘোড়া, গাড়ী এবং নর নারী, কত প্রিয় বস্তু দেখিতেছি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাইব না। এইরূপ যোগধ্যানবিহীন ব্রাহ্মকে যাই ধ্যানের আসনে বসিতে বলিলে অমনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাহার চক্ষে নিদ্রা

আসিতে লাগিল। হে ভারতের আর্য্যসন্তান, তোমার এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার কেন? তুমি আর্য্যসন্তান, যোগের কথা শুনিলে তোমার ভয় হয়, কষ্ট হয়? যখন আমি ধ্যানের কথা বলিব, তখন, হে আর্য্যব্রাহ্ম, তোমার এই কথা বলা উচিত, "আহা! কি সুমিষ্ট কথা বলিলে। পৃথিবীর কোন বস্তু ধ্যানের ন্যায় সুমিষ্ট নহে। ব্রহ্মধ্যান করিতে অনুরোধ করিতেছ, কি সরস নিমন্ত্রণ! একটিবার এই অসার সংসার হইতে বিদায় লইয়া ব্রহ্মরূপ দেখিয়া আসিব, স্বর্গ দেখিয়া আসিব? আহা! কি মধুর সংবাদ!!" হে চঞ্চল মনুষ্য, তুমি মনে কর ধ্যান বড় কঠিন ও কঠোর। কিন্তু যিনি যোগ ধ্যান অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি জানেন ধ্যান বড় সরস এবং সুমিষ্ট। তুমি অভ্যাস কর নাই বলিয়াই তোমার পক্ষে ধ্যান এত কঠিন। অভ্যাস ভিন্ন ধ্যান সহজ এবং সুমধুর হয় না।

যদিও অনেক বৎসর হইল এই উপাসনামন্দিরে ধ্যান-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক, অনুরাগের সহিত ধ্যান সাধন করেন। ব্রাহ্মগণ, যদি তোমরা ধ্যানে সুখ পাইতে, যদি তোমরা প্রকৃত যোগানন্দরসের আস্বাদন জানিতে, তাহা হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি জন্য যেমন তোমরা দৌড়িয়া গিয়া আহার পানীয় গ্রহণ কর, সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য তোমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দরস পান করিতে। যখন একবার ধ্যানের

আস্বাদ পাইবে, তখন বারংবার যোগানন্দরস পান করিবার জন্য দৌড়িয়া যাইবে। এখন আচার্য্যের অনুরোধে বন্ধুর অনুরোধে ধ্যান করিয়া থাক, কিন্তু তাহাতে সুখ পাও না। ধ্যানে আনন্দ কেন হয় না? যে হৃদয়ে ইন্দ্রিয় রাজা এবং হস্ত মন্ত্রী, যেখানে নানাপ্রকার বাসনা ও প্রবৃত্তির কোলাহল, সেখানে কি ধ্যানের শান্তি আসিতে পারে? অতএব যদি ধ্যানের সুখ ভোগ করিবার স্পৃহা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধ আত্মাকে আহ্বান কর, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধের নির্ব্বাণপথ ধারণ কর। যোগগ্রামের পার্শ্বে নির্ব্বাণ সরোবর রহিয়াছে, সেই নির্ব্বাণ-সরোবরে অবগাহন না করিয়া কেহই যোগরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

মনুষ্যের শরীরের ভিতরে কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নরকের আগুন জ্বলিতেছে, এ সকল আগুন যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ কিরূপে ব্রহ্মরূপ দেখিতে পাইবে? এ সকল আগুন নির্ব্বাণ না হইলে কোন মতেই শান্তি লাভ করা যায় না, এবং শান্তচিত্ত না হইলে ধ্যান হয় না। এই জন্য সুচতুর বুদ্ধ নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের লক্ষ্য নির্ব্বাণ, বুদ্ধের উপায় নির্ব্বাণ, বুদ্ধের বৈকুণ্ঠ নির্ব্বাণ এবং বৈকুণ্ঠের পথও নির্ব্বাণ। এই এক নির্ব্বাণ কথাতে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত। এই কথা শুনিয়া আমরা হাসিব না; কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিব। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন,

তাঁহাকে একবার নির্ব্বাণসমুদ্রে ডুব দিতেই হইবে। নির্ব্বাণ ভিন্ন গম্ভীর সমাধি ও ধ্যানযোগ অসম্ভব। মনে কর, তোমার অন্তরে নানা প্রকার সুখ বাসনার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, সে সকল বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়া সমস্ত দিন কার্য্য করিতেছ, হঠাৎ তুমি কিরূপে দুই মিনিটের মধ্যে নির্লোভী ও বাসনাশূন্য হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মধ্যান করিবে? নানা প্রকার বাসনার উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে যাহার হৃদয়, সে কি পলকের মধ্যে স্থির ও গম্ভীর হইয়া ধ্যান করিতে পারে? তুমি তোমার বাহিরের গাড়ী থামাইলে, বাহিরের ঘোড়ার গতি-রোধ করিলে, তোমার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বন্ধ হইল; কিন্তু তোমার মনের ভিতরে যে শত শত বাসনা অশ্ব টক্ টক্ করিয়া দৌড়িতেছে তাহাদিগকে তো শাসন করিলে না। কুবাসনা কুরুচি চারিদিকে ছুটিতেছে। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কিরূপে ধ্যান করিবে? অতএব মনকে প্রশান্ত ও সুস্থির করিবার জন্য নির্ব্বাণসরোবরে অবগাহন করিয়া বাসনাজ্বালা নির্ব্বাণ করা আবশ্যক।

হে ধ্যানার্থী, হে যোগার্থী, ঠিক তোমার সমক্ষে প্রকাণ্ড নির্ব্বাণ সরোবর, সেই সরোবরে মগ্ন হইয়া তোমার সমুদয় আসক্তির আগুন নির্ব্বাণ কর। কিরূপে নির্ব্বাণ লাভ করিবে? নির্ব্বাণ সাধনের সময় কি ভাবিবে? কেবল 'না' ভাবিবে। না ভাবনা, নির্ভাবনাই নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণের অর্থ

'না' সাধন। সংসারভাবনাও ভাবিবে না, স্বর্গের ভাবনাও ভাবিবে না, অর্থাৎ কিছুই ভাবিবে না। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইবে, অর্থাৎ মনের মধ্যে কোন চিন্তা রাখিবে না। রাগের চিন্তা, লোভের চিন্তা প্রভৃতিকে মনে আসিতে দিবে না। নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত অবস্থা নির্ব্বাণ। যেমন আগুনে জল ঢালিলে আগুন নির্ব্বাণ হয়, এবং লোকে বলে আর আগুন নাই, সেইরূপ মনের মধ্যে নির্ব্বাণের অবস্থা হইলে আর কিছুই থাকে না। নির্ব্বাণের অবস্থায় ভাল মন্দ কিছুই থাকে না। সকল প্রকার কামনা ও বাসনার আগুন নির্ব্বাণ হইল বটে; কিন্তু এখনও ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় নাই। নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থায় অভাবপক্ষ সাধন, পরে ভাবপক্ষ সাধন। অভাবপক্ষ সাধনে সকল প্রকার বাসনা ও চিন্তা দূর করিব, ভাল মন্দ কিছুই ভাবিব না এইরূপে যখন দেখিব যে মনের মধ্যে কোন ভাবনা আসিল না, তখন বুঝিব যে ধ্যানের প্রথম অবস্থা সিদ্ধ হইল, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কে জয় করিবার শক্তি লাভ করিলাম।

নির্ব্বাণ লাভ না করিলে মানুষ কোন মতেই আপনার মনের দুরন্ত অশ্বকে শাসন করিতে পারে না। দুষ্ট বাসনা-রূপ দুরন্ত অশ্ব মনকে চঞ্চল করে, এবং বারংবার ধ্যানভঙ্গ করে। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে নির্ব্বাণসাধন আবশ্যক। মনের সকল প্রকার চিন্তা নির্ব্বাণ হইলে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আত্মদমন, আত্মনিগ্রহ, আত্মজয় হইয়াছে। আত্মবশ হইলে

অর্থাৎ মন বশীভূত হইলে যথনই মনকে বলিবে, মন, বস, তখনই মন বসিবে, মনকে বলিবে দাঁড়াও, তখনই মন দাঁড়াইবে। কুচিন্তাকে বলিবে দূর হও, অমনি দূর হইবে; বিষয়কল্পনাকে বলিবে চলিয়া যাও, সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। এই যে মনকে জয় করা ইহাতে ঈশ্বর বল দেন। যে মনকে জয় করিয়াছে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের অনুমতি ভিন্ন কোন চিন্তা আসিতে পারে না। ভাল মন্দ সমুদয় চিন্তা বিদূরিত হয়। বাণিজ্য, ব্যবসায়, সংসার, স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতি বৈষয়িক চিন্তা, অথবা জ্ঞান-চর্চ্চা, আপনার পাপ পুণ্য, পরসেবা দৈনিক কর্ত্তব্য প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনা কিছুই তখন মনে স্থান পায় না। নির্ব্বাণসরোবরের ন্যায় তাহার মন তরঙ্গবিহীন ও স্থির হইয়াছে।

যখন এইরূপে মন নির্ব্বাণ লাভ করে তখন একটি সম্পূর্ণ-রূপে নূতন রাজ্য প্রকাশিত হয়। নির্ব্বাণে 'না' সাধন শেষ হইল, অভাবপক্ষ সাধন শেষ হইল, এখন ভাবপক্ষের সাধন আরম্ভ হইল। নির্ব্বাণে সংসারবস্তুকে উড়াইয়া দিলাম, এখন ব্রহ্মবস্তুকে ঘরে আনিতে হইবে। অনেকে মনে করেন কেবল ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ কিংবা ধর্ম্মের এক একটি লক্ষণ চিন্তা করাই ধ্যান। আমরা নববিধানের লোক, আমরা যোগরাজ্য মানি। যেমন এই কলিকাতা নগরে রাজ-প্রতিনিধির বাড়ী, তাহার নিকট নদী এবং এখানে ওখানে

কত লোকের অট্টালিকা আছে, তেমনি যোগ নগরে যোগেশ্বরের বাড়ী এবং অসংখ্য যোগী ঋষি সাধুদিগের বাসগৃহ ও প্রেমনদী রহিয়াছে। সেখানে স্থান কিংবা কালের ব্যবধান নাই। যোগনগরে এসিয়া ইউরোপ একস্থানে, সেখানে ইহকাল পরকাল এক, ঈশা মুষা এক স্থানে, সেখানে পৃথিবীর নানা স্থানের সমুদয় যোগী এক পরিবারবদ্ধ হইয়া আছেন। যাহারা যোগ ধ্যানের সময়েও স্থান এবং কালের ব্যবধান দেখিতে পায়, তাহারা কল্পনার সাধন করে।

নির্ব্বাণসরোবরে ডুব দিয়া যাহারা যোগ রাজ্যে গমন করে, তাহারা পরলোকগত মহাত্মাদিগের অব্যবহিত নৈকট্য অনুভব করে। যোগরাজ্যে দেশভেদ জাতিভেদ নাই। যখন জড়রাজ্য ছাড়িয়া, চিন্ময় হইয়া আধ্যাত্মিক লোকে গমন করি, তখন সমুদয় অশরীরী আত্মা ঈশ্বরেতে সংযুক্ত দেখিতে পাই। সেখানে দেবদেব মহাদেব যোগেশ্বরের চিন্ময় যোগনিকেতন, এবং তাহার মধ্যে যোগীদিগের অসংখ্য নিরাকার গৃহ রহিয়াছে। যোগানন্দ প্রার্থী, তুমি তাঁহাদিগকে দেখ না দেখ ক্ষতি নাই; তোমাকে কেবল স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই চিন্ময় যোগরাজ্যে সকলই আছে। যখনই তুমি সেই রাজ্যে গিয়া সেই রাজ্যের ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি তোমাকে আপনার বাগানের নানা প্রকার প্রেম ও পুণ্যফুলে সাজাইতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পরলোকবাসী ভক্তদিগের সঙ্গে

সহজে একাত্মা হইয়া যাইবে; সেখানে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলে। এক একবার তাঁহার উৎসাহকর কথা শুনিয়া মৃত জীবনে নব জীবনের সঞ্চার হইতে দেখিলে। সমস্ত জীবন কখন কি করিবে সেই স্বর্গের পরম বন্ধুর নিকট সমুদয় জানিলে।

এক কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ আত্মা নির্ব্বাণসাগরে ডুব দিয়া উঠিল, যাই সে জ্যোতির্ম্ময় যোগেশ্বরের নিকট যোগাসনে বসিল, অমনি একাগ্রচিত্ত হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া জ্যোতি ও আনন্দসুধা পান করিতে লাগিল; ক্লেশ কলুষ নাশ হইতে লাগিল। গভীরতম অপবিত্রতা, কপটতা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, রাগ, সমুদয় বিনষ্ট হইতে লাগিল, চরিত্র নির্ম্মল হইল। ঈশ্বরের উজ্জ্বল পবিত্র কিরণে তাহার মন আলোকিত হইল। যে পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ সেই পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মার উজ্জ্বলতা। প্রকৃত যোগ হইলে অন্তরে যে কেবল পাপ কলঙ্ক অপসারিত হয় তাহা নহে, নির্জ্জীবতা, অসাড়তা, শুষ্কভাব ও জড়ভাবও চলিয়া যায়। প্রকৃত ধ্যানযোগের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সুস্থতা, বুদ্ধির প্রখরতা, হৃদয়ের কোমলতা, আত্মার গভীরতা ও জীবনের নির্ম্মলতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং অন্তরে ও বাহিরে শত শত পুণ্য ও সদ্ভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। যোগীর মুখে এমনি নব-প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বিকসিত হয় যে

লোকে দেখিবা মাত্র বলে, জ্যোতির সন্তান যোগরাজ্য হইতে কেমন উজ্জ্বল সহাস্য ও বিমল বদনে আনন্দময়ের ঘর হইতে আসিতেছে।

সৌন্দর্য্য।

১২ই পৌষ, রবিবার, ১৮০২ শক; ২৬এ ডিসেম্বর ১৮৮০।

নববিধান শিশুধর্ম্ম। শিশুপ্রকৃতির যত খেলা ইহাতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। ইহার জ্ঞান গভীর, ইহার বেদ বেদান্ত অতি দুর্ব্বোধ, ইহার যোগ প্রগাঢ়, ইহার সমুদয় কথা অতি বিচিত্র অদ্ভুত কথা। ইহা সত্যসাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্বসকল বাহির করিতেছে। ইহার দৈবজ্ঞানের নিকট পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানীরা পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতেছেন। নববিধানের দিব্যজ্ঞানের কথা শুনিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা লজ্জিত ও অধোবদন হইতেছেন। বাহিরে নববিধান এত উচ্চ ও গভীর; কিন্তু ইহার ভিতরে কেমন মধুর বাল্যলীলা। ইহার তত্ত্ব সকল অতি সুন্দর, ইহার গল্পগুলি অতি সুললিত, অতি সুমধুর। নববিধানগ্রন্থে কেবল বাল্যধর্ম্ম লেখা। বালকেরাই নববিধানের অধ্যাপক ও অধ্যেতা, কুটিলবুদ্ধি বৃদ্ধেরা ইহার বিরোধী। সরলমতি, সুকোমলহৃদয় বালকেরা ইহার বন্ধু। ইহার আচার্য্য বালক, ইহার শ্রোতা বালক। বাল্যলীলা কি?

বালক কিরূপে আহার করে? কিরূপে বস্ত্র পরিধান করে? বালক কিরূপে যোগ সাধন করে? কিরূপে আনন্দে বিচরণ করে? বালক নিজে কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে কিছুই জানে না। সেইরূপ নববিধানাশ্রিত সাধকেরাও কি আহার করিবে, কি পরিধান করিবে কিছুই জানে না।

এক দিকে নববিধান স্বর্গের গভীর জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রবীণ বার্দ্ধক্যকে লজ্জা দিলেন, আর এক দিকে নববিধান সেই গভীর তত্ত্ব সকল অতি সহজ ও সুললিত বালকভাষায় প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। বালকসুলভ এই নববিধানের ধর্ম্ম। ইহার বৈকুণ্ঠে কেবল বালকেরাই ক্রীড়া করে। বাল্যকালের ধর্ম্ম সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম। ঈশ্বর সত্যং শিবং সুন্দরং। সত্যসাধন ব্রহ্মপূজার আরম্ভ, ইহাতে আনন্দের সঞ্চার মাত্র হয়। সত্য হইতে শিব পূজা, মঙ্গলের পূজা, আরও আনন্দকর, মঙ্গল হইতে সুন্দরের পূজা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর। যেমন সঙ্গীতে সা, ঋ, গ, ম, প্রভৃতি সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়, সেইরূপ সত্য হইতে শিব, শিব হইতে সুন্দরের পূজা মিষ্টতর হয়। নববিধানের প্রত্যেক সত্য সুন্দর। ইহার ভিতরে একটি সত্য নাই যাহা স্বর্গের সুন্দর বর্ণে বর্ণিত করা না হইয়াছে। ইহার ভিতরে একটি পুতুল নাই যাহা অতি সুন্দর রঙ্গে অনুরঞ্জিত নহে। নববিধানে এমন কোন গদ্য নাই যাহাতে পদ্য কিংবা সঙ্গীতের ছন্দ নাই। নববিধানের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

কবিত্ব এবং সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। পরম সুন্দর ঈশ্বর ইহার সমুদয় অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টতা এবং সৌন্দর্য্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন।

নববিধানের ঈশ্বর যেমন মিষ্ট; স্বর্গ তেমনি মিষ্ট, বিবেকও তেমনি মিষ্ট। ইহার সাধন সৌন্দর্য্যের সাধন। ইহার প্রত্যেক সত্যের সঙ্গে সুধা মিশ্রিত। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক অমিয় মাখিয়া এই নববিধান জগতের পরিত্রাণ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের সাগর ঈশ্বর, কি জড়জগতে, কি ধর্ম্মরাজ্যে, সৌন্দর্য্য বর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। কেবল যদি জীবপ্রতিপালন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রজাদিগের জন্য কেবল ধন ধান্য সৃজন করিলেই হইত। কিন্তু তিনি ধান্য ক্ষেত্রের নিকটে সুন্দর পুষ্পোদ্যান রচনা করিলেন কেন? সৌন্দর্য্যের আকর হরি বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখাইয়া সন্তানদিগের, ভক্তদিগের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। স্বর্গ ও পৃথিবীতে যত প্রকার সৌন্দর্য্য আছে সমুদয়ের সমষ্টি নববিধান। ঈশ্বর সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার কোন্ কার্য্যে সৌন্দর্য্য নাই? তাঁহার কোন্ স্বরূপে সৌন্দর্য্য নাই? যতই আমরা ঈশ্বরকে দেখি ও তাঁহার কার্য্য অনুশীলন করি, ততই তাঁহার সৌন্দর্য্য হৃদয় মনকে হরণ করে। দেখিতে দেখিতে প্রিয়দর্শন ঈশ্বর আরও অধিকতর মনোহর হইয়া উঠেন। ঈশ্বরের মুখে সৌন্দর্য্য, তাঁহার চক্ষে সৌন্দর্য্য, তাঁহার পাদপদ্মে সৌন্দর্য্য।

ঈশ্বর যখন কথা কহেন কিংবা উপদেশ দেন, তখন তাঁহার মুখে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক কথায় সুধা ঝরে। ঈশ্বর যখন শরণাগত জনের বক্ষের উপরে তাঁহার অভয় মঙ্গল চরণ স্থাপন করেন, তখন তাঁহার সেই চরণকমলে কেমন কান্তি বিকশিত হয়! ঈশ্বর যখন তাঁহার কোমল প্রেমহস্তে পাপীকে ধরেন, তাঁহার সেই সুকোমল হস্তের কেমন স্বর্গীয় মনোহর লাবণ্য! ঈশ্বর নিজে সুন্দর, তাঁহার সাধু সন্তানেরাও সুন্দর। ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই কমনীয় মুখশ্রী। তাঁহারা পুণ্য ও প্রেমানুরঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া পরম সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধির উপাসকগণ ঐ দেখ, নিরানন্দের কাল বসন পরিয়া আছে। তাহারা যতই কুটিল বুদ্ধির অনুসরণ করিতেছে, ততই দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহাদিগের মনের সুখ শান্তি হরণ করিতেছে।

ভক্তদিগের রাজ্যে দুঃখ দুর্ভাবনা নাই। সেখানে ঈশ্বরের স্তবস্তুতি, ঈশ্বরের আরাধনা, ঈশ্বরের ধ্যান, তাঁহার নিকট প্রার্থনা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এবং তাঁহার অনুগত ভক্তসেবা, সমস্ত ব্যাপার সুন্দর ও সুমিষ্ট। সেখানে শুষ্ক স্তব স্তুতি, শুষ্ক ধ্যান ও ভাববিহীন কঠোর সেবা নাই। ভক্তিরাজ্যে শৃঙ্খলবদ্ধ কঠিন দাসত্ব নাই। ভক্তিবিহীন সাধকদিগের যত সাধন ভজন, যত ধ্যান সেবা, সমুদয় নীরস, এবং মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক। কিন্তু নববিধানের ধ্যান যোগ, সেবা সমস্ত

ভক্তির ব্যাপার, সমস্ত অশেষ সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। অন্য ধর্ম্মে যোগ তপস্যা ধ্যান এ সমস্ত ভয়ানক কঠোর সাধন। অন্য ধর্ম্মের যোগভূমি বিস্তীর্ণ বালুকাক্ষেত্র, তাহার মধ্যে এক বিন্দু জল পাওয়া যায় না। তৃষ্ণাতুর শুষ্ককণ্ঠ তপস্বিগণ উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর বসিয়া যোগ সাধন করিতেছে ও তাহাদের শরীর মন ক্রমে রুক্ষ, উত্তপ্ত, ও কঠোর হইতেছে। অন্যধর্ম্মাবলম্বী যোগীর জল পান করিবার ইচ্ছা হইলে, ধ্যানরূপ মরুভূমি পার হইয়া স্থানান্তরে গিয়া জল পান করিতে হয়। কিন্তু নববিধানের যোগী গভীর যোগের মধ্যেই শান্তিরস পান করেন। অন্যান্য ধর্ম্মের সেই কঠোর ধ্যানক্ষেত্র নববিধানে কেমন সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত! ভগবানের আজ্ঞাতে এমন কঠোর যে যোগ ধ্যান তাহাও অত্যন্ত মধুময় হইল।

নববিধানের লোকেরা অগ্নির মধ্যে বসিয়া ধ্যান তপস্যা করে না, তাহারা ধ্যান করে অমৃতসরোবরের তীরে এবং ছায়াপ্রদ তরুতলে। যখন হৃদয়বৃন্দাবন প্রফুল্ল কুসুমরাজিতে সুশোভিত ও পিককণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর তানে আমোদিত হয়, তখন ব্রাহ্ম যোগী তথায় বসিয়া যোগ সাধন করেন। তিনি যাহা কিছু ভাবেন যাহা কিছু চিন্তা করেন সমুদয় সুমিষ্ট। ধ্যান করিয়া যাহারা বিরক্ত বৈরাগী হয়, তাহারা নববিধানের প্রণালীতে ধ্যান করে না। সাধুসেবা করিয়া যাহাদিগের মন কঠোর হইয়া যায়, তাহারা নববিধানের বিধি অনুসারে

সাধুসেবা করে না। নববিধানের ধ্যান সরস এবং সুশীতল। যতই সেই ধ্যান হয় ততই মন স্নিগ্ধ হয়। ধ্যানহ্রদের উপরিভাগ সংসাররৌদ্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উষ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীচেকার জল অত্যন্ত সুশীতল। ধ্যান করিতে করিতে যোগী যখন নিম্নে অবতরণ করেন, শীতল জলে তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যায়, এবং তাঁহার আর উপরে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। নববিধানের ধ্যান অতি সুমিষ্ট, নববিধানের যোগান দরস অতি সুস্বাদু। নববিধানের সাধুসেবাও অত্যন্ত সরস।

অন্যান্য ধর্ম্মে নীতি কেবল কঠোর কর্ত্তব্যসাধন, নববিধানে কঠোর কর্ত্তব্যসাধন নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, এখানে কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর নাই। যে পরিশ্রমে ধ্যান ভঙ্গ হয়, অথবা উপাসনার ব্যাঘাত হয়, নববিধানে সে পরিশ্রমের বিধি নাই। নববিধানের সাধক সরলপ্রকৃতি বালক। তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ মনে হাসিতে হাসিতে তাঁহার প্রভুর কার্য্যালয়ে কার্য্য করেন। প্রভুর কার্য্যে কখনও তাঁহার আলস্য নাই, প্রভুর সেবায় তাঁহার ক্লান্তি বোধ হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের তাদৃশ সুখ নাই। তাহারা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিশ্রম করে; কিন্তু নববিধানের ভক্তের ন্যায় প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া তাঁহার সমক্ষে কার্য্য সাধন করিয়া সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতে পারে না। পরিশ্রম করিতে মনুষ্যমন

অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রভুর যথার্থ ভক্ত হাসিতে হাসিতে পরিশ্রম করেন, অনলস হইয়া সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, পরসেবা করেন, ক্ষুধিতকে অন্ন দেন, রোগীকে ঔষধ দেন, বিপন্নকে সাহায্য দান করেন, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেন, এবং ভ্রমান্ধকে সৎপথে আনেন। তাঁহার পক্ষে এ সমস্ত ঠিক যেন বাল্যক্রীড়া। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও অভিমান শূন্য হইয়া পরের দেহ মনের দুঃখ হরণ করেন। যথার্থ নববিধানের যিনি বিশ্বাসী সাধক তিনি চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল ও সহাস্যবদন। যতই তিনি তাঁহার প্রভুর সেবা করেন ততই তাঁহার হৃদয় আরও ক্রমশঃ প্রফুল্ল হয়। কার্য্য এখানে সুমধুর।

বালকের রাজ্য অতি সুমিষ্ট ও সুন্দর। সরল প্রকৃতি বালকেরই নববিধানে অধিকার। কুটিলবুদ্ধি বৃদ্ধেরা নববিধান বুঝিতে পারে না, নববিধানের ছোট ছোট কথা সুধামাখা, উহা কবিত্বপূর্ণ। ইতিহাসে লেখা আছে প্রত্যেক জাতি বাল্যকালে পদ্যপ্রিয় ছিল। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যখন কোন জাতি বুদ্ধির অবস্থায়, সভ্যতার অবস্থায় পদার্পণ করে, তখনই সেই জাতি কবিতা ও পদ্য পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কঠোর গদ্য ব্যবহার করে। যেখানে সভ্যতা সেখানে বিদ্যার অভিমান, সেখানে শুষ্কতা, সেখানে গদ্য। বালকের বুদ্ধি নাই,

স্বাভাবিক সংস্কার ও অনুরাগ হইতে তাহার সকল কথা বিনিঃসৃত হয়। সুতরাং তাহার জিহ্বা অবলীলাক্রমে কেবল পদ্য বলে। চেষ্টা করিয়া বহু আয়াসে শব্দাড়ম্বর সহকারে গদ্য রচনা করিতে বালক ভালবাসে না, বালক পদ্য ভালবাসে, পদ্য বলে, পদ্য পাঠ করে, পদ্যেতে রচনা করে। এখন অস্মদ্দেশে বাল্যধর্ম্ম পুনরায় আসিয়াছে। ইহার একটি প্রমাণ এই যে এখন পদ্য ও সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতেছি বঙ্গদেশে সত্যযুগের বাল্যকাল সমাগত। এখন আমরা স্বর্গের আশ্চর্য্য গল্প সকল শুনিতেছি!

বালক গল্প, রূপক, তুলনা, অত্যন্ত ভালবাসে। বালক সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মোহিত হয়। বালক বলে না যে, আমি জ্ঞান বিজ্ঞান সাধন করিব। যখনই বালক চিত্তরঞ্জন সুধাংশু দেখিতে পায় সে হাসিয়া বলে আমি ঐ চাঁদকে ধরিব। জ্যোৎস্নাপিপাসু হইয়া বালক চাঁদ ধরিতে চায়। আত্মা সেইরূপ বাল্যাবস্থায় চাঁদ হরিকে ধরিতে যায়। তাঁর জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া সে আর থাকিতে পারে না, কেবল বলে চাঁদ আয় চাঁদ আয়। যেখানে দেখিবে উপদেষ্টা অধিক পরিমাণে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন, সেখানে জানিবে সেই উপদেষ্টা, সেই আচার্য্য নববিধানের উপদেষ্টা ও আচার্য্য। আর যেখানে কবিত্ব নাই, সৌন্দর্য্যরস নাই, কেবল কঠোর নীতিতত্ত্ব, যাহাতে লোক মোহিত হয় না, সেখানে পুরাতন

বিধান। সেখানে কেহ বলিবে না, আমি চাঁদ ধরি, অথবা চাঁদ দেখি। হে বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, যদি সুখী হইতে চাও তবে আবার যৌবনের ভিতর দিয়া বাল্যাবস্থায় প্রবেশ কর। যাই আবার বালক হইবে, অমনি কুটিল বুদ্ধি ও যুক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া সহজে বলিতে পারিবে আমি ঈশ্বরকে দেখি, আমি ঈশ্বরকে ধরি।

ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি, ব্রহ্মস্বরূপ অবধারণ, বালক এ সকল কঠোর তত্ত্বকথা বলে না। ভক্ত শিশু বলে, আমি ব্রহ্মকে দেখি, আমি ব্রহ্মকে ধরি। যাই একটি ভক্ত বালক স্বর্গরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ভাই, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে ধরিয়াছি" তখন তাহার কথা শুনিয়া শত শত বালক মোহিত হইল। এই এক দর্শন কথা সমস্ত জগৎকে মোহিত করিবে। বালক বলিল আজ প্রেমচন্দ্রকে দর্শন করিলাম, এবং তাঁহার সুধা পান করিলাম। কুটিল বুদ্ধি বৃদ্ধের জিহ্বা অত্যন্ত কঠিন, এই জন্য সে এই সুমধুর কথা বলিতে পারে না, সে নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করে যে যাঁহার কোন আকার কিংবা মূর্ত্তি নাই তাঁহার সম্পর্কে দর্শন কথা ব্যবহার হইতে পারে না। সে তাহার বুদ্ধি দ্বারা ভক্তির সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব অনুভব করিতে পারে না। নববিধানে সাধকেরা পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, তাঁহাদিগের কথা উপমার কথা, রূপক কথা। তাঁহারা নির্ভয়ে সরল অন্তরে আপনাদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া